কাব্য-বিচার

১৩০৫

কাব্য-বিচার

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

মিত্র এণ্ড ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামা চরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য আড়াই টাকা

১৯৬, বিবেকানন্দ রোড্, কলিকাতা
শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক নালন্দা প্রেস হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

যাঁহার কর্ম্মকুশলতায়, স্বার্থত্যাগে ঐকান্তিক নিষ্ঠা
ও পরিশ্রমে, মনীষায় ও অকুণ্ঠিত স্বদেশানুরাগে
বঙ্গদেশে বিশ্ববাণী নিরন্তর প্রসার লাভ
করিতেছে সেই চিরসুহৃদ্ ডাঃ শ্রীযুক্ত
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে
শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত
হইল।

প্রস্তাবনা

ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত কি জগন্নাথ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে সাহিত্য বিচার সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ আলোচনা অন্য কোন ভাষায় আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইংরেজীতে বা ফরাসীতে সাহিত্য বিচারের নানা আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তথাপি অনেক বিষয়ে তাহা আমাদের দেশের সাহিত্য বিচারের মত সূক্ষ্ম ও গভীর নহে এবং আমাদের দেশের সাহিত্য বিচারে যে যে বিষয়ের আলোচনা আছে সেই সেই বিষয়ে য়ুরোপীয় কাব্যবিচার গ্রন্থে তদনুরূপ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি মাত্রেরই আমাদের দেশের কাব্য-বিচার পদ্ধতির সহিত পরিচিত থাকা আবশ্যক। টোলের পণ্ডিত মহাশয়েরা সাধারণ ভাবে বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের সহিত কদাচিৎ মম্মটের কাব্যপ্রকাশের সহিত ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শের সহিত পরিচয় লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু পঠনপাঠনের ব্যবস্থা না থাকাতে প্রাচীন-কাল হইতে অলঙ্কার সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে কাব্যবিচার-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে সমগ্রতার মধ্যে তাহার যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে প্রায়শঃই অভিজ্ঞ হইতে পারেন না। আমাদের দেশের সংস্কৃতে এম্ এ দের ও অধিকাংশ স্থলেই প্রায়শঃ একই অবস্থা। উভয় শ্রেণীর মধ্যে হয়ত দুই চারি জন বিশেষজ্ঞ আছেন তাঁহাদের কথা অনায়াসেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় অধুনাতন কালে যে সাহিত্য সমালোচনা দেখা যায় তাহাতেও বিশ্বনাথ ও মম্মটের রস সম্বন্ধে আলোচিত বিষয়ের সহিত চলিত ইংরেজী সমালোচনা গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ সমাহৃত হইতে দেখা যায়। ইংরেজীতে ডাঃ সুশীলকুমার দে, কানে, জেকবি, শোভানি প্রভৃতিরা অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক প্রগাঢ় আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের ঐ সকল আলোচনায় কাব্য বিচার পদ্ধতির উপর প্রধান ভাবে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। বাংলা ভাষাতেও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কাব্য জিজ্ঞাসা নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ছাড়া অন্য কোনও বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। নানা কাজের ঘূর্ণীর মধ্যে এক সময়ে অর্দ্ধমাসের অবকাশ ঘটিয়াছিল—সেই অবসরে এই গ্রন্থখানি লেখা হইয়াছে, আরও বিস্তৃত আলোচনা করিলে এ বিষয়ের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারিত। অলঙ্কার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ লিখিবার আশা ও ইচ্ছা আছে। বর্ত্তমান নিবন্ধে কেবল মাত্র কাব্যবিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে গোটাকতক প্রধান কথা আলোচনা করিয়াছি; শাস্ত্রধারা পরিচ্ছেদে ও অন্যান্য কোন কোন স্থলে ডাঃ দে মহাশয়ের ও কানে মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। বিদ্বজ্জনোচিত রীতিতে পাদটীকার সন্নিবেশ করিয়া তৎতৎ স্থানে ঋণ স্বীকার করিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য হইবার সম্ভাবনা থাকায় এই প্রস্তাবনায় তাঁহাদের নিকট আনন্দের সহিত ঋণ স্বীকার করিতেছি। কাব্যবিচার পদ্ধতির অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলিয়া এই গ্রন্থে নানা আলোচনা, মত খণ্ডন ও পরপক্ষেরসহিত বাদানুবাদের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয় নাই, এবং অনেক সময় বিচার বহুল বিষয়কে অতি অল্প কথায় সিদ্ধান্তিত বস্তুর ন্যায় সাধারণ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাব্যবিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণ

পরিচয়েরই বিশেষ অভাব আছে মনে করিয়া বহু তর্ক বিচারের গভীরতার মধ্যে ইচ্ছা করিয়াই প্রবেশ করি নাই।

মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব লাইব্রেরিয়ান্ শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য, এম. এ., অধ্যাপিকা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুরমা মিত্র, এম, এ. ও শ্রীমান শশীভূষণ দাশগুপ্ত, এম, এ., পি, আর, এস., সুযোগ ও অবসর মত প্রুফ্ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে জন্য আমি তাঁহাদের নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে কর্ম্ম-বাহুল্যের জন্য ও চক্ষুর দুর্ব্বলতার জন্য এই গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধন আমার পক্ষে একরূপ অসাধ্য হইত। স্থানে স্থানে হয়ত মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে সেই জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুক নাথ ভট্টাচার্য্য শ্রম ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া আদ্যন্ত প্রথম প্রুফ্গুলি দেখিয়া দিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট এই অবসরে বিশেষভাবে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

সংস্কৃত কলেজ

১৪।৩।৩৯

কাব্য-বিচার।

বিষয় সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

(বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(শাস্ত্রধারা)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(দোষ, গুণ ও রীতি)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(বক্রোক্তিবাদ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(রস ও কাব্য)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ধ্বনি

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্ফোটবাদ

শ্লোক-সূচী

পৃষ্ঠা

কাব্য-বিচার

বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক

আমাদের দেশের অলঙ্কার-শাস্ত্রকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। ঋগ্‌বেদ প্রভৃতি সংহিতা-গ্রন্থে, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক বা উপনিষদাদিতে, শ্রৌত-সূত্র বা ধর্ম্মসূত্রাদিতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বর্ণিত বিষয়ের বিশেষ কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাস্কের নিরুক্তের মধ্যে উপমার কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ভূতোপমা, রূপোপমা, সিদ্ধোপমা, লুপ্তোপমা বা অর্থোপমার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে গার্গ্যের উপমা-লক্ষণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, এই গার্গ্যের উপমা-লক্ষণই উপমার সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ; এই লক্ষণে গার্গ্য বলিয়াছেন যে দুইটি বিভিন্ন বস্তুকে যখন কোনও একজাতীয় গুণের দ্বারা তুলনা করা যায় তখনই তাহাকে উপমা বলা যায়। তিনি আরো বলিয়াছেন যে সাধারণতঃ যে গুণের দ্বারা তুলনা করা হয়, তাহা উপমানে বেশী পরিমাণে থাকে এবং উপমেয়ে অল্প পরিমাণে থাকে; যদিও উপমেয়েও সেই ধর্ম্ম কোনো কোনো স্থলে বেশী পরিমাণে থাকিতেও পারে। বোধ হয়, এই সময় হইতেই বাক্যালঙ্কার-রূপে উপমা গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর পাণিনির সূত্রে,

কাত্যায়নের বৃত্তিতে, শান্তনবের ফিট্ সূত্রে ও মহাভাষ্যে, উপমান ও উপমেয়ের নানা সম্বন্ধের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। "উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে", "উপমানানি সামান্যবচনৈঃ", "উপ-মানাদাচারে", "তেন তুল্যং ক্রিয়াচেদ্বতিঃ"।

ব্যাকরণ যেমন পদের প্রকৃতি ও অর্থ লইয়া ও বিভিন্ন পদের পরস্পর সম্বন্ধ লইয়া ব্যস্ত, অলঙ্কার-শাস্ত্র তেমনি পদ ও বাক্যের অর্থের সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্ব লইয়া ব্যাপৃত। অলং শব্দের অর্থ ভূষণ। বৈদেশিক aurum শব্দের অর্থ সোনা; বোধ হয়, সোনা ভূষণরূপে ব্যবহৃত হইত, এইজন্য অলং শব্দের অর্থ ভূষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার সময় হইতে সোনা অলঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইত; পরবর্ত্তী কালের শাব্দিকেরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে সোনা যেমন মনুষ্য-শরীরের ভূষণ, মানুষের বাক্যার্থেরও এমন সৌষ্ঠব থাকিতে পারে, যাহা বাক্যের ভূষণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বৈয়াকরণ বা শাব্দিকের সহিত আলঙ্কারিকের যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে—তাহা অস্বীকার করা যায় না। আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য বলিয়াছেন যে বাক্যের অর্থ দুই প্রকার—তাহার একটি অর্থ সাধারণ ভাবে পদসমষ্টির পরস্পর অন্বয় করিয়া পাওয়া যায়; কিন্তু অনেক সময়ে পদ-সমষ্টির অন্বয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে আর একটি অর্থ সহৃদয় ব্যক্তির চিত্তকে আলোকিত করে। প্রথমটিকে বাচ্যার্থ ও দ্বিতীয়টিকে প্রতীয়মান অর্থ বলা যায়। সুন্দরী রমণীর শরীর-সংগঠনের সাধারণ সৌষ্ঠব ছাড়া যেমন স্বতন্ত্রভাবে একটি অনির্ব্বচনীয় লাবণ্যপ্রভা সমস্ত শরীরের উপর দিয়া খেলিয়া যায়, তেমনি মহাকবিদের বাক্যে এমন একটি বিশেষ কিছু প্রকাশ পায়, যাহা তাহার সাধারণ অর্থের অতিরিক্ত। কাব্যের এই যে প্রতীয়মান একটি স্বতন্ত্র অর্থ বা রস চিত্তকে

অভিষিক্ত করে, তাহা কেবল মাত্র শব্দার্থের নিয়ম কানুন জানিলেই জানা যায় না ; তাহা জানিতে হইলে স্বতন্ত্র দক্ষতার প্রয়োজন। যাঁহাদের সেই দক্ষতা আছে, তাঁহারা মহাকবিদের বাক্যের মধ্য হইতে কোন্ শব্দ বা কোন্ অর্থ তাদৃশ নূতন বস্তুকে প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা অনায়াসেই চিনিতে পারেন। শব্দের যাহা প্রসিদ্ধ অর্থ তাহাকে অতিক্রম করিয়া এই নূতন বস্তুটীর সন্ধান পাওয়া যায় না। আলোক চাহিলে যেমন দীপশিখার খোঁজ করিতে হয়, তেমনি বাচ্যার্থের সাহায্যেই প্রতীয়মান অর্থকে অন্বেষণ করিতে হয়।

বাচ্যার্থ শেষ হইয়া গেলে সহৃদয় ব্যক্তির চিত্ত যখন তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া আর একটি নূতন বস্তুর ইঙ্গিত পায়, তখনই এই নূতন বস্তুটি চিত্তের মধ্যে দীপ্তিমান হইয়া উঠে। শব্দ বা তাহার সাধারণ অর্থ যখন আপনাকে গৌণ করিয়া রাখিয়া আর একটি বস্তুকে প্রধান করিয়া প্রকাশ করে, তখনই এই নূতন বস্তুটি ধ্বনিত হইয়া উঠে।

যেখানে প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থ অধিকতর মনোহর, সেখানে সেই প্রতীয়মান অর্থের কোনো বিশেষ গৌরব নাই, সেইজন্য তাহার বিশেষ মর্য্যাদাও নাই। যদি বলা যায়—

"অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্তৎপুরঃসরঃ।
অহো দৈবগতিঃ কীদৃক্ তথাপি ন সমাগমঃ॥"

অনুরাগময়ী সন্ধ্যা পশ্চাতে করিয়া আগে চলিছে দিবস,
দৈবের এমন রীতি তথাপি তাদের নহে মিলন সরস।

এই শ্লোকটির প্রতীয়মান অর্থ এই যে, নায়িকার নিকটবর্ত্তী হইলেও নায়কের সহিত তাহার মিলন হইতেছে না। কিন্তু এই কথাটির মাধুর্য্য অপেক্ষা নানা বর্ণে সুশোভিতা সন্ধ্যার নিকটবর্ত্তী দিনের সহিত মিলন হইতেছে না, এই অর্থ অধিকতর মনোহর।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে ব্যাকরণ যেমন পদের সহিত পদের অর্থে অন্বয়-নিরূপণ করিয়া একটি অখণ্ড বাক্যার্থকে দ্যোতিত করিতে ব্যস্ত, অলঙ্কার-শাস্ত্রও তেমনি শব্দসৌষ্ঠব ও অর্থসৌষ্ঠবের সমন্বয়ে মহাকবিদের বাক্যে কেমন করিয়া নূতন অর্থ, নূতন সাদৃশ্য বা নূতন রস-লাবণ্য প্রোদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে পারে, তাহারি অনুসন্ধানে ব্যস্ত। বৈয়াকরণদের কথা বলিতে গিয়া আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন যে, সকল বিদ্যার মূলই ব্যাকরণ, এই জন্য বৈয়াকরণকেই সর্ব্বপেক্ষা বিদ্বান্ বলিতে হয়। বৈয়াকরণেরা বলেন যে কাণের মধ্যে যখন ধ্বনিপরম্পরা প্রবেশ করে, তখন সেই ধ্বনিপরম্পরার শেষধ্বনিটি কাণের মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেই ধ্বনিপরম্পরা-প্রভাবে একটি অখণ্ড শব্দের সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, তাহাকে স্ফোট বলা হয়। ধ্বনিপরম্পরার ঢেউগুলি একটির পর একটি আসিয়া যেমন যেমন উপস্থিত হয়, পূর্ব্বের ঢেউগুলিও তেমনি বিনষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি সেই ধ্বনিপরম্পরার শেষ অংশটি যখন কাণের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন একটি অখণ্ড শব্দের বোধ হয়। একটি ঘণ্টা বাজাইলে ঘণ্টার শব্দ শেষ হইলেও যেমন তাহার অনুরণন স্বরূপ একটি ধ্বনি কাণের মধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকে, ধ্বন্যংশগুলি কাণের মধ্যে প্রবেশ করিলেও তেমনি অনুরণন চলিতে থাকে। একটি অখণ্ড শব্দ কাণের মধ্যে ধ্বনিত হয়। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন,

"যঃ সংযোগবিয়োগাভ্যাং করণৈরুপজন্যতে।
স স্ফোটঃ শব্দজাঃ শব্দাঃ ধ্বনয়োঽন্যৈরুদাহৃতাঃ॥—বাক্যপদীয় ১।১০৩
প্রত্যয়ৈরনুপাখ্যেয়ৈঃ গ্রহণানুগুণৈস্তথা।
ধ্বনি-প্রকাশিতে শব্দে স্বরূপমবধার্য্যতে॥" —বাক্যপদীয় ১।৮৪

কেহ কেহ বলেন, প্রযত্নজনিত উচ্চারণস্থান-সমূহের সহিত বায়ুর সংযোগ-বিভাগ দ্বারা প্রথম যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে স্ফোট বলে।

পরবর্ত্তিকালে সেই সকল শব্দ হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে ধ্বনি কহে। ভর্ত্তৃহরি ইহার উত্তরে বলেন—শব্দের অভিব্যঞ্জনার অনুকূল অনির্ব্বচনীয় মানসী কল্পনা দ্বারা যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা প্রকাশিত হইলে শব্দের (স্ফোটের) অবধারণ হয়।

একটি শব্দের মধ্যে তাহার অংশরূপে নানা শব্দধারা কাণের মধ্যে পরম্পরাক্রমে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধারা যখন শেষ হইয়া যায়, তখন যে একটি অখণ্ড শব্দ ধ্বনিত হয় তাহাকেই স্ফোট বলে। তাই ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"শব্দস্যোর্দ্ধম্ অভিব্যক্তের্বৃত্তিভেদে তু বৈকৃতাঃ
ধ্বনয়ঃ সমুপোহন্তে স্ফোটাত্মা তৈর্ন ভিদ্যতে।"—বাক্যপদীয় ১।৭৮

শব্দের অভিব্যক্তির পর, তাড়াতাড়ি বা আস্তে কিংবা মাঝারি রকমে উচ্চারণ করিতে গিয়া শব্দের যে বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয়, তাহাতে স্ফোটের কোনও বৈলক্ষণ্য হয় না।

অভিনবগুপ্ত বলেন যে প্রণালীতে শব্দাংশ পরম্পরা পরিশেষে শব্দস্ফোট বা ধ্বনিরূপে আপন অধস্তন স্তরে আপনাকে প্রকাশ করে, ঠিক সেই প্রণালীতেই শব্দের বিভিন্ন অর্থপরম্পরা আপনাকে পরিশেষে স্ফোটরূপে অভিব্যক্ত করে।

কোনও শব্দ উচ্চারণ করিলে সেই শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ আমাদের মনে উদয় হয়। আমাদের দেশের শাব্দিকেরা বলেন যে, শব্দেরই একটা বিশেষ শক্তি আছে, যাহা দ্বারা সেই প্রসিদ্ধ অর্থ সেই শব্দ উচ্চারণমাত্রে আমাদের মনে উপনীত হয়। যদি গোরুশব্দ উচ্চারণ করি বা শুনি তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদের চিরপরিচিত একটী প্রাণীর কথা মনে হয়। গঙ্গাশব্দ বলিলে গঙ্গোত্রী হইতে উদ্ভূত হরিদ্বার, প্রয়াগ ও বারাণসী দিয়া প্রবাহিত ও সাগরে মিলিত একটী

নদী বিশেষের কথা মনে হয়। শব্দের উচ্চারণ মাত্রই এই বিশেষ অর্থটি আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হয়। এইজন্য শাব্দিকেরা বলেন যে শব্দের অভিধাশক্তির দ্বারা প্রত্যেক শব্দ তাহার বিশেষ বিশেষ আভিধানিক অর্থকে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করে। আবার যখন আমরা বলি 'ঘোড়াটাকে জল খাওয়াও', 'ঘটীটি লইয়া আইস', তখন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঘটী ও ঘোড়া শব্দের অর্থ ও 'টি' ও 'টা' এই দুই বিভক্তির কর্ম্মত্ব অর্থ জ্ঞাপিত হয়। ঐ কর্ম্মত্ব যে ঘটি ও ঘোড়াকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য কোনো শব্দ না থাকিলেও শব্দের একটী তাৎপর্য্য শক্তির দ্বারা 'টি' ও 'টা'র দ্বারা প্রকাশিত কর্ম্মত্বকে ঘটি ও ঘোড়ার সহিত একত্র লইয়া আমার কর্ম্ম ও জল খাওয়াইবার কর্ম্ম, তাহা বুঝিতে পারি। এই প্রণালীতেই লইবার সঙ্গে আসা ও ঘটির সঙ্গে লইয়া আসা এবং ঘোড়া, জল এবং খাওয়ান ইহাদের পরস্পর অন্বয় বুঝিতে পারি। অথচ এই অন্বয়ের অনুকূল কোনো এমন শব্দ নাই যাহার অর্থ দ্বারা এই অন্বয় সাধিত হয়। সেই জন্যই অনেকে বলেন যে বাক্যের একটী তাৎপর্য্য শক্তি আছে, যাহা দ্বারা বিভক্তির অর্থ তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্য শব্দের সহিত মিলিত হইয়া একটি অখণ্ড অর্থ প্রকাশ করে, ইহাকেই বাক্যের তাৎপর্য্য-শক্তি কহে। যে প্রণালীতে গ, ও, র, উ এই চারিটি শব্দপরম্পরা কাণের মধ্যে পর পর উত্থিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে 'গোরু' এই অখণ্ড শব্দটিকে ধ্বনিত ও প্রকাশিত করে, ঠিক সেই প্রণালীতেই শব্দ ও বিভক্তি পরস্পর অন্বিত হইয়া ও বিভক্ত্যন্ত পদগুলি পরস্পর অন্বিত হইয়া একটী অখণ্ড বাক্যার্থ প্রকাশ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি বাক্য শ্রবণকালে সেই বাক্যমধ্যস্থ কোনো শব্দ যখন তাহার অনুরূপ প্রসিদ্ধ অর্থকে

অভিধা-শক্তির দ্বারা সূচিত করে অথচ তদর্থক তাৎপর্য্যশক্তির দ্বারা পরস্পর অন্বিত করিতে গেলে চিত্তের মধ্যে বাধা উপস্থিত হয়, তখন স্বভাবতঃ তাহার প্রসিদ্ধ অর্থকে প্রকাশ না করিয়া সেই প্রসিদ্ধ অর্থের নিকটবর্ত্তী বা তৎসদৃশ অন্য কোনও অর্থকে প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি বলা যায় 'তিনি গঙ্গার মধ্যেই বাস করেন', কিংবা 'চল আমরা পালাই, লাঠিগুলো এদিকেই আসিতেছে', এ স্থলে গঙ্গা শব্দের সাধারণ প্রসিদ্ধ অর্থ একটী নদী অথচ এই প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত অন্য শব্দের অন্বয় করিলে যে অখণ্ড অর্থটি মনের মধ্যে উপস্থিত হয় তাহা একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কারণ গঙ্গার মধ্যে কাহারও বাস করা সম্ভব নয়; সেই জন্য মন বাধাপ্রাপ্ত হইয়া গঙ্গা শব্দের এমন কোনো অর্থ খোঁজে যাহার সহিত অবশিষ্ট শব্দগুলির অন্বয় ঘটিলে মনে কোনও বাধা উপস্থিত হয় না। অথচ গঙ্গা শব্দের সহিত একান্ত সম্পর্কবিহীন কোনও অর্থ গ্রহণ করিতেও মন চায় না। তিনি গঙ্গার মধ্যে বাস করেন—ইহার অর্থ এমন হইতে পারে না যে তিনি নগরে বাস করেন। এই জন্য গঙ্গা শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত এমন কোনও অর্থ মন খোঁজে যাহার সহিত সমগ্র বাক্যের বিভিন্ন পদের অন্বয় হইতে পারে। এই জন্য যদি গঙ্গা শব্দের অর্থ গঙ্গাতীর করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র বাক্যের একটি সঙ্গত অর্থ হয়। 'গঙ্গাতীরে বাস করেন' না বলিয়া 'গঙ্গার মধ্যে বাস করেন' বলিলে যে একটী বিশেষ সার্থকতা আছে তাহা বুঝা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে ভদ্রলোক গঙ্গার এত সন্নিকটে বাস করেন যে তিনি গঙ্গার শীতস্নিগ্ধ বায়ুর সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়া থাকেন। এই রকম একটী বিশেষ প্রয়োজন সূচনা করিবার জন্যই বক্তা 'গঙ্গাতীরে বাস করেন' না বলিয়া 'গঙ্গার মধ্যে বাস করেন' বলিয়াছেন, একথা মনে করা যাইতে পারে। অনেক

সময় আবার প্রয়োজন না থাকিলেও ভাষার প্রসিদ্ধি বশতঃ কোনও শব্দ তাহার সম্পর্কিত অন্য অর্থকে বুঝাইয়া থাকে; 'শাদা ঘোড়াটি দৌড়াইতেছে' না বলিয়া ঘোড়-দৌড়ের প্রসঙ্গে 'শাদাটি দৌড়িতেছে' বলিলে শাদাটির অর্থ শাদা ঘোড়া বুঝিতে পারি। 'লাঠি আসিতেছে' বলিলে লাঠিয়াল আসিতেছে বুঝা যায়। কিন্তু এই জাতীয় সকল স্থলেই প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত অন্য পদগুলির অর্থ অন্বিত হইলে কোনও সঙ্গত অর্থ ঘটিতে পারে না—এই কারণটি থাকে। আবশ্যক অর্থের অসঙ্গতিপ্রযুক্ত মনে বাধা উপস্থিত হওয়াও আবশ্যক; সেই বাধার তাড়নায় সেই শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থের নিকটবর্ত্তী এমন কোনও অর্থ মনকে গ্রহণ করিতে হয়, যাহা সেই শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত। কোনও শব্দ যখন প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত সম্পর্ক যুক্ত অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে হয় ভাষায় সেইরূপ ভাবে ব্যবহার করিবার রীতি আছে, নয়ত সেইরূপ ব্যবহারের কোনও উদ্দেশ্য আছে। শব্দ যে এইরূপ প্রসিদ্ধ অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্য অর্থ প্রকাশ করিতে পারে ইহাকে শব্দের লক্ষণাশক্তি কহে। আমার নিজের বিবেচনায় লক্ষণাকে শব্দের শক্তি বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে, কারণ কেবল শব্দের দ্বারা লাক্ষণিক অর্থ বুঝাইতে পারা যায় না। কোনও শব্দের অর্থ অন্য শব্দের অর্থের সহিত অন্বিত হইয়া যে কোনও বাক্যার্থকে অসম্ভব করিয়া তোলে, তাহার কারণ শব্দ নহে তাহার কারণ আমাদের পূর্ব্বতন অভিজ্ঞতা। আমরা জানি যে গঙ্গার মধ্যে বাস করিতে গেলে লোকটি নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিবে। এই জন্য পূর্ব্বতন অভিজ্ঞতার সহিত বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থের বিরোধ ঘটে। এ অবস্থায় যদি জানা থাকে যে বক্তা বাতুল বা মিথ্যাপ্রলাপী

নহেন, তাহা হইলে আমি গঙ্গার মধ্যে এই শব্দের অন্য অর্থ অন্বেষণ করি। অনেক সময় একাধিক প্রকারে বাক্যার্থের সঙ্গতি করা সম্ভব হয়। 'গঙ্গার মধ্যে' শব্দের অর্থে 'গঙ্গাতীরে'ও করিতে পারি কিংবা গঙ্গার মধ্যে ভাসমান বজরাও করিতে পারি। বহুবিধ জটিল চিন্তার ফলে যে অর্থ আমরা গ্রহণ করি সে অর্থকে শব্দশক্তিজনিত বলিয়া মনে করা আমার মতে সঙ্গত নহে। যাহা হউক, আমাদের দেশের প্রাচীনেরা লক্ষণা বলিয়া শব্দের অভিধা ও তাৎপর্য্য ছাড়া একটি তৃতীয় অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে অভিধা-তাৎপর্য্য-লক্ষণা দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় না, শব্দের এরূপ আর একটি চতুর্থ শক্তি আছে, এই শক্তিকে তাঁহারা বলেন ব্যঞ্জনা। এই শক্তির দ্বারা অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্য্য ছাড়া অন্যবিধ অর্থ ধ্বনিত হয়। এই জন্য অভিনব গুপ্ত বলেন যে শব্দও যেমন ধ্বনি তাহার প্রত্যেকটি অর্থও তেমন ধ্বনি ঃ—

"অস্মাভিরপি প্রসিদ্ধেভ্যঃ শব্দব্যাপারেভ্যোঽভিধাতাৎপর্য্যলক্ষণা-রূপেভ্যোঽতিরিক্তোব্যাপারো ধ্বনিরিত্যুক্ত এবং চতুষ্কমপি ধ্বনিঃ তদ্‌যোগাচ্চ সমস্তমপি কাব্যং ধ্বনিঃ............ বাচ্যমপি ধ্বনিঃ বাচকোঽপি ধ্বনিঃ।"

আমরাও বলি যে অভিধা তাৎপর্য্য ও লক্ষণা শব্দের অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু তাহা ছাড়াও ধ্বনি বলিয়া আর একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার আছে। ধ্বনি আছে বলিয়া সমস্ত কাব্যকেই ধ্বনি বলা যায়, বাচ্যকেও ধ্বনি বলা যায়, বাচককেও ধ্বনি বলা যায়।

ধ্বনি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে। এখন এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অভিধা, তাৎপর্য্য ও লক্ষণা ব্যাপারের দ্বারা যে অর্থ বুঝা যায় ব্যঞ্জনার দ্বারা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ দ্যোতিত হয়।

যদি বলি "অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া, দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া", এখানে অভিধা অর্থে নৌকা ও তাৎপর্য্য অর্থে নৌকা বাওয়া মাত্র বুঝায়; কোনো খানে মুখ্য অর্থের বাধা হয় নাই, সেইজন্য এখানে কোনও লক্ষণা নাই; অথচ কবিতাটি পড়িলেই মনে হয় যে নৌকা বাওয়ার কথা এখানে প্রধান নয়। নৌকা বাওয়াকে আড়াল করিয়া আর একটি অর্থ এখানে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মনে হয় যেন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে নিরন্তর স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, সেই স্রোতের মধ্য দিয়া কে যেন আমার ছোট 'আমি'র ভেলাটিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এই কবিতারই শেষ দিকে আছে—

"ওগো কাণ্ডারী কেগো তুমি কার হাসিকান্নার ধন, ভেবে মরে মোর মন। কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র কি মন্ত্র হবে গাওয়া।" এখানে ব্যঞ্জনা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে লক্ষণা প্রবল হইয়াছে। কোনও নৌকার কাণ্ডারী হাসিকান্নার ধন হইতে পারে না, এই জন্য কাণ্ডারী শব্দের লাক্ষণিক অর্থ করিতে হয়; কাণ্ডারী বলিতে অন্তর্য্যামী পুরুষ যাঁহাকে আমরা হাসিকান্নার মধ্য দিয়া লাভ করি, তাহাকেই বুঝিতে হয় নতুবা কবিতার অর্থ টিকে না। কিন্তু অন্তর্য্যামীকে কাণ্ডারী শব্দের দ্বারা বুঝাইতে গিয়া একটু মৃদু ব্যঞ্জনাও প্রকাশ পাইয়াছে। কাণ্ডারী শব্দের দ্বারা অন্তর্য্যামী পুরুষকে লক্ষিত করার উদ্দেশ্য এই যে নৌকার কাণ্ডারী যেমন আমাদিগকে আমাদের গন্তব্য পারে পৌছাইয়া দেয়, অন্তর্য্যামীও তেমনি, আমাদিগকে আমাদের অজ্ঞাত অথচ ঈপ্সিত কূলের দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। এই কবিতাটিতে কবি যদি আমাদিগকে লক্ষণার ব্যবহার করিতে বাধ্য না করিতেন এবং কেবল মাত্র নৌকা কথার মধ্য দিয়া ভঙ্গীতে জীবনের গভীর তাৎপর্য্যের

কথা প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে কাব্য হিসাবে ইহার মর্য্যাদা অনেক বাড়িত। যাহা হৌক ধ্বনি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন বলিবার কথা এইটুকু যে বৈয়াকরণ যেমন অখণ্ড একটি শব্দ-স্ফোট ও অর্থ-স্ফোট মানেন, আলঙ্কারিক ও তেমনি ব্যঞ্জনারূপ ব্যাপারের দ্বারা কাব্যের প্রাণ স্বরূপ একটি স্বতন্ত্র স্ফোট মানেন।

একটি শব্দের বিভিন্ন অংশ পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন ও ধ্বংস হইলে যেমন একটি অখণ্ড শব্দের প্রতীতি উৎপন্ন হয়, অভিধা, তাৎপর্য্য বা লক্ষণা শক্তির উদয় ও ধ্বংসের পরও তেমনি অনেক সময়ে একটি নূতন অর্থ, একটি নূতন চমৎকার জনক তুলনা কিংবা একটি অখণ্ড রস তেমনি ভাবে চিত্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

আমাদের এই আলোচনার তাৎপর্য্য এই যে, বৈয়াকরণের পদরেখা অনুসরণ করিয়া আলঙ্কারিক তাঁহার ধ্বনি-মত গড়িয়া তুলিয়াছেন। বৈয়াকরণের সহিত আলঙ্কারিকের যোগ অন্য দিক্ দিয়াও দেখান যাইতে পারে। বৈয়াকরণ বলেন যে জাতি দ্রব্য ক্রিয়া এবং গুণ এই চারি প্রকার বস্তুকে শব্দ বুঝাইয়া থাকে। সাধারণতঃ বাক্যের মধ্যে যে সমস্ত পদ থাকে তাহার প্রত্যেকটীই বিশেষ পদার্থকে বুঝাইয়া থাকে। যখন বলি 'ঘোড়া দৌড়াইতেছে' তখন আমরা কোনো একটি বিশেষ ঘোড়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকি, কিন্তু ঘোড়া শব্দ যদি কেবল মাত্র কোনো একটি বিশেষ ঘোড়াকে বুঝায় তবে অন্য ঘোড়াকে আর ঘোড়া বলা যায় না, অতীত ও অনাগত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত ঘোড়াকে একত্র পাওয়া যায় না এবং সেইজন্য আলাদা আলাদা করিয়া অনন্ত ঘোড়াকে ঘোড়া শব্দ দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় না। কারণ অনন্ত ঘোড়ার প্রত্যেকটীকে পৃথক পৃথক ভাবে বুঝানই যদি ঘোড়া শব্দের তাৎপর্য্য হয়, তবে আমাদের পক্ষে ঘোড়া শব্দের অর্থ বুঝা সম্ভব হয় না, কারণ অনন্ত

ঘোড়াকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। এইজন্য যদিও বিশেষ বিশেষ ঘোড়া সম্বন্ধেই আলোচনা করিবার জন্য ঘোড়া শব্দের ব্যবহার, তথাপি ঘোড়া শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে এই শব্দ ঘোড়া জাতিকে বুঝায় ইহাই বলিতে হয়। অশ্বত্ব আছে বলিয়াই অশ্বকে অশ্ব বলা হয়। অশ্বত্বের পরিকল্পনা না করিলে এবং অশ্বত্বের সহিত গোত্বের পার্থক্য না থাকিলে অশ্বকে অশ্ব এবং গোরুকে গোরু বলা যাইত না। অশ্ব এই বিশেষ অশ্ব-বোধের অশ্বত্বই প্রাণস্বরূপ। অশ্বত্ব কি তাহা জানা না থাকিলে অশ্ব কথার কোনো অর্থ হয় না। জাতির স্বরূপ বোধের দ্বারা কোনও পদার্থের সাধারণ বোধ জন্মিলে তবেই বিশেষ গুণ পরিকল্পনার দ্বারা বস্তুকে আমরা তাহার বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপে জানিতে পারি। গুণের স্বভাব এই যে তাহা কোনও বস্তুতে সংক্রমিত হইতে পারে এবং সেখান হইতে চলিয়া যাইতেও পারে, তাহাতে ইহার সত্তার কোনো ব্যাঘাত হয় না। তাহা ছাড়া আরো একটি বিশেষত্ব এই যে, গুণের সহিত ক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নাই, গুণমাত্রেরই বস্তুর সহিত সৎস্বরূপে প্রতিভান হয় অথচ তাহার ব্যত্যয় হইলে পদার্থের স্বরূপের পরিবর্ত্তন হয় না। এই কাঠখানি শাদা, ইহাতে কালো রং লাগাইলে কালো হইবে, কিন্তু তথাপি কাঠ না হইয়া অন্য কোনো বস্তু হইবে না। জাতি ও গুণ ছাড়া আর একটি বস্তু আছে যাহাকে আমরা ক্রিয়া বলিয়া থাকি, পূর্ব্বকাল ও পরকাল অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ এই দুই ক্ষণকে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ দুই ক্ষণকে অবয়বস্বরূপ করিয়া যাহার প্রকৃতি গড়িয়া উঠে তাহাকে ক্রিয়া বলা হয়। ক্রিয়া বলিলে কোনও নিষ্পন্ন বা সিদ্ধ বস্তুকে বুঝায় না, যাহা হইতেছে বা হইবে তাহাকেই বুঝায়। "হইয়াছে" বলিলেও বুঝায় এই যে, অতীত কালে পূর্ব্ব ও পরক্ষণ লইয়া একটি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। ক্রিয়া মাত্রেই ব্যাপারকে বুঝায়,

হওয়াকে বুঝায়। ইহা ছাড়া কোনও বিশেষ বিশেষ পদার্থের কোনও একটীকে মাত্র বুঝাইবার জন্য অনেক সময় ইচ্ছামত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কোনও একটি শিশু জন্মিলে তাহার পিতামাতা তাহার নাম রাখেন; সেই নামের সহিত সেই শিশুর কোনও সম্বন্ধ নাই, যাহার নাম সাতকড়ি তাহার সহিত সাতটী কড়ির কোনই সম্বন্ধ নাই। এই জাতীয় শব্দকে যাদৃচ্ছিক শব্দ বলে। বৈয়াকরণ বলেন যে এই চারি প্রকার অর্থেই শব্দের ব্যবহার হয়। মীমাংসক বলেন যে চারি প্রকার অর্থ মানিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

যাহাকে গুণ বা ক্রিয়া বলা হয় তাহার একটা জাতি আছে এইরূপ স্বীকার করা চলে। শঙ্খ শাদা, দুধও শাদা, চূণও শাদা, অথচ ইহাদের প্রত্যেক শাদারই বিশেষ বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও শাদা বলিয়া একটি সাধারণ জাতি মানা যাইতে পারে, শাদা বলিলেই সেই সাধারণ জাতিকেই বুঝায়। বৈয়াকরণ ইহার উত্তরে বলেন যে শাদাগুণটী এক হইলেও বিভিন্ন বস্তুর মধ্য দিয়া তাহার বিভিন্ন প্রকার প্রকাশ হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের ভেদ দেখিলেও শাদা একটি স্বতন্ত্র গুণ, সেইজন্যই সকল শাদা বস্তুকে তাহাদের ভেদ সত্ত্বেও আমরা শাদা বলিয়া থাকি। কিন্তু তাই বলিয়া শাদা বলিয়া কোনো জাতি স্বীকার করা যায় না, কারণ শাদাকে বিশ্লেষণ করিয়া এমন কতকগুলি পদার্থ পাই না, যাহা সমস্ত শাদা জিনিষের মধ্যে সমবেত হইয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন গোরুর মধ্যে এককালে যাহা সমবেত হইয়া থাকে তাহাকেই জাতি বলা যায়। কিন্তু শাদা একটি অখণ্ড গুণ; বিভিন্ন বস্তুতে থাকাতে সেই আশ্রয়ের বৈচিত্র্যবশতঃ তাহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের শাদার মধ্যে একটি শাদা জাতি রহিয়াছে ইহা আমাদের গুণ বোধের প্রতিকূল। একটা গুণই নানাস্থানে নানারূপ

দেখায় এইজন্য গুণকে জাতি বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে অভিধাবৃত্তি-মাতৃকাতে মুকুল ভট্ট লিখিয়াছেন—

“যথাহ্যেকমেব মুখং তৈলবজ্রোদকাদর্শাদীনাং প্রতিবিম্বাবগতি-নিবন্ধনানাং ভেদাৎ নানাকারত্বেন প্রত্যবভাসতে তথা একৈব শুক্লাদি-ব্যক্তির্দেশকালাবচ্ছিন্না তৎতৎকারণসামগ্র্যুপজনিত-শঙ্খাদ্যাশ্রয়বিশেষ-বশেন নানারূপতয়া অভিব্যক্তিম্ আসাদয়ন্তী বিচিত্রমেব স্যাৎ। অতশ্চ তস্যাঃ শুক্লাদিব্যক্তেরেকত্বাৎ জাতেশ্চ ভিন্নাশ্রয়সমবেতত্বাৎ শুক্লত্বাদি জাত্যভাবাৎ ন শুক্লাদিশব্দানাং জাতিশব্দত্বং”।

যেমন একই মুখ তেল, মণি, জল ও আদর্শে বিভিন্ন প্রকারে প্রতি-বিম্বিত হয় বলিয়া নানারূপ দেখায়, তেমনি একই শুক্লাদিগুণ বিভিন্ন দেশকাল অনুসারে ও বিভিন্ন কারণসামগ্রীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সংখ্যাদি বিভিন্ন বস্তুর আশ্রয়বশতঃ বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জন্য শুক্লাদিগুণকে এক বলিয়া ধরা যায়। জাতিস্থলে বিভিন্ন আশ্রয়ে একই ধর্ম্ম সমবেতভাবে থাকে। কিন্তু শুক্লাদির সেরূপ জাতি স্বীকার করা যায় না, শুক্লাদি শব্দেরও জাতিশব্দত্ব স্বীকার করা যায় না।

মীমাংসক বলেন যে সকল শব্দেরই জাতিতে শক্তি, তথাপি জাতি লইয়া আমাদের ব্যবহার চলে না, এইজন্য জাতিতে শক্তি হইলেও জাতির মধ্য হইতে ব্যক্তিকে অর্থাৎ বিশেষ বস্তুটাকে আক্ষেপে টানিয়া লই। নৈয়ায়িক বলেন যে কোনও শব্দের দ্বারা আমরা জাতি বিশিষ্ট পদার্থকে বুঝিয়া থাকি। বৌদ্ধদের মতে সমস্তই ক্ষণিক, সেইজন্য তাঁহারা সত্তা মানেন না। তাঁহারা বলেন যে, কোনও একটি শব্দ দিয়া যে আমরা কোনও একটি পদার্থকে বুঝি, তাহার কারণ এই যে সেই শব্দের বলে সেই বিশেষ পদার্থটি ছাড়া অন্য সমস্ত পদার্থ নিষিদ্ধ হয়। সমস্ত নিষিদ্ধ হইলে যেটি পড়িয়া থাকে, শব্দের দ্বারা সেইটিকে বুঝি। তাঁহারা

বলেন যে জাতিকে আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ব্যক্তি ত প্রতিক্ষণেই ধ্বংস পাইতেছে, অতএব কোনও একটি ক্ষণে কোনও একটি শব্দ দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী একটি বস্তু ছাড়া সমস্ত বস্তুর নিষেধ প্রতিপন্ন হয় এবং এই নিষেধের দ্বারা কোনও একটি ক্ষণের কোনও একটি বস্তুকে বুঝিতে পারি। সমস্ত অনশ্বের নিষেধের দ্বারা অশ্বের প্রতীতি হয়। শব্দ শক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকিলেও, আলঙ্কারিকেরা বৈয়াকরণের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য শব্দব্যাপারবিচারগ্রন্থে মম্মট ভট্ট অন্যমত নিরাকরণ করিয়া বৈয়াকরণের মতই স্বমত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—

"নৈতাসাং ভিন্নেষু অভিন্নাভিধানপ্রত্যয়হেতুর্জাতির্ঘটতে ইতি চত্বার্য্যেব শব্দ-প্রবৃত্তি-নিমিত্তানি।"

শব্দের অভিধা এবং লক্ষণা বলিয়া যে দুই বৃত্তি অলঙ্কারিকেরা স্বীকার করিয়াছেন তাহাতেও বৈয়াকরণদেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। বৈয়াকরণদের পদবী অবলম্বন করিয়া অভিনবগুপ্ত ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিকেও বৈয়াকরণদের স্ফোটের ন্যায় একরূপ স্ফোট বলিয়াছেন—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইজন্য এইরূপ অনুমান করা যায় যে বৈয়াকরণদের মধ্য হইতেই আলঙ্কারিকদের উৎপত্তি। অভিধা ও লক্ষণা শক্তিকে ন্যায়শাস্ত্রেও মানা হইয়াছে, এই হিসাবে ন্যায়শাস্ত্রের সহিতও অলঙ্কারের সম্পর্ক আছে। কিন্তু নৈয়ায়িক ব্যঞ্জনা স্বীকার করেন না এবং ধ্বনির দ্বারা যে রস অভিব্যক্ত হয় তাহাও স্বীকার করেন না। সাংখ্য ও বেদান্তের সহিতও অলঙ্কার শাস্ত্রের রসঘটিত মতের অনেক সাদৃশ্য আছে ; সে কথা প্রসঙ্গান্তরে বলা হইবে।

শাস্ত্রধারা

অলঙ্কার শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে যে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা এই ঃ—শব্দ ও তাহার শক্তিবিচার, ব্যঞ্জনা নামে পৃথক্ বৃত্তির সংস্থাপনের চেষ্টা, ব্যঞ্জনার প্রকার ও রস সম্বন্ধে বিচার, কাব্যের দোষগুণ ও অলঙ্কারনির্ণয়, কত রকম কাব্য হইতে পারে তাহার আলোচনা। কোনও কোনও গ্রন্থে ইহার সকলগুলি লইয়াই আলোচনা হইয়াছে এবং কোনও কোনও গ্রন্থে ইহাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা প্রধানতঃ রস সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে অলঙ্কার শাস্ত্রের সাধারণ ইতিহাস সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোনও অতি প্রাচীন গ্রন্থে অলঙ্কার শাস্ত্রের উল্লেখ নাই। ললিতবিস্তর-গ্রন্থে নানা শাস্ত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে কাব্যকরণ শাস্ত্র বলিয়া এক শাস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। পাণিনির মধ্যেও কৃশাশ্ব ও শিলালিন্ নামক দুইজন নটসূত্রকর্ত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর-গ্রন্থেও নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ আছে; ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বোধ হয় খৃষ্টপূর্ব্বে গ্রন্থাকারে কোনও অলঙ্কারশাস্ত্র লিখিত হয় নাই। নবম ও দশম শতকের রাজশেখর তাঁহার কাব্য-মীমাংসা-গ্রন্থে কাব্যবিদ্যা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রাচীন লেখকের নাম করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সহস্রাক্ষ, উক্তি-গর্ভ, সুবর্ণনাভ, প্রচেতায়ন, চিত্রাঙ্গদ, শেষ, পুলস্ত্য, ঔপকায়ন, পারাশর, উতথ্য, কুবের, কামদেব, নন্দিকেশ্বর, ধিষণ, উপমন্যু ও কুচমার যথাক্রমে কবিরহস্য, ঔক্তিক,

রীতিনির্ণয়, আনুপ্রাসিক, যমক, শব্দশ্লেষ, বাস্তব, ঔপম্য, অতিশয়, অর্থশ্লেষ, উভয়ালঙ্কারিক, বৈনোদিক, রূপক-নিরূপণীয়, রসাধিকারিক, দোষাধিকরণ, গুণৌপাদানিক এবং ঔপনিষদিক রচনা করেন। এই সব গ্রন্থকারদিগের কাহারও কাহারও নাম বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই জানা নাই; তাঁহারা কোন্ কালে ছিলেন বা তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহারা কি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন তাহা সমস্তই আমাদের অজ্ঞাত।

ভরতের নাট্যসূত্রখানি প্রাচীন গ্রন্থ। খৃষ্টীয় দশম শতকে অভিনবগুপ্ত ইহার একটী টীকা করেন ও সেই টীকাতে ভট্টলোল্লট ও শ্রীশঙ্কুক প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারের উল্লেখ করেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে যে অবস্থায় ভরতের নাট্যসূত্রখানি এখন পাওয়া যায়, অভিনবগুপ্তের ২০০ বা ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি সেই অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু গ্রন্থখানি প্রথম যে অবস্থায় রচিত হয় তাহার পর কোহল ও নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি স্বকীয় রচনা ইহার সহিত যোগ করিয়া ইহার অনেক পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু ভরতের নাট্যসূত্রখানি প্রথম কখন রচিত হয় এবং কোন্ সময় বা কোহল প্রভৃতির দ্বারা তাহা পরিবর্ত্তিত হয়— নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। ভরতকে অনেক সময় তৌর্য্যত্রিক-সূত্রকার বা নাট্যসূত্রকার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ যে কেবল সূত্রাকারে লিখিত, তাহা নহে। যদিও রস-প্রকরণে স্থানে স্থানে তাঁহার লেখা সূত্র-জাতীয় বলিয়া মনে হয়, তথাপি অনেক স্থানই কারিকাতে রচিত। হয়ত এমন হইতে পারে, যে গোড়ায় গ্রন্থখানি সূত্রাকারেই রচিত হইয়াছিল কিন্তু পরবর্ত্তীদের হাতে পড়িয়া তাহা অনেক স্থলে কারিকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি খৃষ্টীয়

তৃতীয়-চতুর্থ শতকের পরবর্ত্তী কালে রচিত নহে—ইহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভামহ ও কালিদাসের লেখা পড়িলে মনে হয় যে তাঁহারা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কথা জানিতেন। তবে গ্রন্থখানি আরো কতপূর্ব্বে রচিত এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। অভিনব গুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের অনেকগুলি টীকাকারের নাম করিয়াছেন—যথা লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, কীর্ত্তিধর। ইহা ছাড়া উদ্ভট, রাহুল, ভট্টযন্ত্র ও মাতৃগুপ্তাচার্য্য প্রভৃতি হয় টীকা লিখিয়াছিলেন, নয় নাট্যশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু অভিনব গুপ্তের টীকা ছাড়া অন্য কোনো টীকা পাওয়া যায় না। উদ্ভট সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর লোক ছিলেন। সম্ভবতঃ শঙ্কুক ও একরূপ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকের টীকাতে হৃদয়দর্পণ-নামক গ্রন্থ হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; এই গ্রন্থখানি ভট্টনায়কের লেখা বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু এখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ কি নাট্যশাস্ত্রের টীকা—তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। অভিনব গুপ্তের নাট্য-শাস্ত্রের টীকার নাম অভিনবভারতী। এই টীকাতে অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়ক, ভট্টলোল্লট ও শঙ্কুক প্রভৃতির ধ্বনি-বিরোধী মতগুলি খণ্ডন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। যতদূর মনে হয়, তাহাতে হৃদয়-দর্পণখানি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। ভট্টনায়ক নাট্যশাস্ত্রের উপর স্বতন্ত্র টীকা লিখিয়াছিলেন কিনা তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। ব্যঞ্জনা দ্বারা যে রসবোধ হয়—তাহা ভট্টনায়ক মানিতেন না, এবং ইহা লইয়াই তাঁহার সহিত অভিনবগুপ্তের কলহ। ভট্টনায়ক আনন্দবর্দ্ধনের পরবর্ত্তী লোক ছিলেন; এইজন্য তিনি নবম শতকের শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার বৃত্তিতে ভামহের নাম করিয়া গিয়াছেন।

উদ্ভটালঙ্কারের টীকাকার প্রতীহারেন্দুরাজ লিখিয়া গিয়াছেন যে উদ্ভট ভামহ-বিবরণ নামে ভামহের অলঙ্কারের উপর এক টীকা লেখেন। অভিনবগুপ্ত, হেমচন্দ্র ও সমুদ্রবন্ধ এই টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্ভটের সমসাময়িক বামন যে ভামহের গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বামনের লেখায় স্থানে স্থানে ভামহের বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের অনুমান করিতে হয় যে ভামহ উদ্ভট ও বামনের পূর্ব্ববর্ত্তী। অর্থাৎ তিনি অষ্টম শতকের প্রাক্তন কালের লোক। ভামহ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তিনি দিঙ্-নাগের 'কল্পনাপোঢ়ম্' অর্থাৎ যাহা কল্পনাবিরহিত তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলা যায়, দিঙ্নাগের এই প্রত্যক্ষ লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব পঞ্চম শতক হইতে অষ্টম শতকের মধ্যে কোনো এক সময়ে ভামহ মেধাবিরুদ্র প্রভৃতি অনেকের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া স্বকীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে ভামহ লিখিয়াছেন :—

"ইতি নিগদিতাস্তাস্তা বাচামলংকৃতয়ো ময়া
বহুবিধকৃতীর্দৃষ্ট্বান্যেষাং স্বয়ং পরিতর্ক্য চ।
প্রথিতবচসঃ সন্তোঽভিজ্ঞাঃ প্রমাণমিহাপরে
গুরুতরধিয়ামস্বারাধং মনোঽকৃতবুদ্ধিভিঃ ॥"

অর্থাৎ যে সমস্ত অলঙ্কারের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আহরণ করিতে গিয়া তিনি অনেক প্রাচীন লেখকের নিকট ঋণী। কিন্তু তিনি নিজেও অনেক চিন্তা করিয়া তাহার মধ্যে নবীনতা বিধান করিয়াছেন। তবেই দেখা যাইতেছে যে ভামহের পূর্ব্বেও বহু আলঙ্কারিক অলঙ্কার লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। ভট্টিকাব্যের জয়মঙ্গলা টীকায় লিখিত আছে যে ঐ গ্রন্থের দশম সর্গ ভামহ-কথিত অলঙ্কারের উদাহরণ দেওয়ার জন্যই লিখিত হইয়াছে। এই কথার যথেষ্ট সার্থকতা

আছে—কারণ যদিও অলঙ্কারের অবান্তর-বিভাগ-বর্ণনায় উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়, তথাপি ভট্টিকৃত শ্লোকগুলিতে, ভামহ যে পর্য্যায়ে প্রধান প্রধান অলঙ্কারগুলির বর্ণনা করিয়াছেন, ভট্টিও সেই পর্য্যায়ক্রমে সেই সেই অলঙ্কারের উদাহরণ দিয়াছেন। ভট্টি ও ভামহ পরস্পর প্রায় সমসাময়িক ছিলেন এইরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভট্টিকাব্যের দ্বাবিংশ সর্গে ভট্টি বলিতেছেন যে, আমার এই কাব্য ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝিবার উপায় নাই—এইজন্য ইহা পণ্ডিতের আনন্দের কারণ। মূর্খ এই কাব্য পড়িয়া বুঝিবে না। আমি পণ্ডিতদের ভালবাসি, সেই জন্যই এইরূপ করিয়াছি।

"ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলং।
হতা দুর্ম্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া॥"

ইহাকে শ্লেষ করিয়া ভামহ বলিয়াছেন—শাস্ত্রের ন্যায় কাব্যও যদি ব্যাখ্যা দিয়া বুঝিতে হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতদেরই আনন্দ, মূর্খেরা ত একেবারেই মারা গেল।

"কাব্যান্যপি যদীমানি ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ।
উৎসবঃ সুধিয়ামেব হন্ত দুর্ম্মেধসো হতাঃ॥"

সম্ভবতঃ ভট্টি ভামহের সমসাময়িক ছিলেন।

দণ্ডী কোন্ সময়ের লোক ছিলেন তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি কেহই দণ্ডীর নাম করেন নাই। তবে ইহা অনুমান করা যায় যে সম্ভবতঃ দণ্ডী বামনের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন। দণ্ডী কাব্যে রীতির প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু বামন বলিয়াছেন যে রীতিই কাব্যের আত্মা। ভামহ ও দণ্ডী উভয়েই কথা, আখ্যায়িকা প্রভৃতি কাব্যের বিভাগ লইয়া অনেক ব্যাকুলতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু বামন তাহা অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া লিখিয়াছেন যে ঐ বিষয়ে অন্যের

গ্রন্থ হইতে দেখিলেই চলিবে। এইরূপ ছোটখাট বিষয়ের আলোচনা দ্বারা ইহা মনে করা যায় যে দণ্ডী বামনের পূর্ব্ববর্ত্তী। কেহ কেহ বলেন যে, দণ্ডী যে কর্ম্মকে নির্বর্ত্ত্য, বিকার্য্য, ও প্রাপ্য এই তিন প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন, তাহা তিনি ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয় হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। দণ্ডী ও ভামহের মধ্যে তুলনা করিলে ভামহকেই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয় এবং অনেক সময় ইহাও মনে হয় যে, স্থানে স্থানে, দণ্ডী ভামহকে আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয় জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। দণ্ডীর কাব্যাদর্শের প্রায় ১৩ খানি টীকা আছে। ইহাদের মধ্যে তরুণ বাচস্পতির টীকাখানি ও হৃদয়ঙ্গম টীকাখানি ছাড়া অন্য টীকাগুলি সমস্তই প্রায় আধুনিক কালের।

উদ্ভট ভামহের উপর টীকা লিখিয়াছিলেন এবং ভামহকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্যালঙ্কারসংগ্রহখানি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থখানি পড়িলে বুঝা যায় যে তিনি আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বনিসম্বন্ধীয় মতের সহিত পরিচিত ছিলেন না। উদ্ভটের টীকাকার প্রতীহারেন্দুরাজ অভিধাবৃত্তিমাতৃকার রচয়িতা মুকুলভট্টের ছাত্র ছিলেন। মুকুলভট্ট নবম শতকের ভট্টকল্লটের পুত্র। প্রতীহারেন্দু-রাজ তাঁহার লঘুবৃত্তিনামক টীকায় ভামহ, দণ্ডী, বামন ও আনন্দবর্দ্ধনের গ্রন্থ হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বামন স্বকীয় গ্রন্থে উত্তররামচরিত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ভবভূতি ছিলেন অষ্টম শতকের লোক। সেইজন্য ইহা বলা যায় যে বামন অষ্টম শতকের পরবর্ত্তী লোক ছিলেন। আবার দশম শতকের রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় বামনের পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বামন আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। কারণ বামনের 'রীতিই কাব্যের আত্মা' এই মতের উপর আনন্দবর্দ্ধন বিশেষ

কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে বামন ও উদ্ভট নবম শতকের লোক ছিলেন—ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। বামন, দণ্ডী ও ভামহ এই তিনজনই রীতির উপর বিশেষ জোর দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বামনই লেখার ভঙ্গী বা রীতিকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধনের সময় হইতেই এই মত ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিল। বামন নিজে সূত্র রচনা করেন ও তাহার নাতিদীর্ঘ বৃত্তি রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম কাব্যলঙ্কারসূত্রবৃত্তি। এই গ্রন্থের গোপেন্দ্রকৃত কামধেনু ও মহেশ্বরকৃত সাহিত্যসর্ব্বস্ব নামে দুইখানি টীকা আছে।

রুদ্রট সম্ভবতঃ নবম ও দশম শতকের লোক ছিলেন। রাজশেখর তাঁহার কাকু-বক্রোক্তি অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। মাঘের টীকাকার দশম শতকের বল্লভদেব রুদ্রটের গ্রন্থের টীকা করিয়াছিলেন। রুদ্রটের গ্রন্থের নাম কাব্যালঙ্কার। রুদ্রট ও রুদ্র বা রুদ্রভট্ট এক ব্যক্তি নহেন। রুদ্র বা রুদ্রভট্ট অনেক পরবর্ত্তী কালের লোক এবং তিনি শৃঙ্গাররসের বর্ণনা লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন। রুদ্রটের গ্রন্থের অন্ততঃ তিনটি টীকা ছিল—বল্লভদেব, নমিসাধু ও আশাধর-কৃত। নমিসাধু একাদশ শতক ও আশাধর ত্রয়োদশ শতকে ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই রুদ্রটালঙ্কারের উপর টীকা লিখিয়াছেন। রুদ্রভট্টের গ্রন্থের উপর গোপালভট্টের রসতরঙ্গিণী নামে একটি টীকা ছিল। আনন্দবর্দ্ধনের গ্রন্থ কতগুলি কারিকা এবং তাহার বৃত্তি। এই গ্রন্থের নাম ধ্বন্যালোক। এই গ্রন্থের উপর অভিনবগুপ্তের টীকার নাম লোচন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী চন্দ্রিকা নামে আর একটি টীকা ছিল। আর চন্দ্রিকার সমালোচনার উদ্দেশ্যেই অভিনবগুপ্ত তাঁহার লোচন টীকাখানি লেখেন। ধ্বন্যালোক নামে যে গ্রন্থের উপর অভিনবগুপ্ত তাঁহার

টীকা প্রণয়ন করেন, তাহার কারিকা ও বৃত্তি এই দুইটি অংশ একজনেরই কৃত কিনা—এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অভিনবগুপ্ত তাঁহার টীকার স্থানে স্থানে কারিকা ও বৃত্তির মতের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের আলঙ্কারিকেরা কোনো সময় কারিকা উদ্ধৃত করিতে গিয়া ধ্বনিকারের কারিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কোনো সময় বা আনন্দবর্দ্ধনের কারিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অভিনব গুপ্তের কথা অনুসারে পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, আনন্দবর্দ্ধন অপেক্ষা কোনো প্রাচীন লেখক কারিকাগুলি রচনা করিয়া ধ্বনি মত স্থাপন করেন। তাহার পরে আনন্দবর্দ্ধন নানা যুক্তির দ্বারা সেই মতের পরিপোষণ করিয়া তাঁহার বৃত্তি লেখেন। এই ধ্বনিকার যে কে ছিলেন এবং কত প্রাচীন ছিলেন তাহা বলা কঠিন। এমনও হইতে পারে যে ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতির কাল হইতেই ধ্বনি-মত চলিয়া আসিতেছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভরতের নাট্যসূত্র ছাড়া আনন্দবর্দ্ধনের প্রাক্তন লেখকদের মধ্যে রসের সম্বন্ধে কোন আলোচনা দেখা যায় না। আনন্দবর্দ্ধন-কৃত দেবীশতকের টীকায় কৈয্যট লিখিয়াছেন—আনন্দবর্দ্ধন বিষমবাণলীলা এবং অর্জ্জুনচরিত নামক দুইখানি কাব্য লিখিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধনের বৃত্তিতে এই দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। অভিনবগুপ্ত বলেন—ইহা ছাড়া আনন্দবর্দ্ধন বিনিশ্চয়টীকা ও তত্ত্বালোক নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

কাশ্মীর-শৈব-মত সম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত বহু দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার অভিনবভারতী ও লোচন-টীকা অলঙ্কার শাস্ত্রের শিরোমণি স্বরূপ। তিনি ইহা ছাড়া কাব্য-কৌতুক নামক গ্রন্থের উপর বিবরণ-নামে একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। এই কাব্য-কৌতুক গ্রন্থখানির প্রণেতা ছিলেন অভিনবগুপ্তের কাব্যগুরু ভট্ট-

তৌত। ভট্টতৌতের কাব্যকৌতুক গ্রন্থ হইতে পরবর্ত্তী কালের লেখকেরা অনেক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া চণ্ডীদাস কাব্যপ্রকাশের দীপিকা-টীকায় ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত লোচন-টীকায় ভট্টতৌত ও ভট্টেন্দুরাজের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত দশম ও একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তাঁহার লোচন-টীকার পরমেশ্বরাচার্য্যকৃত লোচন-ব্যাখ্যা-কৌমুদী এবং কোনো অজ্ঞাতনামা লেখকের অঞ্জনা-নামক দুইখানি টীকা আছে।

রাজশেখর ছিলেন খৃষ্টীয় দশম শতকের লোক। তিনি রাজা মহেন্দ্র-পালের উপাধ্যায় ছিলেন। কাব্যমীমাংসা ছাড়া তিনি বালরামায়ণ, হরবিলাস, ভুবনকোষ, কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ লেখেন। তাঁহার কাব্যমীমাংসা গ্রন্থখানি একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থখানির প্রথম ভাগে তিনি অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থে তাহাদের বর্ণনা পাওয়া যায় না। ক্ষেমেন্দ্র, ভোজ, হেমচন্দ্র, বাগ্‌ভট প্রভৃতি পরবর্ত্তী লেখকেরা তাঁহার কাব্যমীমাংসা গ্রন্থখানির প্রভূত ব্যবহার করিয়াছেন। রাজশেখর নিজেও মেধাবিরুদ্র, উদ্ভট, বামন, রুদ্রট, মঙ্গল, আনন্দ প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

দশরূপকের লেখক ধনঞ্জয় খৃষ্টীয় দশম শতকের লোক ছিলেন। দশরূপকের মধ্যে নাটকের কত রকম বিভাগ হইতে পারে তাহারই কেবল আলোচনা আছে। ধনঞ্জয়ের দশরূপকের উপর ধনিক অবলোক নামক একটি টীকা লেখেন। ইহা ছাড়া নৃসিংহভট্ট, দেবপাণি, কুরবিরাম প্রভৃতি দশরূপকের উপর টীকা প্রণয়ন করেন। প্রায় এই সময়েই অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে কুন্তল বা কুন্তক তাঁহার বক্রোক্তিজীবিত গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থ, শ্লোক ও

তাহার টীকা—এই আকারে লিখিত হইয়াছে। টীকার মধ্যে তিনি কালিদাস, ভবভূতি, অনঙ্গহর্ষ, হালা, বাণ, মাঘ, ভারবি, ভল্লট, অমরু, ময়ূর, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, রাজশেখর প্রভৃতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অভিনবগুপ্ত বা কুন্তক কেহই পরস্পরের উল্লেখ করেন নাই। ভামহ যে বক্রোক্তির কথা বলিয়াছিলেন কুন্তক তাহাই অশেষ নৈপুণ্যের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা, কবিকণ্ঠাভরণ ও কবিকর্ণিকা নামক কয়েকখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ লেখেন; ইহা ছাড়া তিনি নানাজাতীয় প্রায় চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ খানা গ্রন্থ লেখেন। তিনি একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বৃহৎকথামঞ্জরীতে আছে যে ক্ষেমেন্দ্র অভিনবগুপ্তের নিকট সাহিত্যসম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। স্বকৃত স্বচ্ছন্দোদ্দ্যোত ও স্তবচিন্তামণি গ্রন্থে তিনি নিজেও অভিনবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্রের আর একটি নাম ছিল ব্যাসদাস। স্বকীয় অনেক গ্রন্থেই তিনি তাঁহার এই পরিচয় দিয়াছিলেন। ভোজ দশরূপক হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং তিনি সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে তাঁহার সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প্রণয়ন করেন। তিনি ধারা-নগরের অধিপতি ছিলেন। আল্‌বেরুনি ভোজের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার লিখিত রাজমৃগাঙ্ক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ঐ গ্রন্থ তিনি এক হাজার বিয়াল্লিশ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ছাড়া শৃঙ্গার-প্রকাশ নামে ভোজ আর একখানি গ্রন্থ লেখেন। ভোজের সরস্বতীকণ্ঠাভরণ একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ। তিনি তাঁহার গ্রন্থে প্রথম আট পরিচ্ছেদে শব্দশক্তির বিচার করেন। নবম ও দশম পরিচ্ছেদে দোষগুণের বিচার করেন। একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে মহাকাব্য এবং নাটকের লক্ষণ বিচার করেন ও

তৎপরে চব্বিশটি পরিচ্ছেদে রসসম্বন্ধে বিচার করেন। ভোজ বলেন যে শৃঙ্গার রসই প্রধান রস। সারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ প্রধানতঃ ভোজের সরস্বতীকণ্ঠাভরণ অবলম্বন করিয়া লিখিত। ভোজ, দণ্ডী, রুদ্রট, বামন প্রভৃতি হইতে তাঁহার উপাদান সংগ্রহ করেন। তিনি অভিনবগুপ্তের ধ্বনিবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে তাঁহার মত প্রকাশ করেন। মিশ্র রত্নেশ্বর, হরিনাথ, লক্ষ্মীনাথ ভট্ট, জগদ্ধর ও হরিকৃষ্ণ ব্যাস, রত্নদর্পণ, মার্জ্জনা, দুষ্করচিত্রপ্রকাশিকা প্রভৃতি সরস্বতীকণ্ঠাভরণের বিভিন্ন টীকা লিখিয়াছিলেন।

আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্তের মত খণ্ডন করিবার জন্য মহিমভট্ট তাঁহার ব্যক্তিবিবেক গ্রন্থ রচনা করেন। মহিমভট্ট সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। এই জাতীয় মত নিশ্চয়ই আনন্দবর্দ্ধনের সময়ও প্রচলিত ছিল। কারণ আনন্দবর্দ্ধন এই জাতীয় মত খণ্ডন করিয়াছেন। ব্যক্তিবিবেক ছাড়া মহিমভট্ট প্রতিভাতত্ত্ব সম্বন্ধে তত্ত্বোক্তিকোষ নামক একটী গ্রন্থ লেখেন।

মম্মটভট্ট সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। মম্মট কাব্যপ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং এই গ্রন্থে তিনি প্রধানতঃ আনন্দবর্দ্ধনকেই অনুসরণ করেন। গ্রন্থখানি কারিকা ও বৃত্তি এই আকারে লিখিত। মম্মট সমস্ত গ্রন্থখানি নিজেই লেখেন নাই। খানিকটা অংশ অলট নামক একজন লেখক লিখিয়াছিলেন। মম্মটের টীকাকার রুয্যক তাঁহার সঙ্কেত টীকাতে লিখিয়াছেন—"এষগ্রন্থো গ্রন্থকৃতানেন কথমপ্যসমাপ্তত্বাৎ অপরেণ পূরিতাবশেষত্বাৎ দ্বিখণ্ডোঽপি অখণ্ডতয়া যদ্ অবভাসতে তত্র সংঘটনৈব হেতুঃ"। জয়ন্তভট্ট, সোমেশ্বর, নরহরি, সরস্বতীতীর্থ, কমলাকর, আনন্দ, যজ্ঞেশ্বর প্রভৃতি প্রাচীন ও নবীন টীকাকারেরাও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। রাজানক আনন্দ

তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন যে পরিকর অলঙ্কার পর্য্যন্ত মম্মটের লেখা, বাকি অংশটুকু অলটের লেখা—"কৃতঃ শ্রীমম্মটাচার্য্যবর্য্যৈঃ পরিকরাবধিঃ প্রবন্ধঃপূরিতঃ শেষো বিধায়ালটসূরিণা"। অমরুশতকের টীকাকার অর্জ্জুনবর্ম্মা ত্রয়োদশ শতকে কাব্যপ্রকাশ হইতে একটী কবিতা উদ্ধৃত করিবার সময় লিখিয়াছেন—

"যথোদাহৃতং দোষনির্ণয়ে মম্মটালটাভ্যাং"। এই উক্তি হইতে এইরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে যে দোষ প্রকরণ লেখাতেই অলটের হাত ছিল। অনেকে বলেন যে কাব্যপ্রকাশের কারিকাগুলি ভরতের এবং কেবল বৃত্তিটি মম্মটের লেখা। এই উক্তি যুক্তিসহ নহে। কারণ রসপ্রকরণের বৃত্তিতে ভরতের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কারিকাকে সমর্থন করা হইয়াছে। কারিকাগুলি এবং বৃত্তিগুলিও যে এক হাতেরই লেখা তাহাও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কাব্যপ্রকাশের অনেকগুলি টীকা আছে। রাজানক রুয্যক, যিনি অলঙ্কারসর্ব্বস্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তিনিই ইহার উপর সঙ্কেতনামক টীকা লেখেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মাণিক্যচন্দ্র কাব্যপ্রকাশসঙ্কেত নামক আর একটী টীকা লেখেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর নরহরি সরস্বতীতীর্থ লেখেন বালচিত্তানুরঞ্জনী। জয়ন্তভট্ট (ত্রয়োদশ শতাব্দীর) লেখেন দীপিকা। সোমেশ্বর লেখেন কাব্যাদর্শ। বাচস্পতি মিশ্রও ইহার উপর টীকা লেখেন। শ্রীধর লেখেন কাব্যপ্রকাশবিবেক। চণ্ডীদাসও কাব্যপ্রকাশ-দীপিকা নামে টীকা লেখেন। চতুর্দ্দশশতকের বিশ্বনাথ লেখেন কাব্যপ্রকাশদর্পণ। ভাস্কর লেখেন সাহিত্যদীপিকা। পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী লেখেন কাব্যপ্রকাশ-বিস্তারিকা। গোবিন্দঠক্কুর লেখেন কাব্যপ্রকাশপ্রদীপ। এই টীকার উপর বৈদ্যনাথ প্রভানামক টীকা লেখেন এবং নাগোজীভট্ট লেখেন উদ্দ্যোত। জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন লেখেন কাব্যপ্রকাশতিলক। শ্রীবৎসলাঞ্ছন

সারবোধিনী নামক এক টীকা লেখেন। পণ্ডিতরাজ নামক এক ব্যক্তি এক টীকা লেখেন। মধুমতী টীকা লেখেন রবি। রত্নপাণি লেখেন কাব্যদর্পণ। মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার লেখেন ভাবার্থচিন্তামণি। কমলাকরভট্ট কাব্যপ্রকাশের উপর আর একটী টীকা লেখেন। রাজানক আনন্দ লেখেন কাব্যপ্রকাশনিদর্শন। রাজানক রত্নকণ্ঠ লেখেন সারসমুচ্চয়। নরসিংহঠক্কুর লেখেন নরসিংহমনীষা। বৈদ্যনাথ লেখেন উদাহরণচন্দ্রিকা। ভীমসেনদীক্ষিত লেখেন সুধা-সাগর। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ লেখেন সাহিত্যকৌমুদী। এই টীকার সহিত তিনি আর একটী টিপ্পনী জুড়িয়া দেন, তাহার নাম কৃষ্ণানন্দিনী। নাগোজীভট্ট দুইখানি টীকা লেখেন। একটীর নাম লঘূদ্দ্যোত, আর একটীর নাম বৃহদ্-উদ্দ্যোত। রুয্যক সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তিনি কাব্যপ্রকাশসঙ্কেত, অলঙ্কারমঞ্জরী, সাহিত্যমীমাংসা, অলঙ্কারানুসারিণী, ব্যক্তিবিবেকবিচার, নাটকমীমাংসা, উদ্ভটবিচার ও অলঙ্কারসর্ব্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থ লেখেন। সমুদ্রবন্ধ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তিনি রুয্যকের অলঙ্কার-সর্ব্বস্বের উপর এক টীকা লেখেন। বিদ্যাচক্রবর্ত্তী অলঙ্কারসঞ্জীবনী নামে এক টীকা লেখেন। হেমচন্দ্র একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন, তিনি নানাবিষয়ে নানাগ্রন্থ লেখেন। তাঁহার অলঙ্কার সম্বন্ধে প্রধান গ্রন্থের নাম কাব্যানুশাসন। ইহার উপর তিনি নিজেই এক টীকা লেখেন, তাহার নাম অলঙ্কারচিন্তামণি।

অলঙ্কারসাহিত্যে আমরা দুইজন বাগ্‌ভটের নাম পাই—বৃদ্ধ বাগ্‌ভট ও কনিষ্ঠ বাগ্‌ভট। বৃদ্ধ বাগ্‌ভট বাগ্‌ভটালঙ্কার লিখিয়াছিলেন ও কনিষ্ঠ বাগ্‌ভট কাব্যানুশাসন ও তাহার অলঙ্কার-তিলক বৃত্তি লিখিয়া ছিলেন। কনিষ্ঠ বাগ্‌ভট বৃদ্ধ বাগ্‌ভটের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বৃদ্ধ

বাগ্‌ভট হেমচন্দ্রের সমকালীন ছিলেন এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহার অলঙ্কার-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কনিষ্ঠ বাগ্‌ভট হেমচন্দ্রের পরকালীন। বৃদ্ধবাগ্‌ভট-লিখিত বাগ্‌ভটালঙ্কারের জিনবর্দ্ধনসূরি, সিংহদেবগণি, ক্ষেমহংসগণি, গণেশ, রাজহংস উপাধ্যায়, সময়সুন্দর কর্তৃক লিখিত ছয় খানি টীকা আছে। ইহাছাড়া দুইজন অজ্ঞাতলেখক-কৃত আরো দুইখানি টীকা পাওয়া যায়।

অরিসিংহ ও অমরচন্দ্র কবিতারহস্য বা কাব্যকল্পলতা নামক এক খানি কবিতা প্রণয়নের গ্রন্থ লেখেন। ইঁহারা ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। অমরচন্দ্র ঐ গ্রন্থের একখানি টীকাও লেখেন, উহার নাম কবিশিক্ষাবৃত্তি। অমরচন্দ্র অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, যথা ছন্দোরত্নাবলী, কাব্যকল্পলতা, পরিমল, অলঙ্কারপ্রবোধ ইত্যাদি। দেবেশ্বর কবিকল্পলতা নামে আর একখানি গ্রন্থ লেখেন, ইহা পূর্ব্বোক্ত কবিকল্পলতা-প্রণালীতে লেখা। ইনি সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। কাব্য-কল্পলতার একখানি টীকা আছে তাহার নাম মকরন্দ এবং কবিকল্পলতার টীকার নাম বালবোধিকা। ইহা ছাড়া কবিকল্পলতার আধুনিক কালের লিখিত তিন চারিখানি টীকা আছে।

পীযূষবর্ষ বা জয়দেব সম্ভবতঃ পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের লোক ছিলেন। ইনি চন্দ্রালোক নামে একখানি দশ অধ্যায়ের অলঙ্কার-গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থের ছয়টী টীকা পাওয়া যায়। বিদ্যাধর সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তিনি একাবলী নামে একখানি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মল্লিনাথ তাহার তরলা নামক টীকা করেন। বিদ্যানাথ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক ছিলেন এবং তিনি প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ নামক একখানি প্রসিদ্ধ এবং বৃহৎ অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। মল্লিনাথের পুত্র কুমারস্বামী পঞ্চদশ শতাব্দীতে

রত্নাপণ নামে এক টীকা করেন। বিশ্বনাথ সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতকের লোক ছিলেন। তিনি সাহিত্যদর্পণ নামে অতি প্রসিদ্ধ একটী অলঙ্কারের গ্রন্থ লেখেন। তিনি সাহিত্যদর্পণ ছাড়া রাঘববিলাস, কুবলয়াশ্বচরিত, প্রভাবতীপরিণয়, প্রশস্তিরত্নাবলী ও চন্দ্রকলা নামক গ্রন্থ রচনা ও কাব্য প্রকাশের উপর একটী টীকা লেখেন এবং নরসিংহ-বিজয় নামক একটী কাব্যও লিখিয়াছিলেন। সাহিত্যদর্পণের অনন্তদাস-কৃত লোচন, মথুরানাথ-কৃত টিপ্পনী, রামচরণ তর্কবাগীশ-কৃত বিবৃতি ও গোপীনাথ-কৃত প্রভা—এই চারিখানি টীকা পাওয়া যায়।

সারদাতনয়-কৃত ভাবপ্রকাশিকা, সিংহভূপাল-কৃত রসার্ণব, ভানু-দত্তকৃত রসমঞ্জরী ও রসতরঙ্গিণী অলঙ্কার সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। রস-মঞ্জরীর প্রায় দশখানা টীকা পাওয়া যায় ও রসতরঙ্গিণীরও প্রায় দশখানা টীকা পাওয়া যায়। ভানুদত্তকৃত অলঙ্কারতিলক গ্রন্থখানিও উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর রূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি-নামক এক রসগ্রন্থ লেখেন। জীবগোস্বামী তাহার লোচনরোচনী নামক এক টীকা লেখেন। রূপগোস্বামী ইহা ছাড়া নাটকচন্দ্রিকা নামক একটী নাট্যগ্রন্থ লেখেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আনন্দচন্দ্রিকা নামে উজ্জ্বলনীল-মণির একটী টীকা লেখেন। ইহা ছাড়া আরো দুইখানি টীকা পাওয়া যায়। শিবানন্দসেনের পুত্র কবিকর্ণপুর ষোড়শ শতাব্দীতে অলঙ্কার-কৌস্তুভ নামক একগ্রন্থ লেখেন এবং তাঁহার পুত্র কবিচন্দ্র কাব্যচন্দ্রিকা নামে আর একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ লেখেন। ষোড়শ শতাব্দীতে কেশব মিশ্র অলঙ্কারশেখর নামক এক গ্রন্থ লেখেন। অপ্পয় দীক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তিনি কুবলয়ানন্দ, চিত্রমীমাংসা ও বৃত্তি-

বার্ত্তিক নামে তিনখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ লেখেন। কুবলয়ানন্দের অলঙ্কার-চন্দ্রিকা, অলঙ্কারদীপিকা, রসিকরঞ্জনী, অলঙ্কারসুধা, কাব্যমঞ্জরী, কুবলয়ানন্দটিপ্পনী, লঘ্বলঙ্কারচন্দ্রিকা, বুধরঞ্জনী ও মথুরানাথ-কৃত স্বতন্ত্র টীকা—এই নয়খানি টীকা পাওয়া যায়। চিত্রমীমাংসারও সুধা, গূঢ়ার্থ-প্রকাশিকা ও চিত্রালোক নামে তিনটী টীকা পাওয়া যায়।

ভামিনী-বিলাসের গ্রন্থকর্ত্তা জগন্নাথ সপ্তদশ শতকের লোক ছিলেন এবং তিনি দারা সিকোর অনুগৃহীত ছিলেন। তিনি রসগঙ্গাধর নামে অলঙ্কার-গ্রন্থ লেখেন। ইহা ছাড়া তিনি অপ্পয়দীক্ষিতের মত খণ্ডন করিয়া চিত্রমীমাংসা-খণ্ডন নামে একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ লেখেন। ইহা ছাড়া ভট্টোজীদীক্ষিতের মনোরমা-নামক ব্যাকরণ-গ্রন্থের খণ্ডন করিয়া মনোরমাকুচমর্দ্দন-নামক গ্রন্থ লেখেন। রসগঙ্গাধরের গুরুমর্ম্ম-প্রকাশিকা নামে নাগেশভট্ট-কৃত একটী টীকা ও বিষমপদী নামে আর একটী টীকা আছে। নাগেশভট্ট ঐ টীকা ছাড়া গোবিন্দকৃত কাব্য-প্রকাশের প্রদীপ টীকার উপর বৃহৎ ও লঘূদ্দ্যোত নামক দুই টীকা লেখেন ও কাব্য-প্রকাশের উপর উদাহরণ-দীপিকা নামে এক টীকা লেখেন ও অপ্পয়ের কুবলয়ানন্দের উপর অলঙ্কারসুধা ও বিষমপদব্যাখ্যান-ষট্‌পদানন্দ নামে দুই টীকা লেখেন ও ভানুদত্তের রসমঞ্জরী ও রস-তরঙ্গিণীর উপর দুইখানি টীকা লেখেন। উপরি উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া অলঙ্কার-সাহিত্যে আরো শতাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে। কিন্তু গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে তাহাদের উল্লেখ করিলাম না।

দোষ, গুণ ও রীতি

ভরতের নাট্যশাস্ত্র কত প্রাচীন তাহা বলা যায় না। কতটুকু ভরতের নিজের লেখা এবং কতটুকু কোহল এবং নন্দিকেশ্বরের লেখা তাহাও বলা যায় না। বহুপ্রাচীন কালে কাব্য লেখা হইত কিনা তাহা আমরা জানি না। সাধারণতঃ বাল্মীকিকেই আদিকবি বলিয়া বলা যায়। কিন্তু নাট্যপ্রয়োগ যে অতি প্রাচীন কালের সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। পাণিনিতে নটসূত্র-কর্ত্তাদের উল্লেখ আছে। ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে ব্রহ্মা দেবদৈত্য সকলের উপকারের জন্য নাট্যবেদ প্রণয়ন করেন।

> "অলং বো মন্যুনা দৈত্যা বিষাদং ত্যজতানঘাঃ।
> ভবতাং দেবতানাং তু শুভাশুভবিকল্পকঃ।
> কর্ম্মভাবান্বয়াপেক্ষী নাট্যবেদো ময়া কৃতঃ॥"

নাট্যের উদ্দেশ্য বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সকলের হৃদয়-ভাব প্রকাশ করাই নাট্যের উদ্দেশ্য—

> "ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্ব্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্ত্তনং"।

তাহার পরে তিনি আরও বলিতেছেন—

> "নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকং।
> লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্॥
> দুঃখার্ত্তানাং শ্রমার্ত্তানাং শোকার্ত্তানাং তপস্বিনাং।
> বিশ্রান্তি-জননং কালে নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি॥"

ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্।
লোকোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥
ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
নাসৌ যোগো ন তৎ কর্ম্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ॥

দুঃখার্ত্ত ও শ্রমার্ত্তের নাট্যই বিশ্রামস্থল। নাট্য হইতে ধর্ম্ম ও যশ আহরণ করা যায় ও নাট্য আয়ুর্বৃদ্ধিকর ও বুদ্ধিবর্দ্ধন। নাট্য হইতে উপদেশ লাভ করা যায় এবং এমন বিদ্যা নাই, এমন জ্ঞান নাই, এমন শিল্প নাই যাহা পাওয়া যায় না। লোকচরিত্রের অনুকরণ করাই নাট্যের উদ্দেশ্য ; চিত্র-বিদ্যা ও নৃত্যবিদ্যা এই উভয়ই নাট্যের অঙ্গস্থানীয়। ভরতের নাট্য-শাস্ত্রে অভিনয়ের নৃত্যাবয়ব অর্থাৎ করণ, অঙ্গহার, মুদ্রা প্রভৃতির প্রচুর বর্ণনা আছে। এই সমস্ত বর্ণনা এত সুনিপুণ ভাবে করা হইয়াছে যে ইহা কিছুতেই মনে করা যায় না যে, ভরতের নাট্যশাস্ত্রেই ইহাদের প্রথম আবির্ভাব। এ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা, অনেক গবেষণা, অনেক গ্রন্থ লেখা হইলে, বহুশত বর্ষের চেষ্টার ফলে এই জাতীয় লেখা সম্ভব হয়। রস ও ভাব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভরত বলিয়াছেন যে সূত্র ও ভাষ্যে যাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয় তাহা সংক্ষেপে বলিলে তাহাকে সংগ্রহ বলে। ভরত নিজে এইরূপ একটী সংগ্রহ শ্লোক রচনা করিয়া বিস্তারিত ভাবে কারিকাতে তাহার পুনরায় বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সূত্রভাষ্য গেল কোথায় ? তাহা ছাড়া ইহার কিছু পরে তিনি আবার বলিতেছেন যে এখন আমি সূত্র গ্রন্থের বিকল্পনা করিব। ইহা বলিয়া কতকগুলি গদ্য পংক্তি লিখিয়াছেন, সেগুলি সূত্রেও নয়, শ্লোকও নয়। শুধু তাহাই নহে, মধ্যে মধ্যে তিনি অন্যস্থান হইতে শ্লোক আহরণ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন—এইরূপও মনে হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ভরতের পূর্ব্বে রস সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছিল। এবং

ভরত সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। এই জন্য ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে নাট্যে রসবাদ অতি প্রাচীন কাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। নাট্য যদি মানব-চরিত্রের অনুকরণ হয় এবং মানব-চরিত্রের মধ্যে রস যদি একটী প্রধান বস্তু হয়, এবং রসের সহিত প্রকাশিত না হইলে মানুষের চিত্তবৃত্তি অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ করা যদি অসম্ভব হয়, তবে নাট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই রস সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া পারা যায় না। ধ্বনিকার ও আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিকেরা সকলেই প্রায় কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহারা রসের কোনো বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কাব্যের কার্য্য-কাহিনী বলা অভিনয় নয়—এই জন্য বলার ভঙ্গীর উপরই নানা ভাবে জোর দিয়া অনেকে কাব্যের স্বরূপনির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ বা বলিয়াছেন অলঙ্কারই কাব্যের সর্ব্বস্ব। কেহ বলেন লিখিবার রীতির উপরই কাব্যত্ব নির্ভর করে, আবার কেহ বা বলিয়াছেন বাক্যের ভঙ্গীই কাব্যের সার। কেহ ইহাও বলিয়াছেন সহজ কথা সুন্দররূপে ঘুরাইয়া বলিতে পারিলেই কাব্যের মাধুর্য্য হয়। ভরতের পরবর্ত্তী লেখকদের মধ্যে কেবল ধ্বনিকার ও আনন্দবর্দ্ধনই প্রথম এই কথা বলেন যে, নাট্যে যেমন রসের প্রয়োজন, কাব্যেও তেমনি রসের প্রয়োজন। এবং রসমাধুর্য্যের উপরই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু ধ্বনিকার ও আনন্দবর্দ্ধনের লেখা হইতে বুঝা যায় যে, ভরত রস সম্বন্ধে যেটুকু বলিয়াছেন, ভরত ও ধ্বনিকারের অন্তর্বর্ত্তী কালে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আলোচনা হইয়াছিল। অনেক আলোচনা না হইলে ধ্বনিকার ও আনন্দবর্দ্ধনের লেখায় রস-ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে যে রূপ স্ফুট অলোচনা দেখা যায়, সেরূপ আলোচনা হইতে পারিত না। দুঃখের

বিষয় এই যে, ধ্বনিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী এমন কোনো লেখকের কথাই জানা নাই, যাঁহারা রসসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। সম্ভবতঃ এই সমস্ত লেখক ভরতকে অনুসরণ করিয়াই নাট্য শাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে রসের আলোচনা করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই কাব্য সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া ভামহ, দণ্ডী, বামন প্রভৃতি তাঁহাদের কোনো উল্লেখ করেন নাই।

যাহা হৌক, রসসম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব এবং সেই সঙ্গে রস সম্বন্ধে ভরতের মতের সহিত তদীয় টীকাকারদিগের মতের ও ধ্বনিকার এবং আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতির মতের তুলনা ও সমালোচনা করিব। তাহার পূর্ব্বে যাঁহারা অলঙ্কার ও রীতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বক্রোক্তিজীবিতকার কুন্তকের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা আবশ্যক।

নাট্যের মধ্যে কথোপকথন-চ্ছলে বাক্যপ্রয়োগ অত্যাবশ্যক। এই জন্য ভরত বাক্যের গুণ-দোষ ও অলঙ্কার সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের ষোড়শ অধ্যায়ে এইগুলিকে তিনি কাব্যলক্ষণ বলিয়া বলিয়াছেন। এই লক্ষণগুলির মধ্যে নাট্যের অংশ-বিশেষের সহিত পরস্পরের সম্পর্কে অর্থাৎ সন্ধ্যঙ্গ ও বৃত্ত্যঙ্গও আলোচিত হইয়াছে। দণ্ডী ছাড়া পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকেরা সেগুলিকে কাব্যলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া নাট্যপ্রকরণের মধ্যেই পরিগণনা করিয়াছেন। কাব্যালঙ্কারের মধ্যে ভরত কেবল মাত্র উপমা, রূপক, দীপক এবং যমক এই চারিটি গ্রহণ করিয়াছেন। উপমানের গুণ হিসাবে উপমার পাঁচ রকম বিভাগ করিয়াছেন, যথা প্রশংসোপমা, নিন্দোপমা, কল্পিতোপমা, সদৃশী উপমা আর কিঞ্চিৎসদৃশী উপমা। আমরা জানি যে পাণিনির ব্যাকরণে, কাত্যায়নের বৃত্তিতে ও মহাভাষ্যে উপমার

আলোচনা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের আলঙ্কারিকেরা অনেক সময় সেই বিভাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট এবং বামনের লেখায় তাহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ভামহ প্রশংসোপমা ও নিন্দোপোমা—এই বিভাগ স্বীকার করেন নাই ,কিন্তু দণ্ডী ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। ভামহ সমস্ত-বস্তু-বিষয় ও একদেশ-বিবর্ত্তি এই দুই প্রকার রূপক স্বীকার করিয়ছেন। মম্মট প্রভৃতি পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকেরা ইহার অনেক ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। ভামহ বা ভরত ইঁহাদের কেহই দীপকের কোনো ভেদ কল্পনা করেন নাই। কিন্তু মম্মট প্রভৃতি তাহারও অনেক ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। যমক, শব্দালঙ্কার এবং অনুপ্রাসের উপর নির্ভর করে। ভরত যমকের দশ রকম বিভাগ করিয়াছেন, অথচ অন্যপ্রকার অর্থালঙ্কারের উল্লেখ করেন নাই। যমক অর্থে ভরত বুঝিতেন একই জাতীয় শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ, অথবা শব্দাভ্যাস। নাটকীয় কথার মধ্যে সাধারণ উপমা বা রূপক ছাড়া অন্য জাতীয় অলঙ্কারের স্থান কম। সেই জন্যই বোধ হয় ভরতের বা পূর্ব্বতন নাট্য শাস্ত্রবিদ্‌গণের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে নাই। কিন্তু নাট্যের কথোপকথন-চ্ছলে একই জাতীয় শব্দের পুনরাবৃত্তি হইলে শুনিতে মধুর হয়। এই জন্যই বোধ হয় যমকের প্রতি ভরতের এত দৃষ্টি পড়িয়াছিল। আমাদের দেশের যাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা বা পাঁচালিওয়ালাদের লেখায় যমকের পরিচয় পাওয়া যায়। ভামহের মধ্যে যে আমরা বহু অলঙ্কারের উল্লেখ পাই অথচ ভরতের মধ্যে পাই না —তাহা দ্বারা ইহা অনুমান করা যায় না যে ভরতের সময় ঐ জাতীয় অনেক অলঙ্কারের প্রচলন ছিল না। ভরত হয়ত নাট্যশাস্ত্রের অনুপযোগী বলিয়াই উহাদের উল্লেখ করেন নাই। ভরত বাক্যের দোষগুণের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকদের দোষগুণের লক্ষণের সহিত ভরতের লক্ষণের সর্ব্বথা মিল

নাই। দোষের মধ্যে ভরত উল্লেখ করিয়াছেন—গূঢ়ার্থ অর্থাৎ একই কথা বিভিন্ন শব্দের দ্বারা বলা, অর্থান্তর অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক জিনিষের উল্লেখ, অর্থহীন অর্থাৎ অসম্বদ্ধ বাক্য কিংবা বহু-অর্থ-যুক্ত বাক্য, ভিন্নার্থ অর্থাৎ অসভ্য বা গ্রাম্য কিংবা যেখানে বক্তব্য বিষয়ের সহিত অন্য বিষয়ের গোলমাল হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, একার্থ অর্থাৎ একই কথা দুই ভাষায় বলা, অভিপ্লুতার্থ অর্থাৎ বিভিন্ন বাক্যে যেখানে একটী সুসংশ্লিষ্ট অর্থ হয় না, ন্যায়াদপেত অর্থাৎ প্রমাণবর্জ্জিত বা বিরুদ্ধ বাক্য, বিষম অর্থাৎ ছন্দঃপতন,বিসন্ধি অর্থাৎ যেখানে শব্দগুলি সুসংশ্লিষ্ট ভাবে প্রয়োগ হয় নাই, শব্দহীন অর্থাৎ ব্যাকরণ-দুষ্ট শব্দ প্রয়োগ। ভামহও দশটি দোষের নাম করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি একটু অন্য রকমের—যথা অপার্থ বা পূর্ণ একটী অর্থ না হওয়া, ব্যর্থ অর্থাৎ অসম্বদ্ধ বাক্য, একার্থ অর্থাৎ পুনরুক্ত, সংশয় অর্থাৎ যেখানে ঠিক অর্থ কি তাহা বুঝা যায় না, অপক্রম অর্থাৎ যেখানে একটী বাক্যের মধ্যে শব্দের যে ক্রম থাকা উচিত তাহা নাই, (আমাদের অতি আধুনিক নূতন বাংলার রীতিতে অপক্রমটী গুণ হইয়া দাঁড়াইতেছে), যতিভ্রষ্ট অর্থাৎ ছন্দের যতিপতন, ভিন্নবৃত্ত অর্থাৎ ছন্দঃপাত, বিসন্ধি অর্থাৎ যেখানে সন্ধি করা প্রয়োজন সেখানে সন্ধি না করা, দেশকালকলালোকন্যায়াগমবিরোধী অর্থাৎ দেশ, কাল, কলাশাস্ত্রের বিরোধী, লোকব্যবহারবিরোধী ও যুক্তি এবং আগম-বিরোধী বর্ণনা। এই দোষগুলি মোটামুটি ভরতের উল্লিখিত দোষের সহিত মেলে; যদিও সর্ব্বাংশে মেলে বলিয়া বলা যায় না। দশম দোষটির উল্লেখ নাট্যেও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অথচ ভরত তাহার উল্লেখ করেন নাই। ইহা ছাড়া ভামহ আরো দশটী দোষের উল্লেখ করিয়াছেন যথা, নেয়ার্থ অর্থাৎ যেখানে অর্থ সহজে বুঝা যায় না, টানিয়া আনিতে হয়, ক্লিষ্ট যেখানে অর্থ অস্পষ্ট, অন্যার্থ অর্থাৎ যেখানে অর্থ হয় না, অবাচক

অর্থাৎ যেখানে যে অর্থের উপর জোর দেওয়া আবশ্যক সেখানে সে জোর যদি না দেওয়া হয়, গূঢ়শব্দাভিধান অর্থাৎ যেখানে কঠিন শব্দের দ্বারা অর্থ চাপা পড়ে, অযুক্তিমৎ অর্থাৎ অসম্ভব বর্ণনা, শ্রুতিদুষ্ট অর্থাৎ অশ্লীল-শব্দ-প্রয়োগ, অর্থদুষ্ট অর্থাৎ যেখানে অর্থ বা তাৎপর্য্য অশ্লীল, কল্পনা-দুষ্ট অর্থাৎ যেখানে সেই বাক্যে কোনো অশ্লীল কল্পনা মনে আসিতে পারে, শ্রুতিকষ্ট অর্থাৎ কর্কশ-শব্দ প্রয়োগ। এই দোষ গুলির সহিত মম্মটোক্ত দোষগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় যে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিপুণ পর্য্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে, আরো অনেক জাতীয় দোষ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মম্মট ষোড়শ প্রকার পদদোষ উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, শ্রুতিকটু অর্থাৎ কর্কশ শব্দের প্রয়োগ, চ্যুত-সংস্কৃতি অর্থাৎ ব্যাকরণ-দুষ্ট, অপ্রযুক্ত অর্থাৎ ব্যাকরণ দুষ্ট না হইলেও সেরূপ প্রয়োগ না থাকা, অসমর্থ অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থ হয় না তাহার সেই অর্থে প্রয়োগ, নিহতার্থ বা যে শব্দের অভিধানে দুইটি অর্থ আছে তাহার অপ্রচলিত অর্থে প্রয়োগ, অনুচিতার্থ অর্থাৎ যেখানে যে জাতীয় রসের বর্ণনা হইতেছে তাহার বিরোধী শব্দ ব্যবহার করা। নিরর্থক অর্থাৎ ছন্দ মিলাইবার জন্য অর্থহীন শব্দ প্রয়োগ করা। অবাচক অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থ নাই সেই অর্থে তাহা ব্যবহার করা। ইহা ছাড়া মম্মট তিন প্রকার অশ্লীল দোষ বর্ণনা করিয়াছেন। সন্দিগ্ধ অর্থাৎ যেখানে দুই রকম অর্থ সম্বন্ধেই সন্দেহ হইতে পারে। অপ্রতীত অর্থাৎ কোনো শাস্ত্রবিশেষে প্রসিদ্ধ পারিভাষিক শব্দের অপ্রাসঙ্গিক ভাবে কাব্যে ব্যবহার। গ্রাম্য অর্থাৎ ছোটলোকের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দের ব্যবহার। নেয়ার্থ অর্থাৎ যদি কোনো শব্দের এমন লাক্ষণিক অর্থ করা যায় যাহা অসুন্দর ও অপ্রচলিত (যথা, হে সুন্দরি, তোমার মুখ চন্দ্রকে একটী চপেটাঘাত করিতেছে)। ক্লিষ্ট বা অর্থ বুঝিতে যেখানে

ক্লেশ হয়। অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ অর্থাৎ যে পদের উপর জোর দেওয়া আবশ্যক তার উপর জোর না দেওয়া, সাধারণতঃ সমাস করাতে যেখানে কোনও অন্তর্ভুক্ত শব্দের জোর দুর্ব্বল হইয়া যায় অথচ যদি সেই শব্দটির উপর জোর দেওয়া আবশ্যক হয়। বিরুদ্ধমতিকৃৎ অর্থাৎ শব্দবিন্যাসের ফলে যেখানে উল্টা অর্থ মনে হয়। মম্মট বলেন যে উপরিউক্ত চ্যুত-সংস্কৃত, অসমর্থ এবং নিরর্থক ছাড়া অন্য দোষগুলি বাক্যে এবং পদাংশেও হইতে পারে। ইহাছাড়া মম্মট কতকগুলি বাক্যগত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা প্রতিকূল-বর্ণতা অর্থাৎ যে রসে যেরূপ বর্ণ প্রয়োগ করিতে হয় তাহা না করা, যেমন ক্রোধের বর্ণনা করিতে গিয়া কোমল অক্ষরের ব্যবহার করা। উপহতলুপ্তবিসর্গ ও বিসন্ধি অর্থাৎ অনেক বিসর্গের ওকার সন্ধি করা কিংবা সন্ধি না করা। হতবৃত্ত অর্থাৎ ছন্দঃপতন। ন্যূনাধিকপদ, কোনও পদ কম ব্যবহার করা বা বেশী ব্যবহার করা। কোনো একটা ভাব প্রথম উঁচুতে উঠাইয়া যদি তাহা নামাইয়া দেওয়া হয়। সমাপ্তপুনরাত্তত্তা বা কোনও একটী বাক্য শেষ করিয়া পুনরায় তাহাতে ফিরিয়া যাওয়া। অর্দ্ধান্তরৈকবাচক অর্থাৎ যেখানে কোনো শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অর্থ বুঝিবার জন্য দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থের প্রয়োজন হয়। অভবন্মতযোগ অর্থাৎ যেখানে ভিন্নবিভক্তি প্রয়োগের জন্য কিংবা আকাঙ্ক্ষাদির অভাবের জন্য বিভিন্ন বাক্যকে একবাক্যে গ্রহণ করা সহজ হয় না, যথা 'যে' বলিয়া যদি 'সে' না বলা হয় কিংবা একবার 'যাহাদের' বলিয়া তারপর 'তাহাদের' না বলিয়া 'তাহারা' বলা হয়। অনভিহিত বাক্য অর্থাৎ যেখানে যে কথাটি প্রধান ভাবে বলা আবশ্যক সেখানে যদি সেটি বলা না হয়, পরন্তু কোনো বিরুদ্ধ শব্দ প্রয়োগের দ্বারায় প্রধান বক্তব্যটীকে অপ্রধান করিয়া ফেলা হয়। পূর্ব্বোক্ত অবিমৃষ্টবিধেয়াংশের সহিত ইহার সামান্য ভেদ আছে।

অপদস্থ পদ ও অপদস্থ সমাস অর্থাৎ যেখানে পদগুলি উল্টা পাল্টা করিয়া প্রয়োগ করায় বা অস্থানে সমাস করায় বক্তব্য অর্থটি যথাযথ প্রকাশ হয় না। 'কেহই ত্যাগ করে নাই' বলিতে গিয়া যদি বলা যায় 'ত্যাগ করে নাই কেহ'। সঙ্কীর্ণ, যেখানে দুইটি বিভিন্ন বাক্য এমন ভাবে রচনা করা হয় যে অন্বয় করিবার সময় পরের বাক্য হইতে পদ আনিয়া পূর্ব্ববাক্য বুঝিতে হয় কিংবা পূর্ব্ববাক্য হইতে পদ লইয়া পরের বাক্য বুঝিতে হয়। গর্ভিত অর্থাৎ যেখানে একটা বাক্যের মধ্যে আর একটা বাক্য প্রবেশ না করাইয়া অর্থ করা যায় না—যেমন যদি বলা যায় 'দুর্জ্জনের সহিত সঙ্গ তোমায় আমি বলি করা উচিত নয়'। এইখানে 'তোমায় আমি বলি' এই অংশটা আলাদা হইলেও বাক্যের মধ্যে না বসাইয়া অর্থ করা যায় না। প্রসিদ্ধহত অর্থাৎ যে শব্দ যেখানে ব্যবহার হয় সেখানে তাহা না ব্যবহার করিয়া অন্যত্র ব্যবহার করা—যেমন ব্যাং গর্জ্জন করিতেছে, ভগ্নপ্রক্রম অর্থাৎ যে ভাবে বাক্যটা আরম্ভ করা যায় সে ভাবে তার শেষ না করা। যদি বলা যায় 'রজনীনাথ অস্ত গেলে রাত্রি ও পালায়' তাহা হইলে দোষ হয়। বলিতে হইবে 'রজনীনাথ চলিয়া গেলে রাত্রিও চলিয়া যায়'। অক্রম অর্থাৎ যে প্রণালীতে পর পর বর্ণনা করা হইতেছে তাহার একটীকে যদি সেই রকমে বর্ণনা করা না হয়। অমতপরার্থতা অর্থাৎ বীভৎস রস বর্ণনা করিতে গিয়া যদি শৃঙ্গার রসের ভাষা ব্যবহার করা হয়।

ইহা ছাড়া মম্মট অনেকগুলি অর্থ-দোষের বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—অপুষ্ট অর্থাৎ এমন বিষয় বর্ণনা করা যাহা না করিলেও বক্তব্যার্থের কোনো ক্ষতি নাই। কষ্ট অর্থাৎ যেখানে শব্দবিন্যাসের দোষে অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয়। ব্যাহত অর্থাৎ কোনো একটি বিষয়কে নিন্দা বা প্রশংসা করিয়া পুনরায় তদ্‌বিপরীতভাবে অর্থাৎ যেখানে যেটা বলা হইবে

সেখানে সেটা না বলিয়া পরে বলা হয় তাহাকে ভূক্রম বলে। 'আমাকে হাতী দিন না হয় ঘোড়া দিন' একথা বলা চলে, কিন্তু 'ঘোড়া দিন না হয় হাতী দিন' একথা বলা চলে না। গ্রাম্য পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সন্দিগ্ধ ও নির্হেতু, যেখানে বাক্যের অর্থ বুঝিলেও তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে কিংবা বাক্যে বর্ণিত অর্থের যথেষ্ট কারণ দেওয়া হয় না। প্রসিদ্ধি বা বিদ্যাবিরুদ্ধ অর্থাৎ যেখানে প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ বা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। অনবীকৃত অর্থাৎ যেখানে নূতনত্ব নাই। এই প্রকারে মম্মট এই জাতীয় আরো অনেকগুলি অর্থদোষের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার পর তিনি রসদোষের আলোচনা করিয়াছেন। তাহার আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে করা যাইবে। মম্মট প্রভৃতি মনে করিতেন যে শব্দ ও অর্থ কাব্যের শরীর-স্বরূপ এবং রস তাহার প্রাণ। রসের যাহা পরিপন্থী অর্থাৎ যাহাতে রস-প্রতীতির বিলম্ব ঘটে বা বাধা হয় কিংবা পূর্ণরূপে রস গ্রহণ হয় না, তাহাকেই তাঁহারা দোষ বলিয়া মনে করিয়াছেন। সেইজন্য দোষবিভাগ করিতে গিয়া পদগত, বাক্যগত, বাক্যার্থগত ও রসগত এই চারি প্রকারে দোষের বিভাগ করিয়াছেন। ভামহ হইতে বামন পর্য্যন্ত কেহই প্রধান ভাবে রসকে আমল দেন নাই, সেই জন্য রসের অপকর্ষক হইলে দোষ হইবে একথা তাঁহারা বলেন নাই। বামন বলিয়াছিলেন যে গুণের বিপরীত যাহা, তাহাই দোষ। বামন কিন্তু দোষকে গুণাপেক্ষী করিয়া গুণের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিয়াছেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে ভামহ দোষের যথার্থ তাৎপর্য্য ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি রসের সহিত দোষের সম্পর্ক আলোচনা করেন নাই, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনো ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া বলা যায় না, পরন্তু মম্মট যে লক্ষণ করিয়াছেন যে রসের যাহা অপকর্ষক, তাহাই দোষ—এই লক্ষণই ঠিক কিনা তাহা চিন্তার বিষয়, কারণ মম্মট নিজে

কাব্যের লক্ষণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি অর্থাৎ গুণযুক্ত ও দোষহীন শব্দার্থ কদাচিৎ অলঙ্কারবিহীন হইলেও কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই লক্ষণের মধ্যে কাব্য হইতে গেলে যে রস থাকিতেই হইবে একথা মম্মট বলেন নাই, কেবলমাত্র গুণযুক্ত,দোষবিহীন শব্দ এবং অর্থকে কাব্য বলা যাইতে পারে—ইহাই লক্ষণের তাৎপর্য্য। অলঙ্কার বা রস থাকা বা না থাকার উপর শব্দার্থের কাব্যত্ব নির্ভর করে না। পরবর্ত্তী অনেকেও কাব্যত্বের জন্য রসের একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। জগন্নাথ রসগঙ্গাধরে লিখিয়াছেন যে, স্বভাবোক্তি স্থলে কোনো রস হয় না, কিন্তু তাহার কাব্যত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই কথা মানিতে গেলে মম্মটের নিজেরই স্ববচন-বিরোধ আসিয়া পড়ে। কারণ, শুধু বাক্যার্থের মধ্যেই দোষ থাকিতে পারে; তাহা হইলে রসগত দোষ ছাড়া অন্য সমস্ত দোষকেই যথার্থতঃ পদগত, বাক্যগত বা অর্থগত বলিয়া মানিতে হয়। ভামহ হইতে বামন পর্য্যন্ত দোষকে বাক্যার্থগত বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। বাক্যার্থগত যে সমস্ত দোষের কথা আমরা বর্ণনা করিয়াছি, অনেক সূক্ষ্ম বিভাগ বশতঃ সেগুলি অতি বিস্তৃত বলিয়া মনে হইলেও, সেগুলি শেষ পর্য্যন্ত অর্থপ্রতীতির বিলম্ব, বৈষম্য, শব্দের কর্কশতা, গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতা-জনিত একটা বিশ্রী কথা বা অসম্ভব ও অপ্রসিদ্ধ কিংবা ন্যায়বিরোধী বা শাস্ত্রবিরোধী বর্ণনাপ্রযুক্ত মনের একটা ক্ষোভে বা অর্থপ্রতীতির অসঙ্গতিতে পর্য্যবসিত হয়। যে বাক্যার্থে সুন্দর কাব্য হইবে তাহা এমন হওয়া চাই যে তাহাতে কোনো প্রকার ভাষাদোষ বা শব্দবিন্যাসের দোষ, যথাযথ প্রাধান্যনিরূপণের, ক্রমভঙ্গের দোষ, ছন্দঃপতনের দোষ বা নানাবিধ অনুচিত বর্ণনার দোষ না থাকে। ভামহ যে দুই শ্রেণীর দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে

দোষের যথার্থ তাৎপর্য্যগুলি সমস্তই ধরা পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া ভামহ আরও একটী সুন্দর কথা বলিয়াছেন এই যে, বাক্য এমন হওয়া উচিত যে তাহার যেন কোনও ব্যাখ্যার আবশ্যক না হয়।

"কাব্যান্যপি যদীমানি ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ।
উৎসবঃ সুধিয়ামেব হন্ত দুর্মেধসো হতাঃ॥"

স্থানে স্থানে কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও দণ্ডীও মোটামুটী ভাবে ভামহের দোষের লক্ষণগুলি স্বীকার করিয়াছেন। দোষের সহিত গুণের সম্বন্ধ কি এ বিষয়ে দণ্ডী কিছু বলেন নাই। কিন্তু তথাপি কতকগুলি দোষকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে দোষ বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন এবং বৈদর্ভী রীতিতে যাহা পাওয়া যায় না সে গুলিকে তিনি দোষ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই স্থলে মনে হয় যেন তিনি গুণের বিপরীতকে দোষ বলিয়া মনে করিয়াছেন। বামন দোষের বিভাগ করিতে গিয়া পদদোষ, পদার্থদোষ, বাক্যদোষ ও বাক্যার্থদোষ—এই চতুর্ব্বিধ দোষ অস্বীকার করিয়াছেন। রুদ্রট বলেন যে শব্দ ও অর্থ লইয়া কাব্য, সেইজন্য দোষ দুই প্রকার—শব্দদোষ ও অর্থদোষ। শব্দদোষের মধ্যে তিনি পদদোষ ও বাক্যদোষ—এই দুই প্রকার দোষ বলিয়াছেন। তিনি ছয় প্রকার পদদোষের উল্লেখ করিয়াছেন যথা, অসমর্থ, অপ্রতীত বিসন্ধি, বিপরীত কল্পনা, গ্রাম্য এবং দেশ্য। বাক্য দোষ তিন প্রকার—সঙ্কীর্ণ, গর্ভিত এবং গতার্থ। বাক্যার্থদোষ নয় প্রকার—অপহেতু, অপ্রতীত, নিরাগম, বাধয়ৎ, অসম্বদ্ধ, গ্রাম্য, বিরস, তদ্বৎ, অতিমাত্র। ইহা ছাড়া তিনি চারি প্রকার উপমাদোষও স্বীকার করিয়াছেন। ভামহ হইতে আরম্ভ করিয়া মম্মট পর্য্যন্ত সকলেই প্রায় কোনো কোনো দোষকে নিত্য এবং কোনো কোনো দোষকে অনিত্য বলিয়াছেন। কোনো কোনো দোষ এরূপ যে কোনোখানে তাহা দোষের হইলেও

অন্যস্থলে তাহা গুণের হইতে পারে। কর্কশ শব্দের প্রয়োগ যদিও শৃঙ্গার রসে দোষের, তথাপি রৌদ্ররসে তাহা গুণের। ভামহ বলিয়াছেন, যে সন্নিবেশ-বৈচিত্র্য-প্রযুক্ত ও প্রয়োগের ক্ষেত্র-বৈচিত্র্য-প্রযুক্ত, অসাধুও সাধু হয়, সাধুও অসাধু হয়—অর্থাৎ দোষও গুণ বা গুণও দোষ হয়ঃ—

"সন্নিবেশবিশেষাত্তু দুরুক্তমপি শোভতে।
নীলং পলাশমাবদ্ধং অন্তরালে স্রজামিব॥ ভামহ ১।৫৪
কিঞ্চিদাশ্রয়সৌন্দর্য্যাদ্ ধত্তে শোভামসাধ্বপি।
কান্তাবিলোচনন্যস্তং মলীমসমিবাঞ্জনম্॥ ১।৫৫
যথাতদ্বদসাধীয়ঃ সাধীয়শ্চ প্রয়োজয়েৎ॥ ১।৫৮
এতদ্ গ্রাহ্যং সুরভিকুসুমং গ্রাম্যমেতন্ নিধেয়ং।
ধত্তে শোভাম্ বিরচিতমিদং স্থানমস্যৈতদস্য॥
মালাকারো রচয়তি যথা সাধু বিজ্ঞায় মালাং।
যোজ্যং কাব্যেষ্ববহিতধিয়া তদ্বদেবাভিধানম্॥ ১।৫৯

ভোজও দোষকে পদগত, বাক্যগত এবং অর্থগত কল্পনা করিয়া অনেক প্রকার দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। পদদোষ ষোলটি যথা অসাধু, অপ্রযুক্ত, কষ্ট, অনর্থক, অপার্থক, অপুষ্টার্থ, অসমর্থ, অপ্রতীত, ক্লিষ্ট, গূঢ়, নেয়ার্থ, সন্দিগ্ধ, বিরুদ্ধ, অপ্রয়োজক দেশ ও গ্রাম্য। বাক্যদোষ ষোলটী যথা—শব্দহীন, ক্রমভ্রষ্ট, বিসন্ধি, পুনরুক্তি, ব্যাকীর্ণ, বাক্যসঙ্কীর্ণ, অপদ, বাক্যগর্ভিত, ভিন্নলিঙ্গ, ভিন্নবচন, ন্যূনোপমা, অধিকোপমা, ভগ্নযতি, অশরীর, অরীতিমৎ। এই পরিগণনার মধ্যে কিছু নবীনতা নাই।

ভামহ গৌড়ী, বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতি পরিগণনার পক্ষপাতী নহেন। সেইজন্য তিনি গুণপরিগণনার দিকেও অনেকটা উদাসীন। ভরতোক্ত

দশটি গুণ প্রত্যাখ্যান করিয়া মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ—এই তিনটী গুণকেই তিনি বিশেষ সমাদর করিয়াছেন। উদ্ভট ভামহের টীকা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে "সমবায়বৃত্ত্যা শৌর্য্যাদয়ঃ সংযোগবৃত্ত্যা তু হারাদয় ইত্যস্ত গুণালঙ্কারাণাং ভেদঃ, ওজঃপ্রভৃতীনামনুপ্রাসোপমাদীনাং চোভয়েষামপি সমবায়বৃত্ত্যা স্থিতিরিতি গড্ডলিকা-প্রবাহেণৈবৈষাং ভেদঃ"। অর্থাৎ কেহ কেহ মনে করেন বীরত্ব প্রভৃতি মানুষের স্বাভাবিক গুণ, কিন্তু অলঙ্কারাদি বহিরঙ্গ বস্তু, তাহাদের সহিত শরীরের সংযোগ হইলে তবে তাহা শরীরের শোভা বৃদ্ধি করে, ওজঃ, মাধুর্য্য প্রভৃতিও তেমনি শব্দার্থের স্বাভাবিকগুণ, কিন্তু উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার স্বাভাবিক গুণ নহে, সেগুলি আহৃত গুণ মাত্র—একথা ঠিক নহে। গড্ডলিকা প্রবাহে পড়িয়া গতানুগতিকভাবে অনেকে গুণ ও অলঙ্কারের মধ্যে এতাদৃশ প্রভেদ মানিয়া লইয়াছেন।

বামন বলিয়াছেন যে, যাহাতে বাক্যশোভা উৎপাদন করে তাহাকে গুণ কহে। অলঙ্কারের দ্বারা এই কাব্যশোভা আরও বাড়িয়া যায়—"কাব্যশোভায়াঃ কর্ত্তারো ধর্ম্মা গুণাস্তদতিশয়হেতবস্ত্বলংকারাঃ"। ইহার উত্তরে মম্মট বলেন যে বামনের এই লক্ষণ অসঙ্গত; কারণ যদি সকল গুণ থাকিলে তবে তাহাকে কাব্য বলিতে হয়, তবে গৌড়ী পাঞ্চালী প্রভৃতি রীতি যাহাতে সমস্ত গুণ নাই, তাহাকে কাব্য বলা চলে না। যদি কয়েকটি গুণ থাকিলেই চলে, তবে বৈদর্ভী রীতিতে যদি 'এই পাহাড়ে ধূম এবং বহ্নি আছে, এই কথাটি বলা যায়, তবে তাহারও কাব্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। আবার পক্ষান্তরে এমন বাক্যবিন্যাস চলিতে পারে, যাহাতে বামনোক্ত গুণগুলির একটীও নাই, অথচ তাহাতে সে বাক্যের কাব্যত্বের হানি হয় নাই এবং অলঙ্কারেরও কোনও ত্রুটি হয় নাই।

বামন দশটী শব্দ ও অর্থ-গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দগুণ হিসাবে ওজঃ শব্দের অর্থ পদরচনার গাঢ়ত্ব; অর্থগুণ হিসাবে ইহার অর্থ অর্থগাম্ভীর্য্য। প্রসাদ বলিতে একদিকে শব্দের শিথিল রচনা বুঝায়, অপরদিকে অর্থের সারল্য বুঝায়। শ্লেষ বলিতে একদিকে বুঝায় শব্দের মসৃণতা অর্থাৎ যাহাদ্বারা বহুশব্দ একটী শব্দের ন্যায় প্রতীত হয়, অপরদিকে একটী শব্দের মধ্যে বিভিন্ন অর্থের সংঘটন। সমতা অর্থে একদিকে বুঝায় শব্দবিন্যাসের ভঙ্গীর একরূপতা, অপরদিকে বুঝায় ভাবের সামঞ্জস্য। সমাধি অর্থে একদিকে বুঝায় শব্দচ্ছটার উত্থান পতন বা আরোহাবরোহ, অপরদিকে বুঝায় মূল অর্থের সহজলভ্য বোধ। মাধুর্য্য অর্থে একদিকে পৃথক্ পৃথক্ পদবিন্যাস, অপরদিকে বুঝায় উক্তির বৈচিত্র্য। সৌকুমার্য্য শব্দে একদিকে বুঝায় শব্দের কোমলতা অপরদিকে বুঝায় ভাবের প্রিয়তা। উদারতা শব্দে একদিকে বুঝায় শব্দনৃত্য, অপরদিকে বুঝায় গ্রাম্যতা রসের অভাব। অর্থব্যক্তি একদিকে বুঝায় সহজে অর্থপ্রতীতি, অপরদিকে বুঝায় বর্ণনীয় বিষয়ের স্ফুটতা। কান্তি শব্দে একদিকে বুঝায় শব্দের ঔজ্জ্বল্য, অপরদিকে রসদীপ্ততা।

ভরত যে রীতিতে গুণ পরিগণনা করিয়া গিয়াছেন, দণ্ডী ও বামনও সেই রীতিতেই গুণের পরিগণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিনজনে বিভিন্ন গুণগুলির যে নাম দিয়াছেন, তাহাতে অনেক গরমিল আছে। দণ্ডী যাহাকে শ্লেষ বলিয়াছেন তাহা বামনের "ওজঃ" গুণের অনুরূপ এবং বামনের পৃথক্‌পদত্ব ও অগ্রাম্যত্ব একত্র করিলে দণ্ডীর মাধুর্য্যের অনুরূপ হয়। বামনের অর্থব্যক্তি দণ্ডীর স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের অনুরূপ। বামনের সমাধির সহিত দণ্ডীর সমাধির কোনও মিল নাই। আবার ওজঃর লক্ষণে ভরত সমাসবহুল পদডম্বর খুঁজিয়াছেন; ইহার

সহিত দণ্ডীর ও ভোজের মিল আছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের নাই। হেমচন্দ্র নীচ বস্তুতে উচ্চতা ও মহত্ত্ব আরোপ করাকে ওজঃ বলিয়াছেন। আবার ভরত যাহাকে প্রসাদ বলিয়াছেন, দণ্ডী তাহাকে সমাধি বলিয়াছেন ও বামনের মতে তাহা বক্রোক্তি অলঙ্কার। আবার ভোজ বলিয়াছেন যে প্রসাদ অর্থ প্রসিদ্ধ বর্ণনা। ভরতের রসভাবসমন্বিত উদারতার সহিত বামনের উদারতার অনেক পার্থক্য। আবার ভোজ বিকট বিকট অর্থের সন্নিবেশকে উদারতা বলিয়াছেন।

ভোজ ২৪টি শব্দগুণ ও ২৪টি অর্থগুণের বর্ণনা করিয়াছেন এবং গুণের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিয়াছেন। শব্দগুণ যথা শ্লেষ,—বহু পদকে একত্র ঠাসাঠাসি করিয়া একপদের ন্যায় দেখাইয়া শক্ত গাঁথুনির পরিচয় বামনের শ্লেষের অনুরূপ। প্রসিদ্ধ ব্যবহারের বর্ণনা প্রসাদ—ইহার সহিত বামনের মিল নাই এবং ইহাকে শব্দগুণ না বলিয়া অর্থগুণই বলা উচিত। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কোমল বর্ণের মিশ্রণে যে রচনা তাহাকে সমত্ব বলে। ইহার সহিত ও বামনের সমতার মিল নাই। বামনের ন্যায় ভোজও পৃথক্ পৃথক্ পদপ্রয়োগকে মাধুর্য্য বলিয়াছেন। ভোজ ও বামন উভয়েই বলেন যে কড়া অক্ষর ব্যবহার না করাকে সৌকুমার্য্য বলে। ভোজ বলেন যে একটা বাক্য যদি পরিপূর্ণ ভাবে বলা যায় তবে তাহাকে অর্থব্যক্তি বলে। বামনের মতে তাড়াতাড়ি অর্থবোধ যাহা হইতে হয় সেই বাক্যকে অর্থব্যক্তি গুণযুক্ত বলা হয়। শব্দ গাঁথুনির লাবণ্যকে ভোজ কান্তি বলিয়াছেন। ইহা বামনের অনুরূপ হইলেও এক নহে। বিকট অক্ষরের গাঁথুনিকে ভোজ উদারতা বলেন; নাচুনে শব্দ রচনাকে বামন উদারতা বলেন। সমাসভূয়স্ত্বকে ভোজ ও বামন ওজঃ বলেন। রচনার গাঢ়তাকে ভোজ ঔর্জ্জিত্য বলেন, অথচ ইহার সহিত ওজঃর বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

একের ধর্ম্ম অন্যে বিন্যাস করাকে ভোজ সমাধি বলিয়াছেন। ইহার সহিত বামনের আরোহাবরোহ-রূপ সমাধির কোনও মিল নাই। ইহা ছাড়া ভোজ আরও কতগুলি শব্দগুণের উল্লেখ করিয়াছেন। সুন্দর সুন্দর বিশেষণ দেওয়াকে উদাত্ত, চাটুবাক্যকে প্রেয়ঃ, সুবন্ত ও তিঙন্তপদের সাধুপ্রয়োগকে সুশব্দতা, শব্দ হইতে ঝঙ্কার উঠিলে গাম্ভীর্য্য, বিস্তৃত করিয়া বলাকে বিস্তর, অল্পকথায় বলাকে সংক্ষেপ, অর্থের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলাকে সম্মিত, ভাবের উচ্ছ্বাস-বশতঃ অনুচিত বাক্য প্রয়োগকে ভাবিক, পূর্ব্বার্দ্ধে স্বর উঠিয়া পরার্দ্ধে স্বর নামিয়া আসিলে তাহাকে বলে ক্রম। ইহার সহিত বামনের সমাধির সাদৃশ্য আছে। যে পদ্ধতিতে রচনা আরম্ভ হইয়াছে ঠিক সেই পদ্ধতিতে যদি শেষ হয়, তবে ভোজ তাহাকে বলেন ক্রম। বাক্যভঙ্গী দ্বারা কোনও অর্থ প্রকাশ করাকে ভোজ বলেন উক্তি, যেমন প্রশ্ন হইল 'তাঁহার কুশল ত ?' উত্তর হইল 'বেঁচে আছেন বটে'। ইহারই বিশেষ চারুত্ব হইলে তাহাকে ভোজ বলেন প্রৌঢ়ি। ভোজ এইরূপ ২৪টি অর্থগুণেরও উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আর এখানে উল্লেখ করিতে চাহি না।

বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন গুণলক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, একই অর্থে তাঁহারা একনাম ব্যবহার করেন নাই, ভোজ প্রভৃতি অনেক নূতন গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা ভরত হইতে বামন পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। তাহা ছাড়া ইহাও দেখা যায়—সকল গুণগুলি কোনও একটি রচনায় থাকিতে পারে না। কোনও একটি রচনায় যদি বামনের ওজঃ বা শ্লেষ গুণ থাকে,তবে সেখানে মাধুর্য্যগুণ থাকিতে পারে না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, একটী গুণ থাকিলে হয়ত অপরটির আবশ্যকই হয় না, কারণ সকল বিভিন্নগুণের পার্থক্য সুস্পষ্ট

নহে। ওজঃ থাকিলেই শ্লেষ থাকে ; তবে ওজঃ ও শ্লেষকে পৃথক্ পরি-গণনা করিয়া লাভ কি ? এই যে দশটি করিয়া শব্দগুণ ও দশটি করিয়া অর্থগুণ বা ২৪টি করিয়া শব্দগুণ ও ২৪টি করিয়া অর্থগুণ পরিকল্পনা করা হইয়াছে, ইহাও অনেকটা খামখেয়ালি রকমেরই বলা যাইতে পারে। এই পরিগণনার মধ্যে কোনো যুক্তিপূর্ণ শৃঙ্খলা নাই। যদি প্রসাদের বিপরীত হইলেই ওজঃ হয় তবে প্রসাদ এবং ওজঃ দুইটিকে স্বতন্ত্র গুণ মানিবার প্রয়োজন কি ? ওজঃকে যদি গুণ বলা যায়, তবে প্রসাদকে বলা যায় না, প্রসাদকে যদি গুণ বলা যায়, তবে ওজঃকে বলা যায় না। আবার বামন সমাধিকে অর্থ-গুণ বলিয়াছেন। যেখানে গভীর মনঃসংযোগের দ্বারা কোনো কাব্যের অর্থ বুঝিতে হইবে, সেইটাই সেই কাব্যের সমাধি-গুণ। গভীর মনোযোগের দ্বারাও যদি অর্থ বুঝা না যায়, তবে তাহা কাব্যই হইতে পারে না। গুণগণনার এই সমালোচনা প্রাচীনদের মনেও হইয়াছিল। এইজন্য দেখিতে পাই যে, প্রাচীনকালে ভামহ যেমন ভরতের দশটী গুণ স্বীকার করিয়া মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ এই তিনটি গুণ ধরিয়াছিলেন, মম্মটভট্টও সেইরূপ বামনের দশটি শব্দগুণ ও অর্থগুণ পরিত্যাগ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ভামহের মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই তিনটি গুণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—"মাধুর্য্যৌজঃপ্রসাদাখ্যাস্ত্রয়স্তে ন পুনর্দশ।" বামন বলিয়াছিলেন—বৈদর্ভী রীতিতে দশটী গুণই আছে এবং তাহারই যথার্থ কাব্যতা। মম্মট বলেন যে রসের যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম অর্থাৎ যেখানে রস আছে সেই খানেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে যে ধর্ম্ম থাকে এবং রসের উৎকর্ষ আপাদন করে তাহাই গুণ। গুণ বর্ণ বা শব্দ কাহারও ধর্ম্ম নহে, গুণ রসের ধর্ম্ম। কাজেই রসের ভেদ অনুসারে গুণের ভেদ। শৃঙ্গার, করুণ এবং শান্তের মাধুর্য্য-গুণ চিত্তকে দ্রবীভূত করে

এবং ঐ ঐ রসের সহায়ক হয়। তেমনি বীর, বীভৎস এবং রৌদ্র রসে ওজোগুণ চিত্তের বিস্তার সম্পাদন করিয়া ঐ ঐ রসের সহায়ক হয়। কিন্তু প্রসাদগুণ সকল রসেরই অনুকূল। মম্মট আরো বলেন যে, বামনের দশটি গুণ বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে তাহাদের কতক-গুলি এইরূপ যে তাহাদের কোন একটীর মধ্যেই অপর বস্তুগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আবার কতকগুলি এইরূপ যে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র গুণরূপে পরিগণনা করা যায় না, কোনো বিশেষ দোষ না থাকিলেই সেই গুণ আপনি আসিয়া পড়ে। আবার কতকগুলি এইরূপ যে কোনো কোনো রসে তাহারা গুণ না হইয়া দোষই হইবে। বামনোক্ত শ্লেষ, সমাধি, উদারতা ও প্রসাদ ওজোগুণ ছাড়া আর কিছুই নহে। শ্লেষ অর্থ অনেক পদের এক পদের ন্যায় প্রতীয়মানতা। সমাধি অর্থ গাঢ়তা ও অশিথিলতা। উদারতা অর্থ নাচান পদবিন্যাস। এ সমস্তকেই ওজোগুণের মধ্যে ধরা যায়। কারণ ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই পদ-রচনার গাঢ় সন্নিবেশ আছে। আবার প্রসাদগুণের মধ্যে অর্থব্যক্তি বা সহজে অর্থবোধ গৃহীত হইতে পারে। আবার সমতা অর্থাৎ কোমল শব্দ দিয়া আরম্ভ করিলে বরাবর কোমল শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে এ নিয়ম খাটে না। প্রথমে কোমল শব্দ ব্যবহার করিলেও যদি ভীষণতা বুঝাইতে হয় তাহা হইলে কোমল শব্দ ব্যবহার করা গুণের না হইয়া দোষের হয়। আবার কষ্টত্ব ও গ্রাম্যত্ব দোষ না থাকিলেই আপনি সৌকুমার্য্য হয়। সৌকুমার্য্য এবং কান্তি পৃথক্ জিনিষ নহে। আবার বামনোক্ত অর্থগুণ খণ্ডন করিতে গিয়া মম্মট বলিতেছেন যে অর্থগত ওজোগুণকে বামন প্রৌঢ়ি বলিয়াছেন। প্রৌঢ়ি শব্দের অর্থ যাহা একটী পদে বলা যায় তাহা একটী বাক্য দিয়া বুঝান, যাহা একটী বাক্য দিয়া বুঝান যায় তাহা একটী

পদ দিয়া বুঝান। অর্থকে অনেকে বাক্য দিয়া বুঝান, কিন্তু এ সমস্তই ওজোগুণের বৈচিত্র্য মাত্র। এমন কি ইহাকে গুণও বলা যায় না। কারণ ইহা না থাকিলেও কাব্য হয়। বামনের তাৎপর্য্য এই যে, যে গুণগুলির তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা না থাকিলে কাব্যত্ব হয় না। কেহ কেহ বামনকে সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে কোনো একটী বিশেষ গুণ না থাকিলেই যে কাব্যত্ব হয় না তাহা নয়। গুণের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে তাহাতে চিত্তের উপর একটী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং বচন-ভঙ্গীর বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। ইহার উত্তরে অনেকে বলেন যে বামন-লিখিত অনেক গুণ এমন আছে যাহাতে বৈচিত্র্য না হইয়া কেবল মাত্র অর্থ-প্রতীতির বিলম্ব ঘটায়— চন্দ্র না বলিয়া অত্রি-লোচন-সম্ভূত জ্যোতিঃ বলিলে তাহাতে পাঠকের বেশী চিন্তা করিতে হয় মাত্র। বামনের প্রসাদ, মাধুর্য্য, সৌকুমার্য্য, উদারতা স্বতন্ত্র অর্থগুণ নহে। অপুষ্টার্থত্ব, অধিকপদত্ব ও অনবীকৃতত্ব, অশ্লীল এবং গ্রাম্যতা-দোষ না থাকাই প্রসাদ, মাধুর্য্য, সৌকুমার্য্য ও উদারতা। বামনের অর্থব্যক্তির অর্থগুণ স্বভাবোক্তি অলঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নহে। তাঁহার কান্তিগুণও রসধ্বনি বা গুণীভূতব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নহে। অর্থব্যক্তি অর্থে বুঝায় বস্তু-স্বভাবের স্ফুট বর্ণনা। কাজেই স্বভাবোক্তি হইতে ইহাকে পৃথক্ করা যায় না। কান্তি অর্থে দীপ্তিকরত্ব, কাজেই ইহা রসধ্বনি বা রসবদলঙ্কার বা গুণী-ভূতব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাই গোবিন্দ ঠক্কুর প্রদীপ-টীকাতে লিখিয়াছেন—"অর্থব্যক্তিস্তু বস্তুস্বভাবস্য স্ফুটতা; সা চ স্বভাবোক্ত্যন্ত-র্ভূতা। কান্তিস্তু দীপ্তরসত্বং; সা চ রসধ্বনৌ রসবদলঙ্কারে গুণীভূতব্যঙ্গে বান্তর্ভূতা।" স্ফুটভাবে বস্তু প্রকাশ করার নাম অর্থব্যক্তি। তাহা স্বভাবোক্তির মধ্যেই পড়ে।

দুই সখী মনোরমা বসে আছে নিরুপমা
দেখি তাহা প্রেমিক সুজন,
একের নয়ন ধরি অপরে হৃদয়ে করি
অনায়াসে করে আলিঙ্গন।

এই কবিতাটিতে নানাবিধ চালাকি ও মৎলব ও ধূর্ত্ততা প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ কবিতা বামনের মতে শ্লেষরূপ অর্থগুণের পরিচায়ক। কিন্তু মম্মট বলেন যে ইহাতে কবির বিদগ্ধতারূপ বৈচিত্র্য মাত্র প্রকাশ পায়। ইহা কোনও গুণ নহে। সমতারূপ অর্থগুণ ক্রমভঙ্গের অভাব মাত্র।

উঠিয়া সবিতা তাম্র তাম্ররূপে হের অস্ত যায়।

—এইরূপ প্রক্রমরক্ষা প্রক্রমভঙ্গরূপ দোষের বিপরীত মাত্র। সমাধিরূপ অর্থগুণের অর্থ অর্থদৃষ্টি অর্থাৎ কবিজনপ্রসিদ্ধ উপমাদির প্রয়োগ করা। তাহা না হইলে নিজের মাথা হইতে অদ্ভুত একটা করিলে কখনও কাব্য হইতে পারে না। কেহ যদি লেখে—

নেপালী ঠোটের প্রায় বাতাবীটি দোলা খায়।

তাহা হইলে তাহা স্বভাবতঃই অর্থশূন্য হইবে। তাহা বারণ করিবার জন্য স্বতন্ত্র সমাধিগুণ পরিকল্পনার আবশ্যক নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যদিও ভরত, দণ্ডী, বামন ও ভোজ প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দগুণ ও অর্থগুণের পরিগণনা করিয়াছেন, তথাপি গুণ ও দোষকে পরস্পর-সাপেক্ষভাবে গ্রহণ করিলে এবং অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি নিবারণ করিয়া সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিলে, ভামহের তিনটি গুণের মধ্যেই সকলগুলি গুণের স্থান করা যায় এবং কতকগুলি গুণকে গুণ না ধরিয়া অলঙ্কার বলিয়া মনে করা যায়। বামন রীতিকেই কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন। গুণগুলি রীতির প্রধান উপাদান।

বামন প্রথমেই লিখিয়াছেন—"কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ" অর্থাৎ অলঙ্কারের দ্বারাই কাব্যের মর্য্যাদা-বৃদ্ধি হয়। অলঙ্কার অর্থে তিনি বুঝিয়াছেন সৌন্দর্য্য। কিন্তু তথাপি অলঙ্কার না হইলে কাব্য হয় না তিনি এমন কথা বলেন নাই। তাঁহার মতে অলঙ্কার দুই প্রকার—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। অর্থালঙ্কার গুলিকে তিনি প্রায় সমস্তই উপমার মধ্যে ফেলিয়াছেন। দণ্ডীর মতে অলঙ্কার এবং গুণ উভয়েই কাব্য-শোভার জনক, কিন্তু বামনের মতে কেবলমাত্র গুণই কাব্য-শোভার জনক এবং এই গুণ ও রীতি একপ্রকার অভিন্ন। অলঙ্কারে এই কাব্য-শোভার মাহাত্ম্য-বৃদ্ধি হয় (তদতিশয়হেতবঃ)। গুণগুলি কাব্যের নিত্য ধর্ম্ম, অলঙ্কার অনিত্য ধর্ম্ম। গুণ ছাড়া কাব্য-শোভাই হয় না। কাব্য-শোভা হইলে অলঙ্কারের দ্বারা কখনো কাব্যত্ব হয় না। মম্মট বলেন যে কোনো একটী গুণ থাকিলেই যে কাব্য হইবে একথা বলা চলে না। যদি বলা যায়—

অদ্রিতে জ্বলিছে বহ্নি ধূম সেথা রহে বর্ত্তমান—এখানে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ওজোগুণ থাকিলেও এখানে কাব্য হয় নাই।

"তোমার অধররস স্বর্গ-সুধা করে তিরস্কার
তাইত তোমার দেহে স্বর্গধন মাগি পুরস্কার।"

এই শ্লোকে কোনো গুণ নাই অথচ অলঙ্কারের দ্বারা ইহার কাব্যত্ব হইয়াছে—এইরূপ বলা যাইতে পারে। অতএব কেবলমাত্র গুণ থাকিলেই তাহার আতিশয্যবর্দ্ধন করিয়া অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, এবং গুণ-ব্যতিরেকে অলঙ্কার হয় না বা কাব্যত্ব হয় না একথা বলা যায় না। গুণগুলির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদের সমস্তগুলিই একত্র থাকিতে পারে না। তথাপি যদি বলা যায় যে সমস্ত গুণই একত্র থাকা আবশ্যক এবং তাহা না হইলে কাব্য হয় না, তাহা হইলে

গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতিতে সমস্ত গুণ না থাকা সত্ত্বেও সেই রীতিদ্বয়কে কি যুক্তিতে কাব্য বলা যায়? আবার কোনো কোনো গুণ থাকিলেই যে কাব্য হয় না তাহা 'অদ্রিতে জ্বলিছে বহ্নি' এই শ্লোকার্দ্ধে দেখান গিয়াছে। বামন যাহাকে গৌড়ী, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী রীতি বলিয়াছেন সেগুলিকে মম্মট মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক লঘু, প্রকাশক ও কোমল বর্ণ-বিন্যাসের ফল-স্বরূপ মনে করিয়াছেন। মধুর-বর্ণ-বিন্যাসে অর্থাৎ ট-বর্গ-বর্জ্জিত অন্য অন্য বর্গের বর্ণগুলি যদি সেই সেই বর্গের অন্ত্যবর্ণ-যুক্ত হয়, যথা আঙ্ক আঙ্কা ইত্যাদি এবং যদি অল্প সমাস থাকে কিংবা সমাস একেবারে না থাকে তাহা হইলে মাধুর্য্য হয়। মাধুর্য্য-গুণই বৈদর্ভী রীতির প্রকাশক। আবার বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের সহিত যদি দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের যোগ হয় কিংবা রেফের সহিত যোগ কিংবা ট, ঠ, ড, ঢ বর্ণের যদি প্রয়োগ হয় বা একজাতীয় দুইটি বর্ণ একত্র সংযুক্ত হয় এবং সমাসবহুল পদ প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে ওজোগুণ হয়। তাহাই গৌড়ী রীতির প্রকাশক। আর কোমল বর্ণের অর্থাৎ ল ব স হ প্রভৃতির প্রয়োগে পাঞ্চালী রীতি প্রকাশ পায়। ইহা একরূপ বৃত্ত্যনুপ্রাসের মধ্যেই পরিগৃহীত হইতে পারে। বৃত্ত্যনুপ্রাস শব্দালঙ্কার, কাজেই এই মত অবলম্বন করিলে বামনোক্ত রীতি অলঙ্কারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ভামহ রীতি-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী প্রভৃতি রীতি-বিভাগ মূর্খেরাই করিয়া থাকে।

"গৌড়ীয়মিদমেতত্তু বৈদর্ভ মিতি কিং পৃথক্
গতানুগতিকন্যায়ান্নানাখ্যেয়মমেধসাম্।"

তিনি আরো বলেন, ইচ্ছামত একটাকে একটা নাম দিলেই হয়। দোষ গুলি না থাকিলে শ্রুতিমধুর অলঙ্কার-যুক্ত, অর্থ-যুক্ত এবং ন্যায়-সঙ্গত বাক্য গৌড়ীয় হইলেও ভাল এবং ইহা না থাকিলে বৈদর্ভীকেও ভাল

বলা যায় না। কাজেই অমুক রীতি অবলম্বন করিয়া লেখা বলিয়া সেই কাব্য শ্রেষ্ঠ একথা বলা যায় না।

বামন কিন্তু রীতিকেই কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন। ভামহ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে তাঁহার পূর্ব্বেও গৌড়ী, বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতি-হিসাবে কাব্য-নির্ণয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ভামহ তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহাকে একান্তই গড্ডলিকা-প্রবাহ বা গতানুগতিক-ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিয়া কেবলমাত্র যথার্থ কাব্যসম্পদ্‌কেই কাব্যত্বের নিয়ামক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বামন বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র গুণই অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাক্য ও বাক্যার্থের কাব্যত্ব সম্পাদন করে এবং গুণের উপরেই অলঙ্কারের স্থিতি। কিন্তু মম্মট দেখাইয়াছেন যে গুণ না থাকিয়াও অলঙ্কার থাকিতে পারে এবং কেবলমাত্র অলঙ্কারের দ্বারাও কাব্যের কাব্যত্ব হইতে পারে। বামন কাব্যশোভা বা সৌন্দর্য্যকে যেন পৃথক্‌ভাবে দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বামনের তিনটি রীতির সহিত রুদ্রট লাটী বলিয়া আর একটা রীতির উল্লেখ করেন। অগ্নি পুরাণেও এই চারিটি রীতির উল্লেখ আছে। ভোজ ইহার সহিত মাগধী ও আবন্তিকা বলিয়া আরো দুইটি রীতির উল্লেখ করেন। রাজশেখর তাঁহার কাব্য-মীমাংসায় বামনের ন্যায় তিনটি রীতিরই উল্লেখ করেন। বৃদ্ধ বাগ্‌ভট পাঞ্চালী ও লাটীয়া এই দুই রীতি স্বীকার করেন। তরুণ বাগ্‌ভট বামনোক্ত তিনটী রীতিই স্বীকার করেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মধ্যে অনেক সময় বৃত্তি ও রীতি এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু রুয্যক তাঁহার অলঙ্কার-সর্ব্বস্বে লিখিয়াছেন যে রসানুকূল বর্ণ-রচনাকে বৃত্তি বলে— "বৃত্তিস্তু রসবিষয়ো ব্যাপারঃ, তদ্বতী পুনর্বর্ণরচনা ইহ বৃত্তিঃ।" বিভিন্ন রসে অনুপ্রাণিত হইয়া যখন সেই রসের অনুকূল বর্ণ-সম্পদ্‌

বাক্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে বৃত্তি বলে। এই বৃত্তির অন্তর্গত মানসিক রসানুকূল ব্যাপারই প্রয়োজক। রীতির মধ্যে কবি বাহির হইতে শব্দ-বিন্যাসের দ্বারা প্রশংসিত গুণগুলি আহরণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অভিনবগুপ্ত কিন্তু তাঁহার লোচন-টীকায় অন্যমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—বৃত্তি বা রীতি ইহাদের কোনোটিই অনুপ্রাস হইতে ভিন্ন নহে। "বৃত্তয়ঃ অনুপ্রাস-জাতয় এব।" তিনি আরো বলিয়াছেন—"বৃত্তিরীতয়ঃ ন গুণালঙ্কার-ব্যতিরিক্তাঃ"। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে রীতিতে শব্দ-সংঘটন ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। সেই রীতিকে কাব্যের আত্মস্বরূপ বলা যায় না।

রীতি বলিতে কি বুঝায় এ সম্বন্ধে আরো দুএকটী কথা বলা আবশ্যক। ইংরাজীতে style বলিতে যাহা বুঝা যায়, রীতি বলিতে তাহা বুঝায় না। ইংরাজীতে style বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে প্রত্যেক চিন্তাশীল লেখকের চিন্তার এক একটী স্বতন্ত্র ধারা আছে। লেখকের যে বক্তব্য বিষয় তাহা তাঁহার অন্তর হইতে একটী বিশিষ্টক্রমে সজ্জিত হয় এবং সেই ক্রমের অনুকূলতায় তিনি শব্দ-সঞ্চয় ও শব্দ-ব্যবহার করেন। তাঁহার সেই চিন্তাধারা তাঁহার সমগ্রপুরুষীয় স্বভাবের একটী ছাপ লইয়া আসে। তিনি যে ভাবে উপমা আহরণ করেন, যে ভাবে একটী শব্দের পর আর একটী শব্দ বসান, তাঁহার চিন্তার বিভিন্ন অংশগুলি যে ভাবে সাজান, বক্তব্য অর্থকে যে ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, সে সমস্তগুলি তাঁহার স্বচ্ছন্দবাহি-চিন্তাধারার অঙ্গভূত। চিন্তাধারার পার্থক্যই styleএর পার্থক্য। আমাদের দেশের অলঙ্কার-শাস্ত্রে—সাহিত্য যে একটী সমগ্রপুরুষীয় অভিব্যক্তি—এই দিক্ দিয়া বিষয়টিকে দেখা হয় নাই। ইংরাজীতে styleটী একটী অন্তর্ব্যাপার, বহিরঙ্গ শব্দ বা বাক্য

বিন্যাস সেই অন্তর্ধারার সূচক মাত্র। এইদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সংস্কৃত বৃত্তি শব্দটির (অন্ততঃ রুয্যক যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার) সহিত ইহার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। যাঁহারা রীতি-প্রণালীতে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা মনে করিতেন যে শব্দ ও অর্থের বিশেষ কতগুলি গুণের ফলেই কোনো বাক্য বা বাক্যসমষ্টি কাব্য হইতে পারে। এইজন্য তাঁহারা শব্দ ও অর্থের সমালোচনা করিয়া কি জাতীয় গুণের যোগে প্রসিদ্ধ কাব্যগুলির কাব্যত্ব হইয়াছে তাহা অনুশীলন করিয়া, তাহার বিশ্লেষণের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই এই গুণের একত্র সঙ্গতি থাকিলে কাব্যের কাব্যত্ব হয়। ফলে এই গুণগুলির শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচার বা স্বৈরাচার প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের চিত্তের প্রেরণার বৈশিষ্ট্যই ইহা যে তাহা আপন চিত্তের চমৎকারিতার অনুকূল শব্দ ও অর্থ সঞ্চয় করে ও উহাকে অনুকূল ভঙ্গীতে প্রকাশ করে—কাব্যোৎপত্তির এই নিগূঢ় তত্ত্ব-কথাটির দিকে তাঁহারা দৃষ্টি করেন নাই। বামনের পরবর্ত্তী সমালোচকদিগের নিকট এই কথাটি ধরা পড়িয়াছিল, সেই জন্যই তাঁহারা এই রীতির পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তীব্র সমালোচনার সহিত দেখাইয়াছিলেন যে গুণ থাকা না থাকার উপর কাব্যত্ব নির্ভর করে না। বামন অপেক্ষা ভামহ এবিষয়ে অনেক অধিক সজাগ ছিলেন। সেইজন্য গুণ, দোষ, রীতি এগুলিকে তিনি তেমন গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে গুণও কোথাও দোষ হয় এবং দোষও কোথাও গুণ হয়। অমুক রীতিতে লিখিলে কাব্য হয় এবং অমুক রীতিতে হয় না—ইহাও কোনো কাজের কথা নহে। দোষ ও গুণের যে কাব্যের মধ্যে স্থান নাই—ইহা বামনের প্রতিপক্ষেরা কেহই বলেন নাই। তাঁহারা ইহাই বলিয়াছেন যে দোষ-গুণের উপর নির্ভর করিয়া কাব্য-বিচার করা

একান্ত বহিরঙ্গ-সমাধান। দোষগুণ ইহারা কেহই কাব্যের স্থায়ী ধর্ম্ম নয়। শোভা ও সৌন্দর্য্য যে কাব্যের নিদান—তাহা বামন বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এই শোভা ও সৌন্দর্য্যকে একান্তভাবে শব্দগত ও অর্থগত মনে করিয়া কাব্যকে একান্ত objective বা বহিরঙ্গভাবে আলোচনা করিতে গিয়া কাব্য-সৌন্দর্য্যের যথার্থ স্থান কোথায় তাহার নির্ণয় করিতে না পারিয়া শব্দার্থের মোহজালে নিপতিত হইয়াছিলেন। দোষ, গুণ, অলঙ্কার, রীতি প্রভৃতির আলোচনা এবং কাব্য সৌন্দর্য্যের নিদান কোথায়—এই বিষয়ের অন্বেষণ যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিতেছিল তাহা ভামহ ও ভরত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। ভামহ যে কেবল মাত্র তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক লেখকের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিয়া নিজের গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—তাহা নহে। তাঁহার লেখার বাঁধুনী এমন দৃঢ় ও এমন সুসঙ্গত যে অনেক কালের চিন্তাধারার সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি ঐ জাতীয় গ্রন্থ কখনই লিখিতে পারিতেন না—ইহা বলা যায়। এমন কি ভরতও তাঁহা হইতে প্রাচীন অনেক আলোচনার সাহায্য পাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়। এই প্রাচীন কাব্যালোচনা ভামহের মধ্যে যে আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাঁহার পরবর্ত্তী কালে দণ্ডী ও বামন পর্য্যন্ত তাহা অনেক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হইয়া একটী ভ্রমাত্মক পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বক্রোক্তিবাদ

ভামহ তাঁহার কাব্যালঙ্কারের প্রথমে লিখিয়াছেন যে, সাধুকাব্য-রচনায় ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভ এবং নানা-কলায় বিচক্ষণতা জন্মে, আনন্দ হয় এবং কীর্ত্তিলাভ হয়। নির্ধনের যেমন দাতৃত্ব, মূর্খের পক্ষে যেমন বাক্‌চপলতা, কবি না হইয়াও শাস্ত্রপাঠও তেমনি। চন্দ্র ছাড়া যেমন রাত্রি, বিনয় ছাড়া যেমন সৌন্দর্য্য, কবিত্ব ছাড়াও বাক্‌পটুতা তেমনি নিষ্ফল। গুরুর উপদেশ লাভ করিয়া মূর্খেরাও শাস্ত্র পড়িতে পারে, কিন্তু প্রতিভা ছাড়া কাব্যরচনা সম্ভব নহে। যাঁহারা সৎকাব্য লেখেন তাঁহাদের কাব্যময় বপুঃ মৃত্যুর পরও দেদীপ্যমান থাকে। নিত্যকালের জন্য যাঁহারা কীর্ত্তিলাভ করিতে চান, তাঁহাদের কাব্যরচনায় যত্নপর হওয়া উচিত। শব্দ ও অর্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা উচিত। শব্দ ও অর্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নানা কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া তবে কাব্য রচনায় উদ্যম করিতে হয়। কাব্যগ্রন্থ লিখিতে হইলে দৃষ্টি রাখিতে হয় যে রচিত একটী পদও যাহাতে নিন্দনীয় না হয়। দুষ্ট পুত্র হইলে যেমন নিন্দাভাজন হইতে হয়, কাব্যে দোষ থাকিলেও কবি তেমনি লোকের নিকট নিন্দনীয় হন। কবিত্ব শক্তি না থাকায় অনেক অপরাধ আছে, কিন্তু অকবি হওয়া মৃত্যুতুল্য। স্ত্রীলোকের মুখ যেমন অলঙ্কার না হইলে শোভা পায় না, কাব্য ও তেমনি বিনা অলঙ্কারে সুন্দর হয় না। অনেকে বলেন যে রূপকাদি অলঙ্কার কাব্যের বাহ্যসম্পদ্ কিন্তু ভাষার দোষ না থাকা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভামহ বলেন যে উভয়েরই কাব্যে যথেষ্ট উপযোগিতা আছে।

কাব্যের লক্ষণ করিতে গিয়া ভামহ বলিয়াছেন যে শব্দার্থের সাহিত্যের নাম কাব্য। কাব্য গদ্য ও পদ্য এবং তাহা সংস্কৃত, প্রাকৃত

এবং অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে। ইহার পরে ভামহ নানাবিধ দোষ ও গুণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কতকগুলি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের বিবরণ দিয়াছেন। অর্থালঙ্কারের মধ্যে তিনি উপমা, রূপক, দীপক, আক্ষেপ, অর্থান্তরন্যাস, ব্যতিরেক, বিভাবনা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, প্রেয়ঃ, রসবৎ, ঊর্জ্জস্বি, পর্য্যায়োক্ত, সমাহিত, উদাত্ত, শ্লেষ, অপহ্নুতি, বিশেষোক্তি, তুল্যযোগিতা, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, ব্যাজস্তুতি, সহোক্তি, পরিবৃত্তি, সন্দেহ, অনন্বয় প্রভৃতি অলঙ্কারের বর্ণনা করিয়াছেন। স্বভাবোক্তিকে তিনি অলঙ্কার বলিয়া মানেন নাই। হেতু, সূক্ষ্ম, লেশ প্রভৃতিকেও তিনি অলঙ্কার বলেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে বক্রোক্তি সমস্ত অলঙ্কারের মূল এবং বক্রোক্তি ছাড়া কাব্য হয় না। যতদূর বুঝা যায়, বক্রোক্তি শব্দের দ্বারা তিনি বলিবার ভঙ্গীর বৈচিত্র্য ইহাই বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি স্বভাবোক্তিকে অলঙ্কার বা কাব্য বলিয়া মানেন নাই। যেরূপ ঘটনা স্বাভাবিক ঘটে তাহাকে ঠিক সেইরূপ ভাবে বর্ণনা করিলে তাহাতে বলার ভঙ্গীর বৈচিত্র্য থাকে না। তাই তিনি বলিয়াছেন—"সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, চন্দ্র উঠিয়াছে, পাখীরা উড়িতেছে"—এইরূপ বাক্যে কাব্য হয় না। কারণ ইহাতে কোন বলিবার ভঙ্গীর বৈচিত্র্য নাই।

> "সৈষা সর্ব্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে।
> গতোঽস্তমর্কো ভাতীন্দুর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ॥
> ইত্যেবমাদিকং কাব্যং বার্ত্তামেনাং প্রচক্ষতে।"

ভামহের সমস্ত গ্রন্থ পড়িলে এই ধারণা জন্মে যে তিনি বাক্যের ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে অর্থপ্রকাশকেই কাব্যত্বের প্রয়োজক বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে সমস্ত অলঙ্কারই বক্রোক্তির প্রকার মাত্র।

কাব্যের যে সমস্ত দোষের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার এই খানেই দোষত্ব যে তাহার ফলে বাক্যভঙ্গীতে অর্থপ্রকাশের ব্যাঘাত জন্মে কিংবা এমন কোনো বিপর্য্যস্ত অর্থ আনিয়া উপস্থিত করে, যাহার সহিত সংঘর্ষে কবির অভীষ্ট অর্থ ব্যাহত হয়। ধ্বনিকার ও আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত আর কেহই কাব্যকে অর্থ প্রকাশের বৈচিত্র্য ছাড়া অন্যদিক্ দিয়া দেখিতে পারেন নাই। বামন গুণগুলিকে কাব্য-শোভার জনক ধর্ম্ম এবং অলঙ্কারকে সৌন্দর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এই শোভা বা সৌন্দর্য্যের স্বরূপ কি—তাহা কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারেন নাই। শব্দ ও অর্থ লইয়া কাব্য; সকল বাক্যেই শব্দ এবং অর্থ আছে, কিন্তু সেই বাক্যই কাব্য যেখানে শব্দের কোনো বিচিত্র বিন্যাসে বা বাক্যের কোনো ইঙ্গিতে বক্তব্য অর্থটি একটী নূতন ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করে।

ভামহ দণ্ডী, বামন বা রুদ্রটের ন্যায় বক্রোক্তিকে একটী শব্দালঙ্কার মনে করেন নাই। রুদ্রটের মতে বক্রোক্তি একটী অলঙ্কার। এই অলঙ্কারে শব্দশ্লেষের জন্য বা কাকুর জন্য বক্তা যে অর্থে শব্দ-প্রয়োগ করেন, শ্রোতা তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন যথা—

"অহো কেনেদৃশী বুদ্ধির্দারুণা তব নির্মিতা ?
ত্রিগুণা শ্রূয়তে বুদ্ধির্নতু দারুময়ী ক্বচিৎ।"

বক্তা এখানে 'কে তোমায় এমন দারুণ বুদ্ধি দিল ?' এই প্রশ্ন করিলেন। শ্রোতা সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া উত্তর দিলেন 'বুদ্ধি ত্রিগুণই শোনা যায় দারু-নির্ম্মিত বলিয়া শুনা যায় না।'

"সৈষা সর্ব্বৈব বক্রোক্তিঃ"—ভামহের এই উক্তিই পরবর্ত্তী লোকেরা বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ভামহ অতিশয়োক্তিকেই বক্রোক্তি এবং সমস্ত অলঙ্কারকেই অতিশয়োক্তি-মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই আনন্দবর্দ্ধন ভামহের উক্ত পংক্তিদ্বয়

তুলিয়া লিখিয়াছেন—"তত্রাতিশয়োক্তির্যমলঙ্কারমধিতিষ্ঠতি কবিপ্রতিভা-বশাৎ তস্য চারুত্বাতিশয়যোগোঽন্যস্য ত্বলঙ্কারমাত্রতৈব ইতি সর্বালঙ্কার-শরীরস্বীকরণযোগ্যত্বেন অভেদোপচারাৎ সৈব সর্ব্বালঙ্কাররূপা ইত্যয়মে-বার্থোঽবগন্তব্যঃ"। অর্থাৎ কবিপ্রতিভা দ্বারা অতিশয়োক্তি যে অলঙ্কারকে আশ্রয় করে তাহার যথার্থ চারুত্ব উৎপন্ন হয়, অন্য সমস্ত অলঙ্কার শুধু অলঙ্কার-মাত্রই। অতিশয়োক্তি সমস্ত অলঙ্কারের রূপ ধারণ করিতে পারে বলিয়া লাক্ষণিকভাবে অতিশয়োক্তিকে এখানে সর্ব্বালঙ্কাররূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত কিন্তু এ বিষয়ে আনন্দবর্দ্ধনের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"যাতিশয়োক্তি-লক্ষিতা সৈব সর্ব্বা বক্রোক্ত্যলঙ্কারপ্রকারঃ"। অর্থাৎ এই যে অতিশয়োক্তির বর্ণনা দেওয়া গেল, সমস্ত অলঙ্কারই এইরূপ বক্রতামূলক। কারণ ভামহ অন্যত্র বলিয়াছেন যে সমস্ত বাক্যালঙ্কারই বক্রোক্তি। "বক্রাভিধেয়শব্দো-ক্তিরিষ্টা বাচামলঙ্কৃতিঃ"। অভিনবগুপ্ত আরও বলেন—"যদি তাবদতি-শয়োক্তেঃ সর্ব্বালঙ্কারেষু সমানরূপতা সা তর্হি সামান্যপর্য্যবসায়িনী ইতি তদ্ব্যতিরিক্তো নৈবালঙ্কারো দৃশ্যত ইতি কবিপ্রতিভানং ন তত্রাপেক্ষণীয়ং স্যাৎ। অলঙ্কারমাত্রং চ ন কিঞ্চিদ্ দৃশ্যতে।" অর্থাৎ অতিশয়োক্তিই যদি সাধারণতঃ সকল অলঙ্কারস্বরূপ হইত তবে সে জন্য কবিপ্রতিভার কোনও আবশ্যক হইত না। আর অতিশয়োক্তি অলঙ্কার কেবল অলঙ্কার-মাত্র—একথার কোনও অর্থ হয় না। অলঙ্কারমাত্র বলিয়া কিছু কোথাও দেখা যায় না।

দণ্ডী বলেন যে প্রায় সমস্ত অলঙ্কারেই বক্তব্য অর্থকে বাড়াইয়া বলা হয় এবং সেই জন্য সমস্ত অলঙ্কারেই অতিশয়োক্তির বীজ রহিয়াছে। অতিশয়োক্তি একরূপ বক্রোক্তি। এই জন্য বলা যাইতে পারে যে স্বভাবোক্তি ছাড়া সমস্ত অলঙ্কারই বক্রোক্তিমূলক। বক্রোক্তিকে তাই

তিনি অলঙ্কারসামান্যবচন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাযেই অলঙ্কার দুই প্রকার—স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। বক্রোক্তির অবান্তর বিভাগে উপমাপ্রভৃতি অলঙ্কারের গ্রহণ হইতে পারে। বামন কিন্তু ইহাকে স্বতন্ত্র অলঙ্কার বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ইহা আনন্দবর্দ্ধনোক্ত অবিবক্ষিত বাচ্যব্যঙ্গের অনুরূপ। কিন্তু কুন্তক ছাড়া পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকদের মধ্যে কেহই বক্রোক্তিকে আর কোনও বিশিষ্ট স্থান দেন নাই।

কুন্তক সম্ভবতঃ অভিনবের সমকালীন ছিলেন এবং দশম ও একাদশ শতকের লোক ছিলেন। তাঁহার বক্রোক্তি-জীবিত গ্রন্থখানিতে তিনি কতকগুলি কারিকা ও তাহার বৃত্তি দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, যদিও শত শত অলঙ্কার-গ্রন্থ আছে, তথাপি তাহার কোনোটিতেই কাব্যের দ্বারা যে অলৌকিক চমৎকার বৈচিত্র্য, অসামান্য আহ্লাদ উৎপন্ন হয়, তাহার কোনো কারণনির্ণয় পূর্ব্ববর্ত্তীরা কেহই করিতে পারেন নাই। যাঁহারা কাব্যের মনোজ্ঞতা আস্বাদ করিতে পারেন, তাঁহাদের চিত্তে কাব্যগত রসে যে চমৎকারিতা বা আনন্দ উৎপন্ন হয় তাহার তুলনায় আর সমস্ত আনন্দই তুচ্ছ। যদিও শব্দ ও অর্থ এই উভয় লইয়াই কাব্য এবং যদিও ইহাদের একটী হইতে অপরটির পৃথক্ সত্তা নাই এবং যদিও ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইতে গেলে ইহাদের সত্যরূপ প্রকাশ পায় না, তথাপি ব্যুৎপত্তি-সৌকর্য্যের জন্য বিচ্ছিন্নরূপে তাহাদের আলোচনা করিতে বাধ্য হই। এই জন্যই কাব্যের কি অলঙ্কার বা শোভাজনক এইরূপ আলোচনা সম্ভব; বস্তুতঃ অলঙ্কৃত না হইলে বাক্য কাব্য হয় না। অতএব কাব্যের কোনো অলঙ্কার-নিরূপণ সম্ভব নহে।

"দৃশ্যতে চ সমুদায়ান্তঃপাতিনাম্ অসত্যভূতানামপি ব্যুৎপত্তিনিমিত্তম্ অপোদ্ধৃত্য বিবেচনম্। যত্ত্বেবম্ অসত্যভূতোঽপি অপোদ্ধারঃ তদুপায়তয়া

ক্রিয়তে তৎকিং পুনঃ সত্যম্ ইত্যাহ তত্ত্বং সালঙ্কারস্য কাব্যতা। অয়মত্র পরমার্থঃ সালঙ্কারস্য অলঙ্করণসহিতস্য নিরস্তাবয়বস্য সকলস্য সতঃ সমুদায়স্য কাব্যতা কবিকর্ম্মত্বং"।

শব্দই বাচক এবং অর্থ তাহার বাচ্য। এই বাচক এবং বাচ্য অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থ—ইহাদের মিলিত সত্তাকে কাব্য কহে। কেবল শব্দও কাব্য নয় কেবল অর্থও কাব্য নয়। সেই জন্য যাঁহারা বলেন যে কবি-কৌশল-কল্পিত কমনীয় শব্দই কাব্য এবং যাঁহারা বলেন যে রচনা বৈচিত্র্যের দ্বারা চমৎকারপ্রদ অর্থই কাব্য তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত। শব্দ এবং অর্থ এই উভয়ের মধ্যেই আহ্লাদকারিত্বের বীজ আছে। এবং এই উভয়ের যুগপৎ মিলনেই কাব্য হয়। দণ্ডী বা বামন এই উভয়ের কাহারও লেখা হইতেই কাব্যত্ব ঠিক কাহার—তাহার কোনে স্থির পরি-চয় পাওয়া যায় না। কিন্তু ভামহ "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যং" এই কথার দ্বারা কুন্তকের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। কুন্তক বলেন যে প্রতিভার দারিদ্র্যের জন্য যাঁহারা কেবল মাত্র শব্দচ্ছটার মাধুর্য্য সৃষ্টি করিতে চান, তাঁহারা কাব্যের যথার্থ সম্পদ্ প্রকাশ করিতে পারেন না। আবার কেবলমাত্র অর্থের চাতুর্য্যের দ্বারাও শুষ্ক তর্কের গাঁথুনি বাঁধিলে কাব্যত্ব হয় না। প্রতিভার প্রতিভাসের দ্বারা প্রথমতঃ কবিচিত্তের মধ্যে বর্ণনীয় বস্তুটী অস্ফুটভাবে বিচ্ছিন্ন মণিখণ্ডের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়। এইরূপে অস্ফুট ভাবে যাহা মনের মধ্যে উদিত হয়, তাহাই বক্র বাক্যের দ্বারা যখন প্রকাশিত হয়, তখন পালিশ করা উজ্জ্বল হীরকের মালার ন্যায় তাহা শোভা পায় এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ উৎপাদন করিয়া কাব্যত্ব-পদবী লাভ করে। কুন্তক বলেন যে একই কথা বাক্যের ভঙ্গীতে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইলে তাহাতে কাব্য-সম্পদের প্রচুর ভেদ হয়।

মানিনীজনবিলোচনপাতা-
মুষ্ণবাষ্পকলুষানভিগৃহ্নন্ ।
মন্দ-মন্দ-মুদিতঃ প্রযযৌ খং
ভীত ভীত ইব শীতময়ূখঃ ॥
ক্রমাদেকদ্বিত্রিপ্রভৃতিপরিপাটীঃ প্রকটয়ন্
কলাঃ স্বৈরং স্বৈরং নবকমলকন্দাঙ্কুররুচঃ ।
পুরন্ধ্রীণাং প্রেয়োবিরহদহনোদ্দীপিতদৃশাং
কটাক্ষেভ্যো বিভ্যন্ নিভৃত ইব চন্দ্রোঽভ্যুদয়তে ॥

এই দুইটি কবিতায় একই অর্থ বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন বর্ণবিন্যাসে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া পরেরটী যেমন রমণীয় হইয়াছে প্রথমটি তেমন হয় নাই। কাজেই কেবল শব্দেরও কাব্যত্ব হয় না কেবল অর্থেরও কাব্যত্ব হয় না, শব্দ ও অর্থের মিলিত সত্তার চমৎকারিত্বেই কাব্যত্ব হয়। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে শব্দ এবং অর্থ ত সর্ব্বদাই মিলিত রহিয়াছে। বাচ্য ও বাচক, অর্থ ও শব্দে কোনোখানেই ত ইহাদের মিলিতসত্তার অভাব নাই। তবে ইহাদের সাহিত্যে কাব্য হয় একথা বলার অর্থ কি ? ইহার উত্তরে কুন্তক বলেন যে কাব্য হইতে হইলে এই শব্দার্থসাহিত্যের একটী বিশিষ্টতা আবশ্যক। যখন একটী বাক্য অপর বাক্যের সহিত বিচিত্র বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়, তখন বর্ণের সহিত বর্ণ মিলিয়া সে যেমন একদিকে ছন্দ ও ধ্বনির সাহায্যে স্বর ও ধ্বনি-লহরীর আতান বিতানে রমণীয় মাধুর্য্য সৃষ্টি করিবে, অপর দিকে তেমনি তদ্গর্ভিত অর্থ ও তাহার সহিত তুল্যযোগিতা করিয়া পরস্পর অর্থের দিক দিয়া নূতন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিবে। এমনি করিয়া ধ্বনির সহিত ধ্বনির মিলনে, অর্থের সহিত অর্থের মিলনে যে পরস্পরস্পর্দ্ধি-চারুতাদ্বয় উৎপন্ন হইবে, তাহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্যই এখানে সাহিত্য শব্দের অর্থ।

"সহিতৌ ইত্যত্রাপি যথাযুক্তি স্বজাতীয়াপেক্ষয়া শব্দস্য শব্দান্তরেণ বাচ্যস্য বাচ্যান্তরেণ চ সাহিত্যং পরস্পরস্পর্দ্ধিত্ব-লক্ষণমেব বিবক্ষিতম্"।

উদাহরণস্বরূপ মালতীমাধব হইতে একটী শ্লোক লওয়া যাইতে পারে। কোনও কাপালিক কোনও সুন্দরী নায়িকাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, কোনও ব্যক্তি নায়িকার অসাধারণ লাবণ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—

অসারং সংসারং পরিমুষিতরত্নং ত্রিভুবনং
নিরালোকং লোকং মরণশরণং বান্ধবজনং।
অদর্পং কন্দর্পং জননয়ননির্ম্মাণমফলং
জগজ্জীর্ণারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ॥

এই শ্লোকে কবির চিত্তে নায়িকা নিহত হইলে সংসারের কি ক্ষতি হইবে তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া যেমন একেকটি কথা মনে হইতেছে তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ইহাও মনে হইতেছে যে এইটুকুতে যথেষ্ট হইল না। এই অভাব-বোধের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কবি আর কি উপায়ে তাঁহার বক্তব্য অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, সেই জন্য যত্নবান্ হইতেছেন এবং তাঁহার প্রতি প্রযত্নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিভাপদ্মের প্রত্যেকটী দল যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়া এক একটী নূতন ভাব প্রকাশ করিতেছে। এবং সেই পরস্পর-প্রতিস্পর্ধি ভাবগুলিতে একটি অখণ্ড অর্থ-সম্পদ্ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথম মনে হইল নায়িকা নিহত হইলে সংসার অসার হইবে। কিন্তু ইহা কবির মনের বেদনা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারিল না বলিয়া কবি বলিলেন, সমস্ত ত্রিভুবনের একমাত্র রত্ন অপহৃত হইবে, পৃথিবীর আলো নিভিয়া যাইবে। মনুষ্যের চক্ষুনির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা দূর হইবে, জগৎ শুষ্ক অরণ্য হইবে। এমনি করিয়া এক একটী ভাবের পাপড়ি

পরস্পর প্রতিযোগিতায় ফুটিয়া উঠিয়া একটী সমগ্র ভাব-কমল ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু যদি কবি বলিতেন যে ইহাকে হনন করিলে ইহার বান্ধবেরা মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে ইহাতে কোনো চমৎকারিত্ব থাকিত না। এখানে অনেকগুলি রমণীয় ভাব একটী সমগ্র মহাভাবের মধ্য দিয়া যুগপৎ প্রতিভাত হইবার জন্য একটী যেন অপরটির সাপেক্ষ হইয়া অপরটির তুল্যভাবে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য প্রযত্ন-পরম্পরার দ্বারা কবি-প্রতিভাকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। এবং তাহার ফলে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যে একটী কাব্য-সম্পদ্ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেই ইহার রমণীয়তা ঘটিয়াছে—

"মরণশরণং বান্ধবজনমিতি পুনরেতেষাম্ ন কলামাত্রমপি স্পর্ধিতুং অর্হতি ইতি ন তদ্বিদাহ্লাদকারি। বহুষু চ রমণীয়েষু একবাক্যোপ-যোগিষু যুগপৎ প্রতিভাসপদবীমবতরৎস্থ বাক্যার্থপরিপূরণার্থং তৎ-প্রতিমং প্রাপ্তুম্ অপরপ্রযত্নেন প্রতিভা প্রসাদ্যতে"।

যদি ভাবের পর ভাব উঠিয়া যে আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করিত, নূতন ভাব উঠিয়া তাহা পূরণ করিতে না পারিত, তবে ইহার মনোহারিত্ব থাকিত না। তেমনি শব্দও যদি ইহার অনুরূপ না হইত এবং যদি বিরুদ্ধ সমাস করিয়া বা ক্রমভঙ্গ করিয়া যে শব্দের যেখানে প্রাধান্য তাহা প্রকাশ না করিত, তাহা হইলেও ইহার সৌন্দর্য্যহানি হইত। শব্দগত সৌন্দর্য্যহানিতেও অর্থের সৌন্দর্য্যহানি হইত। শব্দ এবং অর্থ এই উভয়কে লইয়া যে সমগ্রতা তাহার প্রতি অবয়বের পরস্পরের সৌন্দর্য্যে সমগ্রের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। এস্থলে কুন্তক, সমগ্রতার সামঞ্জস্যই যে আর্টের প্রাণ, তাহা অতি সুন্দর ভাবে ধরিয়াছেন। কাব্য-শিল্পের উপাদান শব্দ ও অর্থ; কিন্তু শব্দ এবং অর্থ ইহারা বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ। এই দুইটি পদার্থের একটী বিশিষ্ট জাতীয় সাহিত্যে

বা সম্মিলনে কাব্যশিল্প রচনা হইতে পারে। কাব্যশিল্প ঘটিতে গেলে চাই একদিকে পরস্পর অর্থের সামঞ্জস্যে ক্রমবিকাশ এবং অপর দিকে চাই সেই অর্থের সামঞ্জস্যে শব্দের সহিত শব্দের এমন মিলন, যাহাতে একদিকে যেমন ধ্বনি ও ছন্দে শব্দগুলি অর্থের অনুকূলতা আচরণ করিবে, অপর দিকে তেমনি শব্দগুলির বিন্যাসে অর্থধারা যেন কোনো ক্রমে কলুষিত না হয় বা বিপথে প্রবর্ত্তিত হইতে চেষ্টা না করে তাহার ব্যবস্থা করা। এমনি করিয়া শব্দের সহিত শব্দের সাহিত্য, অর্থের সহিত অর্থের সাহিত্য ও শব্দার্থগত উভয়ের যুগপৎ একযোগিতাকেই কাব্যশিল্পের প্রয়োজক সাহিত্য বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে বলিতে গেলে এই সাহিত্য শব্দকে আমরা 'unity of expression and language' বলিতে পারি। য়ুরোপীয় Expressionism মতের সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। Expressionism মতে বলে যে অর্থমাত্রই তদনুরূপ শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। Intuition এবং expression অভিন্ন। এখানে ফলতঃ intuition এবং expressionএর ঐক্য স্বীকৃত হইলেও কুন্তক বলিয়াছেন যে ব্যুৎপত্তি-সৌকর্য্যের জন্য এই ঐক্যকে আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়া intuition এবং expressionকে দুইটি স্বতন্ত্র আকারের মনে করিয়া, ইহার প্রত্যেক অবয়বের স্বগত বিকাশের মধ্যে unity বা সাহিত্য এবং উভয় অবয়বের অন্যযোগিতায় unity বা সাহিত্য সম্পাদন করিয়া কাব্যশিল্পের সমগ্রতার সৃষ্টি করিতে পারি।

আমরা সাধারণতঃ জানি যে শব্দ অর্থের বাচক। কিন্তু কাব্যে যে শব্দ প্রযুক্ত হইবে সে শব্দ এমন হওয়া চাই যে ঠিক যে অর্থটি কবির অভিপ্রেত সেই অর্থকেই প্রকাশ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভল্লট শতকের একটী কবিতা লওয়া যাইতেছে ঃ—

কল্লোলবেল্লিতদৃষৎপরুষপ্রহারৈঃ
রত্নান্যমূনি মকরাকর মাবমংস্থাঃ।
কিং কৌস্তুভেন ভবতো বিহিতো ন নাম
যাচ্ঞাপ্রসারিতকরঃ পুরুষোত্তমোপি।

হে সমুদ্র তুমি নিরন্তর ঊর্ম্মিমালা ও প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে তোমার রত্নগুলিকে অপমান করিও না। কৌস্তুভমণিতে দেখ তোমার কতদূর উপকার হইল যে স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া পাইবার জন্য হাত বাড়াইলেন।

এখানে সমস্ত রত্নের মহত্ত্ব বাড়াইবার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে রত্নকে অপমান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে গিয়া কৌস্তুভ নামক একটি বিশেষ রত্নের নাম করা হইয়াছে। কৌস্তুভের মাহাত্ম্য থাকিলেও রত্নসাধারণের মাহাত্ম্য না থাকিতে পারে এই জন্য কবি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার বাক্যে তাহা প্রকাশ পায় নাই। এখানে 'কিং কৌস্তুভেন ভবতো বিহিতো ন নাম' ইহার বদলে যদি লেখা হইত "একেন কিং ন বিহিতো ভবতঃ স নাম" তাহা হইলে অর্থ সঙ্গত হইত। অর্থাৎ রত্নকে অপমান করিও না কারণ তাহারই একটী দিয়া তুমি কি না করিলে! আবার কুমারসম্ভবের

দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং
সমাগম-প্রার্থনয়া কপালিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবত -
স্ত্বমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী॥

অর্থাৎ শিবের সহিত যুক্ত হইতে গিয়া এখন দুইটি বস্তুই আমাদের দুঃখের কারণ হইয়াছে—একটী চন্দ্রের কলা আর একটী সকল লোকের

নয়ন-জ্যোৎস্না-স্বরূপ তুমি। শিবের সহস্র নাম থাকা সত্ত্বেও কপালিন্ নামটি লওয়াতে শোকের কারণ হইয়াছে। পূর্ব্বে একটী শোকের কারণ ছিল, এখন তুমি শিবকে বিবাহ করিতে চাও বলিয়া দুইটি শোকের কারণ হইল এই অর্থটি সম্প্রতি ও দ্বয়ম্ এই দুইটি শব্দের দ্বারা স্পষ্ট হইয়াছে। আবার চন্দ্রের কলা কিংবা পার্ব্বতী যদি কোনো আগন্তুক কারণের দ্বারা শিবের সহিত মিলিত হইতেন, তাহা হইলে তত দুঃখের কারণ হইত না কিন্তু ইঁহারা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছেন—প্রার্থনা শব্দের দ্বারা এই কথাটি রমণীয়রূপে স্পষ্ট হইয়াছে। 'সা চ ত্বং চ' এই দুইটি পদ থাকার দরুণ পার্ব্বতী যে চন্দ্রের ন্যায় লাবণ্যশালিনী তাহা বুঝান হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে নিপুণ কাব্যশিল্প রচনা করিতে গেলে এমন শব্দ ব্যবহার হওয়া চাই যাহা দ্বারা কবির সমগ্র মনোভাবটি যথাযথরূপে প্রকাশ পাইতে পারে। সুকবি যখন কাব্য রচনা করেন তখন তাঁহার চিত্তের মধ্যে যে অন্দোলন উপস্থিত হয় তাহার ফলে বর্ণনীয় বাস্তবিক জগতের পদার্থগুলি এমন একটি ভাবোজ্জ্বল বেশে আবৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার মধ্যে উদিত হয় এবং তাহা দ্বারা এমন একটী প্রেরণা উত্থাপিত হয়, যাহার উত্তেজনায় কবি স্বপ্রতিভার সাহায্যে তাঁহার ভাবের রূপকে যথাযথ প্রকাশ করিতে পারে এমন শব্দ আহরণ করিতে পারেন। "কবিবিবক্ষিত-বিশেষাভিধানক্ষমত্বমেব বাচকত্বলক্ষণং, যস্মাৎ প্রতিভায়াং তৎকালোল্লিখিতেন কেনচিৎ পরিস্পন্দেন পরিস্ফুরন্তঃ পদার্থাঃ প্রকৃত-প্রস্তাব সমুচিতেন কেনচিদুৎকর্ষেণ বা সমাচ্ছাদিতস্বভাবাঃ সন্তো বিবক্ষাবিধেয়ত্বেনাভিধেয়তাপদবীম্ অবতরন্তঃ তথাবিধবিশেষ-প্রতিপাদনসমর্থেন অভিধানেন অভিধীয়মানাশ্চেতনচমৎকারিতাম্ আপদ্যন্তে"। এই একটী পংক্তির মধ্যে কুন্তক অনেকগুলি সূক্ষ্ম কথার

আভাস দিয়াছেন। প্রথম কথা এই যে কাব্য রচনার সময় বহির্জগতের যে সমস্ত বর্ণনীয় পদার্থ কবির চিত্তে রূপ গ্রহণ করে তাহা একান্তভাবে বহির্বস্তুর অনুরূপ নহে। কবির সমগ্র মনোভাবের স্ফুরণের দ্বারা অধিবাসিত হইয়া বিষয়বস্তু একটী স্বতন্ত্র অন্তর্লোকের ভাবময় অলৌকিকরূপে আবির্ভূত হয়। ইংরাজীতে বলিতে গেলে আমরা বলিতাম—The external objects take an ideal or emotional form। এই অলৌকিক রূপে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু বাহিরে পরিদৃশ্যমান জড়বস্তু হইতে অনেক পরিমাণে বিভিন্ন। ইহা কবির ভাবলোকেরই অনুরূপ। কবির অন্তরের আলোড়নের মধ্যে অনুভূয়মান বিষয়বস্তু তাহার বাহিরের জড়মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের একটী ভাবময় রূপ গ্রহণ করে। ইহার সান্নিধ্যে কবির চিত্তের মধ্যে যে পরিস্পন্দ উপস্থিত হয়, তাহার ফলে কবি এমন সমস্ত শব্দ আহরণ করিতে পারেন যাহার সহিত তাঁহার ভাবময় বিষয়বস্তুর সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে। কুন্তক বলেন যে কবিচিত্তের মধ্যে যে বিষয়বস্তু নবীন ভাবময় দেহে আপনাকে স্ফুট করিয়া তোলে তাহাই যেন স্বমহিমায় শব্দরূপে অবতীর্ণ হয়, এই উক্তি হইতে মনে হয় যে কুন্তক মনে করিতেন যে, অলৌকিক ব্যাপার-মাহাত্ম্যে জাগতিক বিষয়বস্তু কবির চিত্তের মধ্যে ভাবময় হয়। যথোপযুক্ত শব্দ সঞ্চয়ন ও তাহার বিন্যাসও সেই ব্যাপার-মাহাত্ম্যেই ঘটিয়া থাকে। সকল শিল্পের ন্যায় কাব্যশিল্পও একটী বিশেষ-জাতীয় অন্তরের পরিস্পন্দের ফলে ঘটিয়া থাকে। সেই অন্তরের পরিস্পন্দ বিষয়বস্তুকে আচ্ছাদন করিয়া তাহাকে যেমন ভাবরূপে আলোকিত করে তেমনি সেই ভাবময় রূপকে শাব্দিক রূপে পরিবর্ত্তিত করে। এবং এই জন্যই ভাবরূপের সহিত শাব্দিক রূপের সাহিত্য বা unity সম্ভবপর।

অর্থের কথা বলিতে গিয়া কুন্তক বলেন যে যদিও বাহ্য পদার্থ আমাদের মনের মধ্যে নানাবিধ ভাবধর্ম্মের দ্বারা রচিত হইতে পারে, তথাপি যে বিশেষ-জাতীয় ভাবধর্ম্মের দ্বারা খচিত হইলে তাহা সহৃদয়গণের আহ্লাদজনক হইতে পারে, তাহাই কাব্যাকারে আপনাকে পরিণত করিতে পারে। কি জাতীয় অর্থে সহৃদয়গণের আহ্লাদ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা যথাযথ নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। কোনো সময় বা তাহা একটা মহত্ত্বা বা sublimity সূচনা করে, কোনো সময় বা তাহা অন্তরের রসধাতুকে পরিপুষ্ট করিয়া প্রকাশ করে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বিশিষ্ট-জাতীয় অর্থ ও বিশিষ্ট-জাতীয় শব্দের সাহিত্যেই কাব্য হয়।

কুন্তক এই প্রসঙ্গে বলেন যে শব্দ ও অর্থের যে বিশেষ অলঙ্কৃতি বা বৈচিত্র্য প্রযুক্ত তাহা আপনাকে কাব্যরূপে প্রকাশ করিতে পারে এবং সুন্দর বলিয়া সহৃদয়সমাজে সমাদৃত হইতে পারে, তাহাকেই তিনি বক্রতা এই আখ্যা দিয়াছেন। আমরা আধুনিককালে যাহাকে Aesthetic quality বলি সম্ভবতঃ কুন্তক বক্রতা শব্দে তাহারই সূচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি বলেন যে, কোনো বস্তুর যথাবৎ বর্ণনায় তাহার কাব্যত্ব হয় না। কোনও বস্তুর স্বভাবমাত্র বর্ণনাই অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যাহাই বর্ণনা কর না কেন তাহার স্বভাবটী সেখানে থাকিবেই। সেই স্বভাবের সহিত অতিরিক্ত কোনো প্রকার ভাব ধর্ম্মযুক্ত না হইলে কোনো অলঙ্কার সৃষ্টি হইতে পারে না। এইজন্য দণ্ডি-কৃত স্বভাবোক্তি অলঙ্কার কুন্তক সর্ব্ব-প্রযত্নে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কুন্তক এইখানে এইটুকু বিবেচনা করেন নাই যে যথার্থ স্বভাবোক্তির স্থলেও কোনো বিষয়বস্তুকে তাহার বহিরঙ্গ জড় স্বভাবের স্বস্বরূপে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মানুষের চিত্তে

প্রবেশ করিলেই তাহা বিশিষ্ট চিত্তধর্ম্মের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এবং কোনো মহাকবির বর্ণনার মধ্যে কবিকৌশলের সহিত অসংশ্লিষ্ট ভাবে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না।

শব্দার্থের সাহিত্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কুন্তক বলেন যে, অর্থ না বুঝিলেও সাধু কাব্যের শব্দবিন্যাসেরই এমন মাহাত্ম্য আছে, এমন সৌন্দর্য্য আছে যে তাহা পড়া মাত্রই সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসের ন্যায় হৃদয়কে আনন্দে পরিপ্লুত করে। তাহার অর্থ বোধ হইলে তাহার পদ বা বাক্যের অর্থ ছাড়াইয়া তাহার মধ্য হইতে পানক-রসের আস্বাদের ন্যায় এমন একটী আস্বাদ নির্ঝরিত হইয়া উঠে, যাহা দেহের মধ্যে প্রাণের ন্যায় সমস্ত কাব্যশরীরকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে। শব্দার্থের অতিরিক্ত এই নির্ঝরধারাটুকু না থাকিলে বাক্যাবলী যেন মৃতপ্রায় বলিয়া মনে হয়। তাহা দ্বারা হৃদয়ের মধ্যে এমন একটী সৌভাগ্য-সম্পদ্ বা সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় যাহা কেবলমাত্র কাব্য রসিকেরাই জানেন।

অপর্য্যালোচিতেঽপ্যর্থে বন্ধসৌন্দর্য্যসম্পদা।
গীতবদ্ধৃদয়াহ্লাদং তদ্বিদাং বিদধাতি যৎ॥
বাচ্যাববোধনিষ্পত্তৌ পদবাক্যার্থবর্জিতম্।
যৎকিমপ্যর্পয়ত্যন্তঃপানকাস্বাদবৎ সতাম্॥
শরীরং জীবিতেনেব স্ফুরিতেনেব জীবিতম্।
বিনা নির্জীবতাং যেন বাক্যং যাতি বিপশ্চিতাম্॥
যস্মাৎ কিমপি সৌভাগ্যং তদ্বিদামেব গোচরম্।
সরস্বতী সমভ্যেতি তদিদানীং বিচার্য্যতে॥

কুন্তকের লেখা দেখিয়া মনে হয় না যে তিনি ধ্বনিকার বা আনন্দ-বর্দ্ধনের মতের সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যে সাহিত্য বা unity থাকিলে শব্দার্থ কাব্য হইতে পারে তাহার পরিচয় তিনি যে ভাবে

দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে ধ্বনিবাদীদিগের যেটুকু সারকথা তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। কাব্যের মধ্যে যেটুকু Aesthetic quality বা শোভা-সৌন্দর্য্য আছে, তাহার বলেই তাহার অর্থকে অতিক্রম করিয়া তাহার মধ্য হইতে যে একান্ত নূতনজাতীয় একটী স্ফুরণ হয়, একটী আস্বাদ হয় বা একটী হ্লাদরস উৎপন্ন হয়, তাহা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজীতে বলিতে গেলে আমরা ইহাকে Aesthetic exhilaration বলিতে পারি। ইহা যেন একটী নূতন বিজাতীয় আবির্ভাব বা emergent fact বা emotion। যথাবৎ দেহের কার্য্য চলিলে যেমন প্রাণের স্ফুরণ হয়, অথচ সে প্রাণ দেহ-জাতীয় নহে, কাব্যশরীরকে অবলম্বন করিয়া তেমনি যে সৌন্দর্য্য-সৌভাগ্য স্ফুরিত হয় তাহা কাব্য-উপাদান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই প্রসঙ্গেই কুন্তক কত প্রকারে রচনার নানাবিধ বক্রতা বা Aesthetic character সম্পন্ন হইতে পারে তাহার প্রচুর উদাহরণ দিয়াছেন ও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সাধারণতঃ ছয় প্রকার বক্রতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যেও বহু অবান্তর বিভাগ করিয়াছেন যথা, বর্ণবিন্যাস-বক্রতা, পদ-বক্রতা, পদপূর্ব্বার্দ্ধ-বক্রতা, প্রত্যয়-বক্রতা, বাক্য-বক্রতা, প্রকরণ-বক্রতা, প্রবন্ধ-বক্রতা ইত্যাদি। সৌন্দর্য্যাপাদক ধর্ম্মের আলোচনা করিতে গিয়া কুন্তক একটী বহিরঙ্গ, একটী অন্তরঙ্গ ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ ধর্ম্মটির নাম সৌভাগ্য ও বহিরঙ্গ ধর্ম্মটির নাম লাবণ্য। ইংরাজীতে বলিতে গেলে আমরা ইহাকে subjective বা objective aesthetic quality বলিতে পারি। প্রতিভাব্যাপারের ফলস্বরূপ যে চেতন-চমৎকারিত্ব হয় অর্থাৎ চৈতন্য-ব্যাপারের যে বিশেষ একটী চমৎকারিতা বা হ্লাদ হয় তাহাকে সৌভাগ্য কহে। আর বহিরঙ্গ-সন্নিবেশ-বিশেষে যে সৌন্দর্য্য তাহাকে লাবণ্য কহে। বাক্য বা

অর্থ এবং বাচক বা শব্দ—এই উভয়ের মধ্যেই এই দুইটি অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্যাপাদক ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়।

রীতি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কুন্তক বামনের ত্রিবিধ রীতি ও দণ্ডীর দ্বিবিধ রীতি এ উভয়েই অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কোনো দেশ-বিশেষের নামে কোন রীতির নাম করা চলে না। কারণ রীতি দেশ-বিশেষের ধর্ম্ম নয়। কবি-স্বভাব-ভেদেই রীতির বিভিন্নতা হয়। মোটামুটি তিন প্রকার রীতি বলা যাইতে পারে—সুকুমার, বিচিত্র ও তদুভয়াত্মক মধ্যম। বস্তুতঃ এইরূপ রীতি তিন প্রকার—এই বিভেদও করা যায় না। কারণ প্রত্যেক কবি-স্বভাবের ভেদানুসারে তাঁহাদের লিখনপ্রণালীরও অনন্ত প্রকার ভেদ হইতে পারে। সেগুলিরও পরিগণনা করা সম্ভব নয়। কাব্য-রচনা রমণীয় হইল কি না এইটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কোনো কবি বা সুকুমার-প্রণালীতে লিখিতেই অভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই ভাবে অভ্যাস করিতে পারেন। কাজেই রীতির কোনো অলঙ্ঘ্য বিভাগ সম্ভব নহে। কবিদের শক্তি, রুচি, শিক্ষা ও অভ্যাস বশতঃই তাঁহাদের লিখিবার রীতি বা ভঙ্গীর বিভেদ হইয়া থাকে। এবং তিন রীতির লেখকদের মধ্যেই বড় বড় কবি সাহিত্য-রচনা দ্বারা পৃথিবীতে কীর্ত্তিমান্ হইয়া গিয়াছেন।

কালিদাস প্রভৃতি যে রীতিতে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, কুন্তক তাহাকে সুকুমার রীতি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এই রীতির বিশেষত্ব এই যে কবি কোনও আয়াসের দ্বারা তাঁহার বাক্য বিচ্ছিত্তিশালী করিতে চেষ্টা করেন না। তাঁহার স্বাভাবিক অম্লান প্রতিভায় অতি সামান্য ভাবে অলঙ্কৃত রাখিয়া তিনি যেন বিনা চেষ্টায় লিখিয়া যান, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব এমন হইয়া ফুটিয়া উঠে যে বাহিরের

কোনও অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না। সামান্য দুই একটী কথার যোজনা কবি এমন সুন্দর করিয়া করেন যে পাঠকের চিত্ত তাহাতে আনন্দে ভরিয়া উঠে। রসজ্ঞ ব্যক্তিদের হৃদয়ের মধ্যে কবি এমন সুন্দরভাবে প্রবেশ করিতে পারেন যে অতি অল্প আয়াসেই তিনি তাঁহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারেন। বিধাতার সৃষ্টি-চাতুরী যেমন বিশ্লেষণের দ্বারা আবিষ্কার করা যায় না, এই জাতীয় লেখক-দের বাক্যশিল্পের চাতুরীর মূল-রহস্যও তেমনি বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝান যায় না। এই জাতীয় রচনায় দীর্ঘ সমাসের আড়ম্বর নাই, বিনা ক্লেশে অনায়াসে অর্থটি হৃদয়ঙ্গম হয় ও রসস্নিগ্ধতায় হৃদয়কে প্লাবিত করে। এই সহজকেই সরল ও মধুর ভাবপ্রকাশের রীতিকেই প্রসাদগুণ বলে। এই যে শব্দ ও বর্ণবিন্যাসের সহজ সারল্য, ইহাতে রচনা প্রভৃতিকে লাবণ্যময় করিয়া তোলে। রচনার স্বাভাবিক কোমলতা হৃদয়কে এমনভাবে স্পর্শ করে যে মনে হয় যে হৃদয়ের মধ্যেই কোমলতাটুকুর স্পর্শ পাওয়া গেল। রচনার এই গুণকে আভি-জাত্য বলে।

অনেক সময়ে ব্যচ্যার্থই বর্ণনাকৌশলে অতি সুকুমার ও মধুর ভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং আর কিছুর আকাঙ্ক্ষা রাখে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে subjective aesthetic qualityকে সৌভাগ্য বলে এবং objective aesthetic quality কে লাবণ্য বলে। রচনাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত অন্য জাতীয় রচনা হইতে ইহার সৌভাগ্য ও লাবণ্যেরও ভেদ পরিলক্ষিত হয়। এখানে যেন বিনা আড়ম্বরে কোনও ব্যঙ্গ্যার্থের অপেক্ষা না করিয়া এবং অলঙ্কারের অপেক্ষা না রাখিয়া অতি অনায়াসে কবি ও সহৃদয়ের চিত্তের মধ্যে পরস্পরকে অভিষিক্ত করিয়া একটী আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। সুকুমার-রীতি বর্ণনার পর

কুন্তক বিচিত্র-রীতির কথা কলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে এই রীতিতে লেখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কবির বক্রতা ব্যাপার (Æsthetic activity) যদি যুগপৎ শব্দ এবং অর্থের মধ্যে সমান ভাবে সঞ্চারিত না হয় তবে এই জাতীয় লেখা সম্ভব নয়। কবির পক্ষে কোনো চেষ্টা বা প্রযত্নের উপর নির্ভর না করিয়া যে জাতীয় অর্থের সহিত যে জাতীয় শব্দের সংযোগে সৌন্দর্য্য ফুটিতে পারে, তাহার সমগ্র ব্যাপারটী যদি স্বভাবতঃ বিনা চেষ্টায় পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া না ওঠে, তবে বিচিত্র-রীতির কাব্য সম্ভব হয় না—"যৎ কবিপ্রযত্ননিরপেক্ষয়ৈব শব্দার্থঃ স্বভাবিকঃ কোঽপি বক্রতাপ্রকারঃ পরিস্ফুরন্ পরিদৃশ্যতে।" এই কাব্যের কবিরা বাচ্যার্থকেও যেমন সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, সেই বাচ্যার্থের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীয়মান আর একটি অর্থকেও তেমনি মনোরম ভাবে প্রতীত করাইতে পারেন।

"হে হেলাজিতবোধিসত্ত্ব বচসাং কিং বিস্তরৈস্তোয়ধে
নাস্তি ত্বৎসদৃশঃ পরঃ পরহিতাধানে গৃহীতব্রতঃ।
তৃষ্যৎপান্থজনোপকারঘটনাবৈমুখ্যলব্ধাযশো
ভারপ্রোদ্বহনে করোষি কৃপয়া সাহায়কং যন্মরোঃ॥"

হে সাগর, মহাবোধিসত্ত্বে তুমি হেলাভরে করিলে যে জয়,
কেমনে বাক্যেতে দিব তব পরিচয়।
পরহিতে ব্রতধারী তব সম কোনখানে আর কেহ নাই
যেদিকে যতই মোরা নয়ন ফিরাই।
তৃষ্ণাতুর পান্থজনে বৈমুখ্যের নিত্য যত অযশঃ সঞ্চয়
কোনমতে কোনখানে নাহি যার ক্ষয়
লইয়া তাহারো ভাগ কর দূর মরুলোকে দুর্ভাগ্যের ভয়
তব সম দাতা নাই জয় তব জয়।

এই কবিতাটিতে একদিকে সমুদ্রকে নিন্দা করা হইয়াছে, সেইটি যেরকম মনোহর, অপর দিকে যে ভঙ্গীতে তাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহাও তদ্রূপ মনোহর। আবার যেমন

কিং তারুণ্যতরোরিয়ং রসভরোদ্ভিন্না নবা বল্লরী
লীলাপ্রোচ্ছলিতস্ত কিং লহরিকা লাবণ্যবারাংনিধেঃ।
উদ্গাঢ়োৎকলিকাবতাং স্বসময়োপন্যাস বিশ্রম্ভিণঃ
কিং সাক্ষাদুপদেশযষ্টিরথবা দেবস্য শৃঙ্গারিণঃ॥"

তুমি কি তারুণ্য তরুর নবীন বল্লরী ?
উচ্ছ্বসিত লাবণ্যের তরঙ্গ লহরী ?
ব্যাকুল প্রেমিক তরে ধরেছে মূরতি,
মদনের শিক্ষা বুঝি, তোমামাঝে সতি ?

শ্লোকটিতে একদিকে রূপক এবং অপরদিকে সন্দেহ সম্মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইয়া ইহার কাব্যত্ব সাধন করিয়াছে। অথচ কোন অলঙ্কারটিকেই আর এখানে প্রবল বলা যায় না। এই জাতীয় কাব্যে বাক্যের মুখ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া, শব্দার্থশক্তিকে তিরস্কৃত করিয়া তদতিরিক্ত বৃত্তির দ্বারায় ব্যঙ্গ্যভূত একটী নূতন অর্থ আবিষ্কৃত হয়। শব্দার্থের সাধারণ প্রকাশ-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া এই যে একটী নূতন অর্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ইহাকেই প্রতীয়মানতা বলে। ইহাই যথার্থ বক্রতা—"বাচ্যবাচকবৃত্তিভ্যাং শব্দার্থশক্তিভ্যাং ব্যতিরিক্তস্য তদতিরিক্তবৃত্তেরন্যস্য ব্যঙ্গ্যভূতস্য অভিব্যক্তিঃ ক্রিয়তে। এষ চ প্রতীয়মান-ব্যবহারঃ" (Page 64)। বাক্য-বক্রতার কথা বলিতে গিয়া অন্যত্র কুন্তক বলিতেছেন যে, অনেক স্থলে শব্দার্থ-গুণ ও অলঙ্কার ছাড়া কাব্যের এমন একটী বিশেষ শোভা দেখা যায়, যাহা তাহার প্রাণস্বরূপ হইয়া উদ্ভাসিত হয়। এই যে একটী নূতন অর্থ উদ্ভাসিত

হয়, ইহা কাব্যের সমস্ত উপাদানের গুণকে শব্দার্থগুণালঙ্কার প্রভৃতির বিশেষত্বকে ছাড়াইয়া একটী নূতন চমৎকারিত্ব আনিয়া দেয়। একটী ছবির মধ্যে যেমন চিত্রপট, উল্লেখ বা ড্রয়িং, তাহার বর্ণসন্নিবেশ এবং তাহার কান্তি—এই সমস্তকে ছাড়াইয়া গিয়া একটী নূতন তাৎপর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া ছবিটিকে প্রাণময় করিয়া তোলে, কবির রচনাকৌশলে তেমনি শব্দার্থগুণ ও অলঙ্কারের মহিমাকে অতিক্রম করিয়া কাব্যের একটী নূতন মহিমা ভাসিয়া উঠে। এই নূতন ভাসমান সৃষ্টিকেও বক্রতা কহে। "যথা চিত্রস্য কিমপি ফলকাদ্যুপকরণ-কলাপ-ব্যতিরেকি সকল-প্রকৃতি-জীবিতায়মানং চিত্রকরকৌশলং পৃথক্ত্বেন মুখ্যতয়া উদ্ভাসতে, তথৈব বাক্যস্য মার্গাদি-প্রকৃত-পদার্থ-সার্থ ব্যতিরেকি কবিকৌশল-লক্ষণং কিমপি সহৃদয়সংবেদ্যং সকলপ্রস্তুতপদার্থস্ফুরিতভূতং বক্রত্বং উজ্জৃম্ভতে" (Page 165)। অনেক সময়ে কবিকৌশলের দ্বারা শৃঙ্গারাদি বিবিধ রসও এই ভাবে সমুন্মীলিত হইয়া উঠে। এই চেতনা-চমৎকারী রস-সমুন্মীলন প্রস্তাবিত বাক্যার্থ হইতে ও তদীয়গুণালঙ্কারাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এই জাতীয় রচনাপদ্ধতির বিশেষত্বই এই যে, এখানে শব্দার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের একটি শোভাতিশয্য, তাৎপর্য্য বা রসাদি প্রতীত ও সমুন্মেষিত হয়। কবিকৌশলের বিচিত্রতাই এই জাতীয় বক্রতার সৃষ্টি করে। পুরাতন কথা বলিতে গিয়াও কবি সেখানে নূতন ভাব প্রকাশ করেন। রাজশেখর তাঁহার কাব্য-মীমাংসায় বলিয়াছেন যে, সমস্ত সংসার ভরিয়া প্রতিদিন কবিরা সার সংগ্রহ করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের ভাবপ্রকাশের নবীনতার অভাব হয় না। বাক্যার্থের দ্বারা ভাব-প্রকাশের এই বিচিত্র প্রণালীকেই কুন্তক বিচিত্র-রীতি বলিয়াছেন।

"যদপ্যনূতনোল্লেখং বস্তু যত্র তদপ্যলম্।
উক্তিবৈচিত্র্যমাত্রেণ কাষ্ঠাং কামপি নীয়তে॥
যত্রান্যথাভবৎ সর্ব্বমন্যথৈব যথারুচি
ভাব্যতে প্রতিভোল্লেখমহত্ত্বেন মহাকবেঃ॥
প্রতীয়মানতা যত্র বাক্যার্থস্য নিবধ্যতে।
বাচ্যবাচকবৃত্তিভ্যাং ব্যতিরিক্তস্য কস্যচিৎ॥
স্বভাবঃ সরসাকূতো ভাবানাং যত্র বধ্যতে।
কেনাপি কমনীয়েন বৈচিত্র্যেণোপবৃংহিতঃ॥
বিচিত্রো যত্র বক্রোক্তিবৈচিত্র্যং জীবিতায়তে
পরিস্ফুরতি যস্যান্তঃ কাপ্যতিশয়াভিধা॥"

পুরাতন বস্তুও বর্ণনার নূতন ভঙ্গিমায় ও বৈচিত্র্যে অতিশয় মনোহারি হয়। মহাকবিরা স্বীয় রুচি অনুসারে বস্তুমাত্রকেই ন না প্রকারে বর্ণনা করেন ও তাহার ফলে রচনার কমনীয়তায় ও বৈচিত্র্যে পরিশোভিত ও প্রাণবান্ হইয়া বাচ্যার্থব্যতিরিক্ত একটি অনির্ব্বচনীয় সরস ভাব প্রস্ফুট হইয়া উঠে।

কুন্তক বলেন যে সুকুমার ও বিচিত্র এই পূর্ব্বোক্ত উভয় মার্গের সম্মিলনকে মধ্যম-মার্গের রচনা বলে। কালিদাস সর্ব্বসেনা প্রভৃতি কাব্য সুকুমার-পদ্ধতিতে লেখা হইয়াছে; হর্ষচরিতে বাণভট্টের লেখা, ভবভূতি ও রাজশেখর প্রভৃতির লেখা বিচিত্র-মার্গের। মাতৃগুপ্ত, মায়ুরাজ ও সন্তীর প্রভৃতির লেখা মধ্যমমার্গের।

সাধারণতঃ সকল উত্তম কাব্যের দুইটি গুণ বিশেষভাবে থাকা আবশ্যক—একটী ঔচিত্য, অপরটি সৌভাগ্য। যেখানে বর্ণনীয় বিষয়ের স্বরূপটি কবি-পরিকল্পনার দ্বারা বা কবিপরিকল্পিত বক্তা বা শ্রোতার

স্বভাবের দ্বারা একটী নূতন মাহাত্ম্য বা উৎকর্ষের দ্বারা মণ্ডিত হয়—তাহাকে ঔচিত্য কহে।

শরীরমাত্রেণ নরেন্দ্র তিষ্ঠন্
আভাসি তীর্থপ্রতিপাদিতর্দ্ধিঃ।
আরণ্যকোপাত্তফলপ্রসূতিঃ
স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্টঃ॥

যোগ্য পাত্রে করি দান বিভব তোমার,
হে রাজন্ আজি তুমি দেহমাত্র সার।
নীবার স্তবক হ'তে ধান্যের সম্ভার,
বনবাসী নিলে যথা বৃন্ত শোভে তার।

—রঘুবংশের এই শ্লোকটিতে মুনি নিজের চরিত্রানুগতভাবে ও নিজের অভিজ্ঞতানুরূপভাবে রাজাকে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, নীবার তৃণধান্য যেমন তাহার সমস্ত ধান্যসম্পদ্ অপরকে বিলাইয়া দিয়া আপন বৃন্তটিতে অবশিষ্ট থাকে, হে নরেন্দ্র! আপনিও তেমনি সমস্ত ধন সৎপাত্রে দান করিয়া কেবল শরীরমাত্রে বাঁচিয়া আছেন। এখানে দেখা যাইতেছে যে মুনি তাঁহার জীবনে যে সামান্য অভিজ্ঞতা-টুকু অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্কীর্ণপরিসর ক্ষেত্র হইতেই তিনি রাজাকে নীবার তৃণধান্যের সহিত তুলনা দিয়াছেন। এই যে দেশ, কাল, বক্তা, শ্রোতা প্রভৃতির অনুরূপভাবে বিষয়বস্তুকে দেখা, তাহাকে বলে ঔচিত্য। যে গুণসম্ভার থাকিলে অর্থাৎ কবি-প্রতিভা, শব্দ-সামর্থ্য, অর্থ-সামর্থ্য, গুণ ও বক্রতা প্রভৃতি থাকিলে কোন কাব্য সহৃদয় পাঠকের চিত্তকে অলৌকিক চমৎকারে পূর্ণ করিতে পারে, তাহাকে সৌভাগ্য বলে।

ইতিপূর্ব্বে কুন্তক লাবণ্য ও সৌভাগ্যের ভেদ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সৌভাগ্যপদে subjective aesthetic quality বা সৌন্দর্য্য-বিধায়ক অন্তরঙ্গ ধর্ম্মকে লক্ষিত করিয়াছিলেন এবং লাবণ্যপদে objective aesthetic quality বা সৌন্দর্য্যবিধায়ক বহিরঙ্গ ধর্ম্মকে বুঝাইয়াছিলেন। এখানে তিনি বলিতেছেন যে কবির অন্তরঙ্গ প্রতিভা ও বহিরঙ্গ সর্ব্ববিধ কাব্য-সামগ্রীর একত্র সম্মিলনে যখন অন্তরঙ্গ সৌভাগ্য উৎপন্ন করিতে পারে, বহিরঙ্গ ভাবে তাহাকে সৌভাগ্য-ধর্ম্ম বলা যায়। সাধারণভাবে শব্দার্থের যে বিশেষ সন্নিবেশে হৃদয়ের মধ্যে চমৎকার উপস্থিত হয়, কেবল সেই বহিরঙ্গ ধর্ম্মকে লাবণ্য বলা যায়। আর কবির অন্তরঙ্গ প্রতিভাদির সহিত সমগ্র কাব্য-সামগ্রীর অতি অখণ্ড সন্নিবেশাদিতে সহৃদয় পাঠকের চিত্তে যে অলৌকিক-চমৎকার উৎপাদন করে—তাহাকেও কুন্তক সৌভাগ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "সর্ব্বসম্পৎ পরিস্পন্দি সম্পাদ্যং সরসাত্মনাম্। অলৌকিকচমৎকারকারি কাব্যৈকজীবিতম্। সৌভাগ্যমপি পদবাক্য-প্রকরণ-প্রবন্ধানাম্ প্রত্যেকমনেকাকার-কমনীয়-কারণকলাপকলিতরামণীয়কানাং কিমপি সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্যং কাব্যৈকজীবিতং অলৌকিকচমৎকারকারি" (পৃঃ ৭৭—৭৮)। কুন্তক তাঁহার বক্রোক্তিজীবিতের দ্বিতীয় উন্মেষে যে যে কারণে কাব্যের সৌভাগ্য ও লাবণ্য (aesthetic quality) জন্মে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের বক্রতা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—যথা বর্ণবিন্যাস-বক্রতা পদ-বক্রতা, রূঢ়িবক্রতা, পর্য্যায়বক্রতা, উপচারবক্রতা, বিশেষণবক্রতা, সংবৃতিবক্রতা, প্রত্যয়বক্রতা, শব্দবক্রতা, সমাসবক্রতা, ভাববক্রতা, লিঙ্গবক্রতা, লিঙ্গবৈচিত্র্যবক্রতা, ক্রিয়াবৈচিত্র্যবক্রতা, কালবক্রতা, কারকবক্রতা, সংখ্যাবক্রতা, পুরুষবক্রতা, উপগ্রহবক্রতা, পদবক্রতা, প্রকরণবক্রতা, বাক্যবক্রতা, বস্তুবক্রতা। এই সমস্ত বর্ণনার সময় তিনি

নানা স্থান হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নানাবিধ প্রকারের বক্রতার স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, যে কারণে ও যে যে উপায়ে কাব্যের সৌন্দর্য্য সাধিত হয় ও হৃদয়ে চমৎকারকারী আহ্লাদ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই তিনি বিভিন্ন প্রকারের বক্রতা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

অলঙ্কার সম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত যেমন বলিয়াছেন যে রসের শোভা বৃদ্ধি না করিলে কোনো অলঙ্কারকেই অলঙ্কার বলা যায় না অর্থাৎ অলঙ্কার শব্দেরও গুণ নয়, অর্থের ও গুণ নয়, কিন্তু রসের শোভা-সম্পাদক ধর্ম্ম, কুন্তকও তেমনি বলিয়াছেন যে বক্রতার সহিত অন্বিত না হইলে অলঙ্কার অলঙ্কার হয় না। উপমাদি অলঙ্কার কেবলমাত্র সাদৃশ্যাদি ধর্ম্মের দ্বারা অলঙ্কার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বক্রতার সহিত অন্বিত হইয়া কাব্যের শোভা বৃদ্ধি না করিলে তাহা অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কুন্তকের এই মত রুয্যক প্রভৃতি পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকেরাও স্বীকার করিয়াছেন। আনন্দ-বর্দ্ধন বা ধ্বনিকার ইঁহারা কেহই অলঙ্কারের স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। ইঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ধ্বনির অঙ্গভূত না হইলে, বা ধ্বনির বিচ্ছিত্তি-সাধন না করিলে অলঙ্কার মাত্রই গুণীভূতব্যঙ্গ্যের অনুরূপ হয় এবং তাহা দ্বারা যে কাব্য হয় তাহাকে চিত্রকাব্য বলা যাইতে পারে এবং কাব্য-শ্রেণীর মধ্যে তাহা অতি অধম। মম্মট বলিয়াছেন যে, রসের পোষক না হইলে বা রস না থাকিলে অলঙ্কার উক্তিবৈচিত্র্যমাত্র। বৈচিত্র্য, বিচ্ছিত্তি ও বক্রতা—ইহাদের মধ্যে কথঞ্চিৎ অর্থসাম্য আছে। ভামহ অতিশ-য়োক্তিকে বক্রতা-স্বরূপ বলিয়া বলিয়াছেন এবং মম্মট অতি-শয়োক্তিকে অলঙ্কারের প্রাণস্বরূপ বলিয়াছেন। ভামহ এবং কুন্তক

কেহই হেতুকে অলঙ্কার বলিয়া মানেন নাই। মম্মট বৈচিত্র্য নাই বলিয়া হেতুকে অলঙ্কার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। রুয্যক তাঁহার অলঙ্কার-সর্ব্বস্বে সন্দেহালঙ্কার বর্ণনার স্থলে বা ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার বর্ণনার স্থলে বলিয়াছেন যে, কেবল সন্দেহ বা ভ্রান্তি হইলেই সন্দেহালঙ্কার বা ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার হয় না। তাহা কবিজনোচিত সৌন্দর্য্যাধায়ক সন্দেহ বা ভ্রান্তি হওয়া আবশ্যক।

তেমনি অনুমান অলঙ্কারের স্থলেও কবিজনোচিত না হইলে কেবল মাত্র ধূম হইতে বহ্নি অনুমানের দ্বারা অনুমান অলঙ্কার হয় না। কবি-প্রতিভোত্থিত এবং কবি-প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ শোভাতিশয্য না থাকিলে অলঙ্কার হয় না। আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন—"অলঙ্কারো হি চারুত্বহেতুঃ।" কুন্তক বিশেষণ-বক্রতা প্রভৃতি নানাবিধ বক্রতা আলোচনাকালে বক্রতার ফলে কিরূপে অলঙ্কার হয় তাহা অতি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। ভামহ বক্রতা নাই বলিয়া স্বভাবোক্তি অলঙ্কারকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। রুয্যক তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে কবিজনোচিত সূক্ষ্ম বিচ্ছিত্তি (শোভা) যেখানে সেইখানেই স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়। বিচ্ছিত্তির (শোভার) অভাব-প্রযুক্তই কুন্তক বিশেষোক্তি, হেতু, সূক্ষ্ম, লেশ, আশীঃ প্রভৃতিকে অলঙ্কার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অধিকাংশ আলঙ্কারিকেরা উপমা-গর্ভিত বলিয়াই অলঙ্কারের অলঙ্কারত্ব মানিয়াছেন। কুন্তক, অনন্বয়, তুল্যযোগিতা, নিদর্শনা, প্রতিবস্তূপমা, পরিবৃত্তি প্রভৃতির এই জন্যই অলঙ্কারত্ব স্বীকার করেন নাই যে উপমা ছাড়া তাহাদের অলঙ্কারত্ব হয় না। এইজন্য ঐ সমস্ত অলঙ্কারকে স্বতন্ত্র অলঙ্কার না মানিয়া তাহাদিগকে প্রতীয়মান উপমা বলা যাইতে পারে বলিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কুন্তক রসকে অস্বীকার করেন নাই।

কিন্তু রসকে বক্রতারই প্রকারভেদ বলিয়া মানিয়াছেন। চতুর্থ উন্মেষে তিনি বলিয়াছেন—

"নিরন্তর-রসোদ্গার-গর্ভ-সৌন্দর্য্য-নির্ভরাঃ।
গিরঃ কবীনাং জীবন্তি ন কথামাত্রমাশ্রিতাঃ॥"

অর্থাৎ কেবল মাত্র কথা আশ্রয় করিয়া কাব্য হয় না, রসভারে সৌন্দর্য্য-ময় হইয়া উঠিলেই তাহা কাব্য হয়। ভামহ ও দণ্ডী রসবদলঙ্কার বলিয়া একটি স্বতন্ত্র অলঙ্কার স্বীকার করিয়াছিলেন। রস যেখানে বাচ্যার্থের অঙ্গভূত হয় সেইখানেই রসবদলঙ্কার হয়। কিন্তু কুন্তক তাহা স্বীকার করেন নাই। আনন্দবর্দ্ধনের ন্যায় কুন্তক বলেন যে, রসকে কখনো শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। রসবৎ, প্রেয়ঃ, ঊর্জ্জস্বি এবং সমাহিত প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্য-প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগুলিকে আনন্দবর্দ্ধন গুণীভূতব্যঙ্গ্যের মধ্যে ফেলিয়াছেন। কিন্তু কুন্তক বলেন যে উহারা অল-ঙ্কারও নহে গুণীভূতব্যঙ্গ্যও নহে উহারা অলঙ্কার্য্য। রসবৎ প্রভৃতি অল-ঙ্কারে রসই প্রধান। রসই কাব্য এবং সেই জন্যই উহাকে অলঙ্কার বলা চলে না। সুকুমার ও বিচিত্র-রীতি বর্ণনা উপলক্ষে এবং বাক্য-বক্রতা বর্ণনার সময় তিনি রসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে তাহার সহিত আনন্দবর্দ্ধনাদির মতের পার্থক্য এই যে, তিনি রসকে বক্রতার একটা প্রকার বলিয়া মনে করিতেন। ইহা ছাড়া ধ্বনিকেও তিনি বক্রতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার উপচার-বক্রতা আনন্দবর্দ্ধনের লক্ষণামূল-ধ্বনির অনুরূপ। আনন্দবর্দ্ধনাদির ন্যায় তিনি ধ্বনিকেই একমাত্র কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন না। ইঁহাদের মতে ধ্বনি প্রধান নয়, ধ্বনি গৌণ বা ভাক্ত; বক্রোক্তিই প্রধান; ধ্বনি তাহার অঙ্গভূত। ভামহ, উদ্ভট, দণ্ডী ও বামন প্রভৃতিও পর্য্যায়োক্ত প্রভৃতি অলঙ্কার স্থলে ধ্বনির সত্তা স্বীকার করিয়াছেন।

কুন্তক বিচিত্র-রীতি বর্ণনার স্থলে এই ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থের বিশেষ গৌরব করিয়া গিয়াছেন। পদ-বক্রতা, রূঢ়ি-বক্রতা, পর্য্যায়-বক্রতা ও উপচার-বক্রতা স্থলেও কুন্তক ধ্বনি অস্বীকার করেন নাই। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ধ্বনি-স্বীকার বিষয়ে আনন্দবর্দ্ধনের সহিত কুন্তকের বিশেষ বিবাদ নাই। কুন্তক যে কেবল মাত্র লক্ষণামূল ধ্বনি স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে। তিনি বস্তু-ধ্বনি এবং রসধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি এই ত্রিবিধ ধ্বনি স্বীকার করিয়াছেন। কুন্তক এই বিষয়ে আনন্দবর্দ্ধনের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন কিংবা তাঁহার স্বতন্ত্র প্রতিভা বলে বক্রতার অঙ্গভূত বলিয়া ধ্বনিকে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন। যদিও পরবর্ত্তী লেখকেরা কুন্তককে বড় একটা আমল দেন নাই, তথাপি সব দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে, কুন্তক যেরূপ সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের সব দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা ধ্বনিকার ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদের লেখায় দেখা যায় না। ধ্বনিকার প্রভৃতি রসবোধের অসামান্য বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সব দিক্ দিয়া কুন্তকের বিশ্লেষণে যে সাধারণ সম্পূর্ণতা দেখা যায় তাহা অতি বিস্ময়কর। নিবিষ্ট হইয়া অনুধাবন করিলে দেখা যায়, তাঁহার লেখার মধ্যে অতি আধুনিক সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতির আভাস তাঁহার প্রাচীন পরিভাষার মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

রস ও কাব্য

সম্ভবতঃ ভরতের পূর্ব্ব হইতেই নাট্যরস সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া আসিতেছিল। যদিও নাট্যে রস-নিষ্পত্তির ক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত তথাপি কাব্যের মধ্যেও রসের স্থান আছে। ইহাও প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মনে উঠিয়াছিল—এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। ভামহ এক স্থানে "রসবদ্দর্শিতস্পৃষ্টশৃঙ্গারাদিরসং যথা" এই পংক্তিটিতে রসবদলঙ্কারে বাচ্যার্থের অঙ্গভূত রসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া "সৈষা সর্ব্বত্র বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে" এই বাক্যে যে বিভাবনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অভিনবগুপ্ত বলিয়াছিলেন যে, বিভাবনাদির দ্বারা বক্রোক্তি-প্রযুক্ত কাব্যার্থ রস-পদবীতে আরোহণ করে। তাহা ছাড়া কাব্য-লক্ষণের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভামহ বলিয়াছেন—

চতুর্বর্গাভিধানেঽপি ভূয়সার্থোপদেশকৃৎ।

যুক্তং লোকস্বভাবেন রসৈশ্চ সকলৈঃ পৃথক্ ॥ (ভামহ ১।২১)।

তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে কাব্যের মধ্যে রস যে একটী প্রধান বস্তু তাহা ভামহের অগোচর ছিল না। আর এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন—

স্বাদুকাব্যরসোন্মিশ্রং শাস্ত্রমপ্যুপযুজ্যতে।

প্রথমালীঢ়মধবঃ পিবন্তি কটু ভেষজম্ ॥

অর্থাৎ কাব্যরস পান করিয়া লোকে শাস্ত্রও পড়িতে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কারণ প্রথম মধু লেহন করিয়া লোকে পরে কটু ঔষধ পান করিতেও পারে। অভিনবগুপ্ত প্রভৃতির কালে রসের যেমন ঘনীভূত আলোচনা হইয়াছিল, ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতির মধ্যে রসের সে জাতীয়

পারিভাষিক আলোচনা দেখা যায় না। দণ্ডী কিন্তু কেবল যে রসবদ-লঙ্কার স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি মাধুর্য্য-রীতি যে রসময়ী তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ এই 'রস' শব্দটি সাধারণ ভালোলাগা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। রস শব্দের একটী সাধারণ আর একটী পারিভাষিক অর্থ আছে। সাধারণ অর্থে রস শব্দে স্বাদ, পারিভাষিক অর্থে রস শব্দে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি বুঝায়। দণ্ডীর বাগ্‌রস বা বস্তুরস শব্দ সম্ভবতঃ এই স্বাদকেই বুঝাইত। বাগ্‌রসের মধ্যে অনুপ্রাসাদির বাহুল্যে যে মনোহারিতা তাহাই গৃহীত হইয়াছে এবং বস্তুরসের মধ্যে গ্রাম্যতাদি-দোষ-বিরহ-প্রযুক্ত অর্থের স্বাদ-সম্ভোগ-সম্ভাবনা দ্যোতিত হইয়াছে। কিন্তু ভরত যে অর্থে রস শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, দণ্ডী প্রভৃতির তাহা না জানা থাকার কোন কারণ নাই। প্রত্যুত, তিনি মহাকাব্যের বর্ণনায় বলিয়াছেন যে উহাতে রস ও ভাব থাকা আবশ্যক এবং তাহা ছাড়া তিনি ভরতোক্ত আটটী রসের উল্লেখ করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত ভরতের রসসূত্রের টীকায় বলিয়াছেন যে রসসম্বন্ধে দণ্ডীর মত অনেকটা ভট্টলোল্লটের মতের অনুরূপ। দণ্ডী রসসম্বন্ধে যে সামান্য কিছু লিখিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার মত সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নহে। কিন্তু "রতিঃ শৃঙ্গারতাং গতা" কিংবা "ক্রোধো রৌদ্রাত্মতাং গতঃ" এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা মনে হয় যে, যে কোন রকমেই হউক স্থায়ী ভাবগুলি যে রস-পদবী প্রাপ্ত হয়, এ সম্বন্ধে তাঁহার একটা মোটামুটি ধারণা ছিল। কিন্তু অভিনবাদির মধ্যে রসের যে প্রধানতা দেখা যায় দণ্ডীতে তাহা পাওয়া যায় না। তিনি অলঙ্কার ও রীতির অঙ্গরূপেই রসকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বামন সকল অলঙ্কারকেই ঔপম্যগর্ভ মনে করিয়াছিলেন বলিয়া রসবৎ, প্রেয়ঃ প্রভৃতির অলঙ্কারত্ব

স্বীকার করেন নাই। রসকে তিনি কাব্যের একটি প্রধান গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই গুণটির নাম কান্তি। উদ্ভট ভামহের ন্যায় কেবল রসবদলঙ্কারের মধ্যেই রসকে স্বীকার করেন। কিন্তু তথাপি—

"রসাদ্যধিষ্ঠিতম্ কাব্যম্ জীবদ্রূপতয়া যতঃ।
কথ্যতে তদ্রসাদীনাং কাব্যাত্মত্বং ব্যবস্থিতম্॥"

অর্থাৎ রস থাকিলেই কাব্যকে জীবিত বলা যায়। সেইজন্য রসকে কাব্যের আত্মা বলা যাইতে পারে। এই শ্লোকটি উদ্ভটের সকল সংস্করণে দেখা যায় না এবং অনেকে মনে করেন যে শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। বস্তুতঃ উদ্ভটের সাধারণ লেখা হইতে সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথের ন্যায় রসই কাব্যের আত্মা এই জাতীয় মত আশা করা যাইতে পারে না। রুদ্রট রসের সহিত কাব্যের যে একটা গাঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রাচীন আটটি রসের সহিত প্রেয়ঃ এবং শান্ত এই দুইটী রস জুড়িয়া দিয়া তিনি দশটী রস স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের উপর দুইটি অধ্যায় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু রসের সহিত কাব্যের কি যোগ তাহা কোথাও তিনি পরিস্ফুট করিয়া লেখেন নাই। রুদ্রটের মতে শব্দ এবং অর্থই কাব্যের প্রধান উপাদান। ইহার মধ্যে রসের স্থান কোথায়, তাহা তাঁহার সুচিন্তিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার প্রধান দৃষ্টি ছিল অলঙ্কারের দিকে। বস্তুতঃ ভামহ, দণ্ডী, রুদ্রট, বামন প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকদের কাহারও মধ্যে আমরা রস সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত কথা পাইতে আশা করি না।

প্রাচীনদের মধ্যে কেবল মাত্র ভরতের মধ্যেই রসের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাওয়া যায়। অভিনবগুপ্তের টীকা হইতে ঐ রস সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারদিগের মতের আভাস পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে প্রথম দু-একটী পারিভাষিক শব্দের অর্থ দেওয়া আবশ্যক। রসসম্বন্ধে সকল আলোচনাতেই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া রস উৎপন্ন হয় এবং পারিপার্শ্বিক যে সমস্ত অবস্থা রসোদ্গারের প্রতি অনুকূল হয়, তাহাকে যথাক্রমে আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব কহে। ইংরাজীতে বলিতে গেলে আমরা বলিব যে ইহারা রসের objective conditions। কোন কবিতাতে যদি কোন নায়ক-নায়িকার পরস্পরের অনুরাগের কথা বর্ণিত হয়, তবে তাহারা পরস্পর পরস্পরের মনোভাবের প্রতি আলম্বন বিভাব। "বিভাবয়ন্তি ইতি বিভাবাঃ" অর্থাৎ যাহাদের অবলম্বন করিয়া রসের সৃষ্টি তাহাকেই বিভাব বলে। স্ত্রী-পুরুষ না থাকিলে শৃঙ্গার-রস হইতে পারে না—এই জন্য শৃঙ্গার মনোভাবের প্রতি ইহারা পরস্পর পরস্পরের আলম্বন। যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনায় শৃঙ্গার-মনোবৃত্তিকে প্রকাশের অবসর দেয় কিংবা উদ্‌বুদ্ধ বা উত্তেজিত করে তাহাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। দুইটি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে শৃঙ্গার বৃত্তি উদ্‌বুদ্ধ হইতে হইলে তাহার উপযুক্ত অবসর থাকা উচিত। যথা—সুন্দর মনোরম নির্জ্জন স্থান ইত্যাদি। কিন্তু শৃঙ্গারাদি মনোভাব কোন শরীর চেষ্টা ব্যতিরেকে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। একজন যদি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় অথচ তাহার সমস্ত শরীর, অবয়ব, চক্ষু প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাবে থাকে, তবে সে ক্রোধবৃত্তি স্ফুট হইতে পারে না। শারীরিক অঙ্গবিক্ষেপাদির দ্বারাই শৃঙ্গারাদি বিবিধ মনোভাব স্ফুট হইতে পারে। ইংরাজীতে বলিতে গেলে এইগুলিকে emotionএর expression বলা যাইতে পারে। expression ছাড়া কোনও emotionই স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না।

এই expression কেই অনুভাব কহে। শৃঙ্গারাদি কোন একটি প্রধান ভাব-উপভোগের সময় তাহার উপাদান-স্বরূপ যে সমস্ত চঞ্চল ভাব চিত্তকে অনুরঞ্জিত করিয়া যায়, তাহাদিগকে ব্যাভিচারী ভাব কহে। শৃঙ্গার-মনোভাবে চিত্ত অভিষিক্ত হইলে কোন সময় লজ্জা, কোন সময় আনন্দ, কোন সময় শঙ্কা ইত্যাদি ছোট ছোট ভাব দ্রুত-বেগে সংমিশ্রিত হইয়া চলিতে থাকে, এইগুলিকে ব্যাভিচারী বা সঞ্চারী ভাব কহে।

ভরত তাঁহার নাট্যসূত্রে লিখিয়াছেন—"বিভাবানুভাবব্যাভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।" এই সূত্রের সংযোগ আর রসনিষ্পত্তি এই দুইটী শব্দ লইয়াই অভিনবগুপ্ত ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাদের কয়েকটী প্রধান মত অভিনবগুপ্ত তাঁহার অভিনব-ভারতী টীকাতে বিবৃত করিয়া সমালোচনা করিয়াছেন এবং পরিশেষে স্বকীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভট্টলোল্লট প্রভৃতি বলেন যে আমাদের অন্তরের স্থায়ী ভাবের সহিত বিভাব প্রভৃতির সংযোগ হওয়াতে রস উৎপন্ন হয়। এখানে আর কিছু বলার পূর্ব্বে স্থায়ী ভাব সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে আমাদের চিত্তের মধ্যে কয়েকটি ভাব বা emotions অন্তরের গূঢ় প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এইগুলি প্রধানতঃ আট প্রকার। যথা, রতি বা যৌনভাব (sex-emotion), হাস বা sense of the ludicrous, করুণ বা pathos বিয়োগ-জনিত দুঃখ জাতীয়, বীর বা heroic উৎসাহ-প্রধান এবং সাহস-প্রধান চিত্তবৃত্তি, ক্রোধ বা anger, অপকার সহ্য না করার যে তীব্র ভাব, ভয় বা fear, বীভৎস বা disgust কোন জুগুপ্সাকর বস্তুর সন্নিধিতে চিত্তের সঙ্কোচ, অদ্ভুত বা wonder বিস্ময়-ব্যাপার বৃত্তি। ইহার

অনেকগুলিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ instinctive emotions, আলঙ্কারিকেরা বলেন যে এই বৃত্তিগুলি সকলের চিত্তের মধ্যেই স্থায়ি-ভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। উদ্বোধক বস্তুর ও আলম্বন বস্তুর সন্নিধিতে ইহারা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। যখন লৌকিক কারণে অর্থাৎ যথার্থ ভয়ের বস্তু দেখিয়া কেহ ভীত, বিস্ময়ের বস্তু দেখিয়া বিস্মিত, ক্রোধের কারণে ক্রুদ্ধ হয়, তখন সেগুলিকে ভয়, বিস্ময়, ক্রোধ প্রভৃতি লৌকিক বৃত্তি বলিয়া বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন লৌকিক কারণে ঐ সমস্ত ভাব উৎপন্ন না হইয়া কাব্য বা নাট্য শিল্পের দ্বারা উহা অভিব্যক্ত হয়, তখন ঐগুলিকে রস কহে। রস অর্থে সাধারণ emotion বুঝায় না। শিল্পের দ্বারা অভিব্যক্ত emotion বা ভাবকেই রস কহে। রস-সম্বন্ধের আলোচনায় প্রধান প্রশ্ন এই যে, শিল্পগত কারণে কেমন করিয়া উহা উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। ভট্টলোল্লট প্রভৃতিরা বলেন যে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারীগুলি পরস্পর-পোষকতা করিয়া যখন সংযুক্ত হয়, তখনই রস উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন সর্প না থাকিলেও সর্পভ্রমে রজ্জু দেখিয়াও ভয় উৎপন্ন হয়, তেমনি সীতা-বিষয়ে রামচন্দ্রের অনুরাগ বর্ত্তমানে উপস্থিত না থাকিলেও, নাট্য-নিপুণ অভিনেতার অভিনয়-নৈপুণ্যে মনে হয় যেন সেই অভিনেতাই রামচন্দ্র এবং সে যেন সীতার অনুরাগে অনুরাগময় হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ভ্রমাত্মক বোধের দ্বারা সহৃদয় দর্শকগণের চিত্তে যে চমৎকার জন্মে তাহাই রসরূপে আস্বাদিত হয়। ঝাল্‌কিকর, ভট্টলোল্লটের মত এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভরতের টীকায় ভট্টলোল্লটের যে মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, ভরতের সূত্রে যে "বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ" আছে, সেখানে অনুভাব শব্দের দ্বারা ব্যভিচারি ভাব বুঝাইয়াছে—ইহাই তিনি বলিতে চান। কারণ ভট্টলোল্লট

বলেন যে বিভাব ও ব্যভিচারিভাব মিলিয়া রস উৎপন্ন করিতে পারে, কিন্তু অনুভাব রসের কারণ হইতে পারে না। কাযেই তাঁহার মতে ভরতের স্থত্রের তাৎপর্য্য এই যে, স্থায়িভাবের সহিত বিভাব ও ব্যভিচারিভাব যুক্ত হইলে রস উৎপন্ন হয়। যদিও ব্যভিচারিভাবগুলি স্থায়িভাবের সহিত সর্ব্বদা যুক্ত থাকে না তথাপি সুপক্ক ব্যঞ্জনাদিতে যেমন একই মূল আস্বাদ থাকে ও অন্যান্য নানাপ্রকারের আস্বাদ তাহার সহিত জড়িত হইয়া থাকে, তেমনি স্থায়িরূপে যে মূলরসই থাকুক তাহার সহিত ব্যভিচারিভাব যুক্ত হইয়া তাহাকে নানা আস্বাদে শবলিত করিয়া তোলে। অতএব আমাদের অন্তরের স্থায়ী রসও বিভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা পুষ্ট হইয়া রসরূপে শক্তি প্রকাশ করে। রামের মধ্যে ও রামের ভূমিকায় অভিনেতার মধ্যে রামের অনুকরণের দ্বারা রস উৎপন্ন হয়; দর্শক অভিনেতাকে রাম বলিয়া মনে করে এবং সেই জন্য তাহারও মনে রস উৎপন্ন হয়। অভিনবগুপ্ত বলেন যে, প্রাচীনেরা ভরতের স্থত্রের অর্থ এইভাবেই বুঝিতেন। দণ্ডীও কাব্যাদর্শে "রতিঃ শৃঙ্গারতাং গতা রূপবাহুল্যযোগেন" অর্থাৎ রূপ-বাহুল্য-যোগে বা বিভাব-ব্যভিচারী আদির যোগে রতিরূপ স্থায়ী ভাব শৃঙ্গার-রস-পদবী আরোহণ করে। এই মতে নাট্যের দ্বারা অভিনেয় নায়কে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রস উৎপন্ন হয়। এবং নর্ত্তক অভিনয়ের দ্বারা আপনাতে তাহার অনুকরণ করে। কাব্য-পাঠকালে কাব্যের পাঠকও রামাদিগত রস আপনাতে আরোপ করিয়া তাহা উপভোগ করে। মম্মটভট্ট তাঁহার কাব্য প্রকাশে ভট্টলোল্লটের মত বলিয়া যে পংক্তিটা তুলিয়াছেন, তাহা অভিনবগুপ্তের অভিনব-ভারতীতে উদ্ধৃত ভট্টলোল্লটের পংক্তি হইতে বিভিন্ন। মম্মটের পংক্তি এইরূপ—"বিভাবৈর্ললনোদ্যানাদিভি রালম্বনোদ্দীপনকারণৈঃ রত্যাদিকো ভাবো জনিতঃ অনুভাবৈঃ কটাক্ষ

ভুজাক্ষেপ-প্রভৃতিভিঃ কার্য্যৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ ব্যভিচারিভির্নির্ব্বেদাদিভিঃ সহকারিভিরুপচিতো মুখ্যয়া বৃত্ত্যা রামাদাবনুকার্য্যে তদ্রূপতানুসন্ধানাৎ নর্ত্তকেঽপি প্রতীয়মানো রসঃ ইতি ভট্টলোল্লট প্রভৃতয়ঃ”। এই বাক্যে দেখা যায় যে আলম্বন-উদ্দীপন-বিভাব-রূপ কারণের দ্বারায় রত্যাদি স্থায়ী ভাব উৎপন্ন হয় এবং অনুভাবের দ্বারা তাহা প্রতীতিযোগ্য হয় অর্থাৎ প্রকাশিত হয় এবং ব্যভিচারিভাবের দ্বারা তাহা পুষ্ট হয় এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহা অভিনেয় রামাদিতে থাকে এবং রামত্বাভিমানের দ্বারা বা রামত্ব-আরোপের দ্বারা তাহা নর্ত্তকে কিংবা কাব্যপাঠকে তাহা সহৃদয় ব্যক্তি কর্তৃক আরোপিত হইয়া রস-পদ-বাচ্য হইয়া থাকে। কিন্তু অভিনব-ভারতী হইতে ভট্টলোল্লটের যে পংক্তি আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে তিনি অনুভাবকে ব্যভিচারী বলিয়া ধরিয়াছেন—“অনুভাবাশ্চ ন রসজন্যা অত্র বিবক্ষিতাঃ তেষাং রসকারণত্বেন গণনানর্হত্বাৎ অপি তু ভাবানামেব। যেঽনুভাবা ব্যভিচারিণশ্চ চিত্তবৃত্ত্যাত্মকত্বাৎ যদ্যপি ন সহভাবিনঃ স্থায়িনা, তথাপি বাসনাত্মতেহ তস্য বিবক্ষিতা। দৃষ্টান্তেঽপি ব্যঞ্জনাদিমধ্যে কস্যচিৎ বাসনাত্মতা স্থায়িবদ্ অন্যস্য উদ্ভূতত। ব্যভিচারিবৎ।” উপরি উক্ত পংক্তি হইতে মনে হয় যে বিভাবের সহিত স্থায়ী ভাবের যোগে রস উৎপন্ন হয়। অনুভাব রসোৎপত্তির প্রতি কারণ নহে। ব্যভিচারী ভাবই রসোৎপত্তির কারণ হইতে পারে। এই ব্যভিচারী ভাব স্থায়ী ভাবের সহিত মিলিত হইয়া ব্যঞ্জনাদির ন্যায় তাহার স্বাদ-শবলতা উৎপন্ন করে। অনুভাব শব্দে মনে হয় যেন ভরত ভাব অর্থ করিয়া ব্যভিচারী শব্দটিকে তাহার বিশেষণবৎ ব্যবহার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত অনুভাব (অর্থাৎ ভাব) ব্যভিচারী বা চঞ্চল, তাহা চিত্তবৃত্ত্যাত্মক হইলেও সর্ব্বদা স্থায়ী ভাবের সহিত যুগপৎ

একত্র থাকে না। কিন্তু তথাপি স্থায়ী ভাবটি বাসনারূপে তাহার চিত্তের মধ্যে থাকে বলিয়া সেই স্থায়ী ভাবের সহিত ব্যভিচারী ভাবের সংযোগ সম্ভব। মম্মট যে ভট্টলোল্লটের পংক্তিটি কোথা হইতে পাইলেন তাহা বলা কঠিন। তাঁহার উদ্ধৃত পংক্তির সহিত অভিনব ভারতীতে উদ্ধৃত পংক্তির প্রভেদ অতি সুস্পষ্ট।

অভিনবগুপ্ত বলেন যে নাট্যাভিনয়-স্থলে নট যে রামাদি অভিনেয় নায়কের ভাব অনুকরণ করেন এবং দর্শকেরা যে আবার তাহার ভাব নিজেদের মধ্যে অনুকরণ করেন ইহা অসম্ভব। একজনের ভাব অনুকরণ করিলে তাহাতে হাসিই পায়। সেই জন্য ভরত বলিয়াছেন, "পরচেষ্টানুকরণাৎ হাসঃ সমুপজায়তে।" যাহা করা অসম্ভব তাহারই লোকে অনুকরণ করে, কারণ অনুকরণ শব্দের অর্থ সদৃশকরণ। আলম্বন বা উদ্দীপন বিভাবের অনুকরণ সম্ভব নহে। শোক, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির অনুকরণও সম্ভব নহে, কারণ চিত্তবৃত্তিকে অনুকরণ করা যায় না, শোকের সদৃশ এমন কোনও কিছু নাই, যাহাকে শোকের অনুকরণ বলা যাইতে পারে। অনুকরণ করিতে হইলে কেবল মাত্র বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করা যাইতে পারে; সে অনুকরণও সমান জাতীয়। রাম ঠিক কি ভাবে শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের কাহারও জানা নাই, তবে সাধারণতঃ শোকে লোকে যে রকম অঙ্গভঙ্গী করে, তৎসমানজাতীয় অঙ্গভঙ্গী করা যাইতে পারে। সমান-জাতীয় অঙ্গভঙ্গী করাকে অনুকরণ বলা যায় না।

অভিনবগুপ্ত বলেন যে নাট্যস্থলে নট প্রথমতঃই মনে এইরূপ করে যে আজ সর্ব্বসাধারণের আনন্দদায়ী আমি কিছু করিব। সে এমন কথা মনে করে না যে আজ আমি রাম হইয়া যাইব। গীত-বাদ্যাদির সন্নিবেশে রঙ্গমণ্ডপে নানাবিধ বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া যখন

সে প্রবেশ করে তখন তাহার মনে অন্ততঃ তাৎকালিক ভাবে তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব সে বিস্মৃত হয় (উচিতগীতাতোদ্যচর্বণাবিস্মৃত-সাংসারিকভাবতয়া)। তাহার মন তখন বিমল দর্পণের ন্যায় হইয়া যায় এবং অন্যান্য পাত্র পাত্রীর অভিনয় অবলোকন করিয়া তজ্জাতীয় হর্ষ-শোকাদি তাহার চিত্তে প্রতিফলিত হইতে পারে। এবং সেই সময়ের জন্য সে সেই সেই দেশকালাদি বিস্মৃতপ্রায় হয় এবং নিজেকে যখন রাম বা রাবণ বলিয়া মনে করে, তখন সেই মনোভাবটাকে সত্য-মিথ্যা বা সন্দিগ্ধ ইহার কিছুই বলা যায় না। বাস্তব জগৎটি সরিয়া গিয়া একটী আরোপিত জগৎ তাহার মধ্যে প্রতিভাত হয়। বাস্তব জগতের সহিত সম্বন্ধেই জ্ঞানকে সত্য, মিথ্যা বা সন্দিগ্ধ বলা যায়। কিন্তু বাস্তবজগৎ যেখানে খসিয়া গিয়াছে এবং মনের দর্পণে বিনা প্রযত্নে যখন আর একটী জগৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে তখন তাদৃশ উপলব্ধিকে সত্য, মিথ্যা বা সন্দিগ্ধ এইরূপ কোন আখ্যাই দেওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তাদৃশ রাবণাদিসংস্কারের অনুরূপ গীতবাদ্য প্রভৃতির অনুভব-জনিত সংস্কার যুক্ত হওয়াতে তাহার অভিনেয় রাম-রাবণাদিরূপ সংস্কার দৃঢ় হইয়া উঠে এবং সেই সংস্কারের সহিত আপনাকে অভিন্ন রূপে দেখিয়া নর্ত্তক যেমন অভিনয় করে সহৃদয় দর্শকও তেমনি তৎ তৎ দেশকালাদি বিস্মৃত হইয়া একটী অনুপম রসাস্বাদের মধ্যে এমন করিয়া ডুবিয়া যায় যে আপন ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া নাটকীয় অভিনীত বস্তুর সহিত আপনাকে উপলব্ধি করিয়া অনায়াসে নাটকীয় রসের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়।

অভিনবগুপ্তের উপাধ্যায় কাব্যকৌতুক গ্রন্থে নাট্য কাহাকে বলে তাহা বলিতে গিয়া তাহাকে অনুব্যবসায়বিশেষের অর্থাৎ একটি বিশেষ জাতীয় experience এর বিষয়ীভূত বস্তু বা content বলিয়া

বর্ণনা করিয়াছেন এই অনুব্যবসায় কি জাতীয় তাহা আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে রঙ্গমণ্ডপে নানারূপ বেশভূষা দ্বারা সজ্জিত নটকে দেখিয়া বিশিষ্ট-দেশ-কালবর্ত্তী কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি এইরূপ প্রত্যক্ষাভিমান নিবৃত্ত হয়, কারণ অভিনয়-প্রবৃত্ত নটকে তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্বের মধ্য দিয়া পাওয়া যায় না এবং এই জন্য ব্যক্তিগত বিশেষ ভাবে তাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। যে রাম নামে পরিচিত, সে যে রাম হইতে পারে না, ইহা স্ফুটতঃ চিত্তে উদয় হয় না, এইজন্য তাহাকে দেখিবার সময় রাম বলিয়াও বোধ হয় না, কোনো জ্ঞাতনামা ব্যক্তি বলিয়াও চেনা যায় না। তাহাকে দেখিয়া যে অনুব্যবসায় বা experience হয়, তাহার সহিত মনোহর গীতবাদ্যাদি অনুস্যূত হইয়া হৃদয়ের মধ্যে যে চমৎকারিতার উদয় হয়, তাহাতে অনুব্যবসায়টি একদিকে যেমন হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, অপরদিকে তেমনি দৃশ্যমান অভিনয়ের ফলে নটের অভিনয় দেখিতেছি অনুব্যবসায়ের এই জাতীয় অংশটি আচ্ছাদিত হইয়া যায়। পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ-অনুমানাদির ফল-স্বরূপ নানাবিধ সংস্কার আহৃত হইয়াছে, তাহা নটপ্রযুক্ত অভিনয়াদির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বতন সংস্কারের সহিত বর্ত্তমান সংস্কারের একটী পরিচয় ঘটে। তাহার ফলে উভয়ের যে তন্ময়ীভাব ঘটে তজ্জন্য যে আর একটী অনুব্যবসায় বা experience ঘটে, তাহাতে সুখদুঃখাদি নানাপ্রকার চিত্তবৃত্তির সহিত একটা আনন্দময় প্রকাশ চর্ব্বিত হইয়া ওঠে। ইহাকেই রসাস্বাদন-চমৎকার-চর্ব্বণা বলা যায়। এই জাতীয় experience বা অনুব্যবসায়ে যে বস্তু বা content প্রকাশিত হয়—তাহাকেই নাট্য বলা যায়। তাহা জ্ঞানাকারমাত্রে আরোপিত একটী সামান্য বা universalএর আবির্ভাব ছাড়া আর কিছুই নহে। কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে সেই জ্ঞানের ও তাহার

বিষয়-বস্তুর সেই সময়ে একটী নূতন নির্ম্মাণ বা creation হইল। অথবা অন্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বা তাহার বিষয়বস্তু হইতে বিলক্ষণ একটী স্বতন্ত্র আবির্ভাব বলিয়া ইহাকে বর্ণনা করা যাইতে পারে কিন্তু ইহাকে কোনো রকমেই অনুকরণ বলা যায় না।

এই ব্যাখ্যা হইতে মনে হয় যে, ভট্টতৌত মনে করিতেন যে, অভিনয় দেখার সময় রঙ্গালয়, সাজসজ্জা, গীতবাদ্য, অভিনেয়-বস্তু-সংক্রান্ত কথোপকথনাদি-শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা দর্শকের চিত্ত এমন করিয়া অনুরঞ্জিত হয় যে তাহাতে আমাদের জানা লোক এইরূপ সাজসজ্জা পরিয়া অভিনয় করিতেছে, এতাদৃশ ভাবটি অপসৃত হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়শীল নট যে রাম হইতে পারে না এই বিষয়ে মন উদাসীন হয়। অর্থাৎ মন দুই দিক্ হইতে বিশ্লিষ্টবন্ধন হয়। সে তাৎকালিক পরিচিত ব্যক্তির সহিত নটকে যে রকম এক করিয়া দেখে না, তেমনি অভিনেয় চরিত্রের সহিত নটের যে অভিন্নতা অসম্ভব তাহাও দেখে না। দুই দিক দিয়া বহিরঙ্গ বস্তুর সহিত মনের সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়াতে, গীতবাদ্য অভিনয়াদির দ্বারা যে সমগ্র বস্তুটি উপস্থাপিত হয়, তাহা চিত্তকে অন্য-নিরপেক্ষভাবে অনায়াসে অনুরঞ্জিত করিতে পারে। এদিকে দর্শক পূর্ব্বে যে সমস্ত জিনিষ দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন বা যে সমস্ত রস অনুভব করিয়াছেন, তাহাও সংস্কাররূপে তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থলে আসিয়া অভিনয়ের দ্বারা উপস্থাপিত চিত্তানুরঞ্জনের সহিত মনের অজ্ঞাতে আপন পরিচয় সাধন করিয়া সংস্কারাত্মক ভাবের সহিত অনুরঞ্জিত ভাবের সংবাদ বা সাদৃশ্য (correspondence) বা অনুরূপতার পরিচয় দেয়। তাহার ফলে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যে আনন্দ-সন্দোহ নির্ঝরিত হয়, তাহার সহিত একীভূতরূপে অভিনয় দ্বারা উপস্থাপিত

চিত্তানুরঞ্জন প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশের যাহা বিষয়ীভূত তাহাই নাট্যের aesthetic content।

মম্মট ভট্টলোল্লটের মত খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, রসোৎপত্তি বিভাবাদি কারণের দ্বারা নির্ম্মিত কার্য্য হইতে পারে না। কারণ বিভাবাদিকে কারণ বলিতে হইলে নিমিত্ত-কারণই বলিতে হয়। কিন্তু আমরা জানি যে নিমিত্ত-কারণ ধ্বংস হইলেও কার্য্য ধ্বংস হয় না। অথচ বিভাব-অনুভাবাদি না থাকিলে রস থাকে না। এই জন্য বিভাবাদিকে রসের নিমিত্ত-কারণ বলা যায় না। বিভাবাদিকে রসের জ্ঞাপক কারণও বলা যায় না। কারণ জ্ঞাপক কারণ তখনই সম্ভব, যখন বস্তুটি পূর্ব্ব হইতে উপস্থিত থাকে। কিন্তু রসবস্তু পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত থাকে না—বিভাবাদির দ্বারা ব্যঞ্জিত হইলেই তাহা আস্বাদনযোগ্য হয়। আস্বাদন ছাড়া রসের দ্বিতীয় সত্তা নাই। ইহা ছাড়া ভট্টলোল্লটের মতের আর একটি দোষ এই যে, নটের যদি রস উৎপন্নও হয়, তবে তাহা দর্শকের মধ্যে কি প্রকারে সংক্রমিত হইতে পারে, তাহার কোন সমুচিত ব্যাখ্যা তাঁহার লেখা হইতে পাওয়া যায় না। রামগত বিভাবাদি কেমন করিয়া নটগত হইয়া রসসৃষ্টি করিতে পারে, তাহারও কোন সমুচিত ব্যাখ্যা তিনি দেন নাই। অনুকরণের দ্বারা যে তাহা সম্ভব নয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শ্রীশঙ্কুক বলেন যে, ভরতের সূত্রে এইমাত্র লেখা আছে যে, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব প্রভৃতির সংযোগে রস-নিষ্পত্তি হয়। এই কথাই মাত্র বলা আছে, কিন্তু বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীর আর কাহারও সহিত সংযোগ হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ ভট্টলোল্লট যে বিভাবাদির সহিত স্থায়িভাবের সংযোগ হয় বলিয়াছেন,

তাহা সম্ভব নয়। কারণ স্থায়ী ভাব পূর্ব্ব হইতে উপস্থিত না থাকিলে বিভাবাদির সহিত তাহার যোগ হইতে পারে না। আর স্থায়ী ভাবই যদি পূর্ব্ব হইতে থাকে তবে তাহার উৎপত্তির লক্ষণ দেওয়া নিরর্থক হয়। বিভাবাদির উপস্থিতির পূর্ব্বে স্থায়ী ভাবের সূচনা করা যাইতে পারে এমন সম্ভাবনাও কিছু দেখা যায় না। পুনশ্চ এক একটি স্থায়ী ভাবের সহিত বহুসংখ্যক ব্যভিচারী ভাব অন্বিত থাকে এবং তাহাদেরও বহুবিধ প্রকারভেদ ও পরস্পরের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। এ অবস্থায় সে সমস্তগুলিই মানিয়া লইলে আর রসোৎপত্তিসম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকে না। এইজন শ্রীশঙ্কুক ভট্টলোল্লটের মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে বিভাবাদি হেতু দ্বারা ও তাহার কার্য্যভূত অনুভবের দ্বারা ও তাহাদের সহচরভূত ব্যভিচারি-ভাবের দ্বারা অনায়াসে অনুমান করা যায় যে, অভিনেতা নটের মধ্যে যে ভাবের অনুমান করা যায়, তাহারই অনুভবের ফলে দর্শকের চিত্তে অপূর্ব্ব-চমৎকার-স্বরূপ রসাস্বাদন ঘটিতে পারে। ইহা সত্য যে ব্যভি-চারী ভাবগুলি অভিনেতার চিত্তবৃত্তির ধর্ম্ম এবং সেইজন্য দর্শক তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। কিন্তু নটগত অঙ্গবিক্ষেপাদি অনুভবের দ্বারা দর্শক তাহার পূর্ব্বানুভূত নানাবিধ ব্যাভিচারিভাবসমূহগুলি আপন চেষ্টায় মনের মধ্যে আনয়ন করিতে পারেন। কিন্তু স্থায়ি-ভাবটিকে মনের মধ্যে এইরূপভাবে আহরণ করা সম্ভব নয়। স্থায়ি-ভাবের অনুকরণেই রসের উৎপত্তি। এইজন্য স্থায়িভাব এবং রস উভয়ে একদিকে যেমন অভিন্ন, অপর দিকে তেমনি স্থায়িভাব রসের কারণ। অনুকরণবস্তুটি মিথ্যা, কিন্তু মিথ্যা হইলেও তাহার যে নানা কার্য্যের উপযোগিতা নাই তাহা বলা যায় না। রজ্জুকে মিথ্যাসর্পবোধ হইলেও সেই মিথ্যাসর্পের ভয়ে লোক যে শুধু পলায় তাহা নহে, ভয়ে

মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব মিথ্যা বস্তুরও অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে। ভট্টলোল্লট আরো বলেন যে একটী ঘোড়ার ছবি দেখিলে সেটিকে ঘোড়া বলিয়া মনে হয়। অথচ তাহাকে সত্যি ঘোড়াও বলা যায় না। ঘোড়া দেখাটা যে ভুল তাহাও বলা যায় না। ঘোড়া বলিয়াও মনে হয়, ঘোড়া নয় বলিয়াও মনে হয়। বিরুদ্ধ-জাতীয় ভাব থাকিলেও অর্থাৎ ঘোড়াও বটে, ঘোড়া নয়ও বটে—এইজাতীয় বিরুদ্ধ ভাব মিশ্রিত হইয়া থাকিলেও একটী ভাব অপরটিকে খণ্ডন করে না। অথচ যুক্তির দ্বারাও ইহার স্বরূপ বোঝা যায় না। নাটকীয় রস-প্রতীতির স্থলেও নটকে রাম বলিয়াও মনে হয় না। রাম হইতেও পারে, নাও হইতে পারে—তাহাও মনে হয় না। রামের সদৃশ তাহাও মনে হয় না। এইরূপ সম্যক্ মিথ্যা ও সাদৃশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটা বোধ উপস্থিত হয়। তাদৃশ বোধের দ্বারাই নটগত অভিনয় হইতে দর্শকের মনে রসবোধ উৎপন্ন হয়। কাব্যার্থের অনুসন্ধান বলে শিক্ষা ও অভিনয়-চাতুর্য্যের দ্বারা নট যে বিভাবাদিরূপ কারণবস্তু ও অনুভাবাদিরূপ কার্য্যবস্তু ও নিজের পূর্ব্বানুভূত ভাবগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে আহৃত হইলেও কৃত্রিমরূপে অগৃহীত ব্যভিচারী ভাবগুলির দ্বারা স্থায়ী ভাবরূপ রসকে গ্রহণ করে, তাহাই অনুমানের দ্বারা আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। অথচ এই অনুমান অন্যবিধ অনুমান অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেইজন্য এতাদৃশ অনুমানে রসাস্বাদের কোন বিঘ্ন হয় না। বস্তুতঃ নটের যদ্যপি রামগত বিভাবানুভাব-ব্যভিচারাদি কিছুই নাই, তথাপি রামগত বিভাবাদির এমন সুন্দর অনুকরণ তাহার মধ্যে থাকে যে, তাহা দেখিয়া সেই নটের মধ্যে যে স্থায়িভাবরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছে—তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি এবং এইরূপ বারংবার অনুমান করার ফলে দর্শকদিগের চিত্তের মধ্যে বাসনার সংস্কাররূপে পূর্ব্বানুভূত

ভাবসমূহ এমন ভাবে জাগ্রত হইয়া ওঠে যে, তাহার ফলে অনুমিত বস্তুটিও রসরূপে আস্বাদিত হইতে পারে। কাব্যপ্রকাশের বিবরণ-টীকায় এই মতটি এইভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন দেশে ধূম আছে মনে করিয়া যেমন লোকে বহ্নি অনুমান করিতে পারে, তেমনি করিয়া সুনিপুণ নট যখন অনুকরণাত্মক অভিনয়ের দ্বারা রামগত বিভাবাদিকে স্বকীয় বিভাবাদিরূপে প্রকাশ করিতে পারে, তখন দর্শকেরা তাদৃশ বিভাবাদির সহিত নিয়ত-সম্বদ্ধ রত্যাদি ভাব অনুমান করেন। তাদৃশ অনুমানের মনোহারিত্ব ও সৌন্দর্য্যের দ্বারা তাহা দর্শকদিগের স্বাদগৌরবতা প্রাপ্ত হইয়া রসরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভরতসূত্র-লিখিত রস-নিষ্পত্তি শব্দের অর্থ স্থায়িভাবের অনুমান।

অভিনবভারতী টীকাতে কিন্তু শ্রীশঙ্কুকের কথা অন্য ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেখানে অভিনব তাঁহার উপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে শ্রীশঙ্কুক রসকে অনুকরণরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কাহার পক্ষে এই অনুকরণ, দর্শকেরা কি অনুকরণ করেন না নটেরা অনুকরণ করে কিংবা সমস্ত বিষয়টির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এই অনুকরণরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে হয়? যাহা প্রমাণের দ্বারা পাওয়া যায় তাহারি অনুকরণ সম্ভব। কেহ এক গ্লাস দুধ পান করিতে করিতে বলিতে পারে যে অমুক ব্যক্তি এই প্রকারে সুরা পান করে। নটেতে এমন কি পাওয়া যায় যাহা অন্যত্র অনুকৃত হইতে পারে? তাহার মাথা নড়ে, গদ্‌গদভাবে সে বাক্য বলে, হস্তপদাদির বিক্ষেপ, কটাক্ষ করে। কিন্তু এই গুলিকে শৃঙ্গাররসাত্মক বহির্বৃত্তির অনুকরণ বলা যায় না, কারণ রতি, উৎসাহ বা ক্রোধ এক একটি চিত্তবৃত্তি। বাহ্যিক অবয়বাদির সঞ্চালনের দ্বারা চিত্তবৃত্তির অনুকরণ সম্ভব নহে।

রামের চিত্তবৃত্তির রতি-ভাব বা উৎসাহ-ভাব কেহ পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করে নাই যে তাহার কেহ অনুকরণ করিতে পারে। এইজন্য নট রামের চিত্তবৃত্তির অনুকরণ করে একথাও বলা সম্ভব নহে। ইহাও বলা যায় না যে নট-গত চিত্তবৃত্তি যখন আমাদের মধ্যে প্রতিভাত তখন তাহাকে রতি বলে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে কি প্রকারে এই রস-প্রতীতি জন্মে। সীতাদি বিভাবের দ্বারা, কটাক্ষাদি অনুভাবের দ্বারা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সহচারি-ভাবের দ্বারা নটের রত্যাকারক চিত্তবৃত্তি যদি সাধারণ-ভাবে অনুমানের দ্বারা জানা যায়, তবে তাহাকে রতির অনুকরণ বলা যায় না। এ কথা বলা যায় না যে রামের বেলা বিভাবাদি পারমার্থিকভাবে সত্য কিন্তু নটের বেলা তাহা অনুকরণ। তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে এই যে, দর্শকেরা কি নটের ঐ সমস্ত ভাব কৃত্রিম বলিয়া বোঝেন? যদি বোঝেন তবে দর্শকদের মধ্যে কোনও রত্যাদিভাব উদিত হইতে পারে না। এ কথা বলা যাইতে পারে না যে নট অনুকরণের দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করে দর্শকেরা তাহাই অনুমান-দ্বারা বুঝিয়া থাকেন। নটের মধ্যে যথার্থভাবে রত্যুৎসাহাদি ভাব না থাকিলেও, তাহার ব্যবহার দেখিয়া, আছে বলিয়া অনুমান করা অসম্ভব নহে। বাষ্প দেখিয়া যদি সেই বাষ্পকে ধূম বলিয়া ভ্রম হয়, তথাপি তাদৃশ মিথ্যাধূম হইতে লোকের মনে বহ্নির অনুমান উদিত হওয়া অসম্ভব নহে। ক্রুদ্ধ না হইলেও নটকে ক্রুদ্ধের ন্যায় দেখাইতে পারে। কিন্তু ক্রুদ্ধের ন্যায় দেখানর অর্থ হইতে পারে যে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি যেরূপ অঙ্গবিক্ষেপ করে নট তৎসদৃশ অঙ্গবিক্ষেপ করিতে পারে। কিন্তু দর্শকেরা যখন নটের রতিবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন, তখন তাঁহারা ত নটের রতিবৃত্তি হইয়াছে কেবল এইরূপ অনুমান করেন না, তাঁহাদের নিজেদের চিত্তও আনন্দাভিষিক্ত হয়, নটের চিত্তে রতিবৃত্তির

উদয় হইয়াছে এইরূপ অনুমানের ফলে আনন্দ-রসাস্বাদ হইতে পারে না। অভিনয় দেখিয়া দর্শকের চিত্তে যখন আনন্দাস্বাদ প্রকাশ পায় তখন তাদৃশ আনন্দময় অনুভূতিকে অনুকরণ বলা যায় না। যদি নটকে রাম বলিয়া মনে হয়, তবে পরবর্ত্তী কালে তাহার বিরুদ্ধজ্ঞান উৎপন্ন না হইলে নটের আমোদ প্রমোদে সত্যজ্ঞান হয় এবং বাধ বা বিরোধ হইলে সে জ্ঞান মিথ্যা হয়। আবার ইহাও বলা চলে না যে, কোনও একটি অভিনয়ের সময়ে যাহাকে রাম বলিয়া মনে করা হইয়াছিল চিরকাল তাহাকেই রাম বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য অভিনয়-স্থলে অন্যান্য নটপুরুষকেও রাম বলিয়া মনে হয়। অতএব নটপুরুষে যে রামাদি অভিনেয় পুরুষের বোধ হয় তাহা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ একটি সাধারণ বোধ মাত্র।

ইহাও বলা চলে না যে, রামায়ণাদি গ্রন্থ হইতে রামগত রতি-রসের বিভাবক ও তদালম্বনভূত সীতাগত নায়িকাবোধ নট অনুকরণের দ্বারা আহরণ করে, কোনও নটের মনে ইনি আমার সীতা এইরূপ বোধ হয় না। ইহাও বলা যায় না যে, নটের বোধ না হইলেও অনুকরণ-প্রবৃত্তি দ্বারা দর্শকের মনে তাদৃশ প্রতীতি উৎপন্ন হয়। কারণ তাহা হইলে বরং ইহাই বলা উচিত হয় যে, রামগত শৃঙ্গারাদি রসও দর্শক অনুকরণের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকে। কারণ রামগত তাদৃশ শৃঙ্গারাদি রস নটের উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা না বুঝিলে দর্শক নটকে রাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এইজন্যই দর্শকদিগের রসপ্রতীতি হয় বলিয়াই ইহা স্বীকার করা যায় না যে তাঁহারা শৃঙ্গারাদির অনুকরণ করিয়া রসবোধ করিয়া থাকেন—"তস্মাৎ সামা-জিকপ্রতীত্যনুসারেণ স্থায্যনুকরণম্ রস ইত্যসৎ"। নটেরও মনে এইরূপ হয় না যে সে রাম ও তাহার চিত্তবৃত্তি অনুকরণ করিতেছে।

কোনও ঘটনার অনুরূপ কার্য্য করাকে অনুকরণ কহে, নট রামকেও দেখে নাই, তাহার চিত্তবৃত্তিও প্রত্যক্ষ করে নাই। কাজেই তাহার পক্ষে রামকে বা তাহার চিত্তবৃত্তিকে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। ইহাও বলা যায় না যে নট রামকে বা তাহার শোককে অনুকরণ করে না কিন্তু কোনও মহাপুরুষের শোক হইলে তাহার যে রূপ হইতে পারিত সেইরূপ কোনও শোকের অনুকরণ করে। কারণ অশ্রু-জল-নিঃসারণ করা শোকের অনুকরণ নহে; কারণ শোক ও অশ্রুজল বিভিন্ন-জাতীয়। ইহাও বলা যায় না যে রামাদির ন্যায় উচ্চ-চরিত্রের ব্যক্তির শোক হইলে তাঁহাদের যেরূপ অশ্রুপাত বা অঙ্গাদিসঞ্চালন হয়, নট তাহারই অনুকরণ করে; কারণ এখানে প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, কোন্ মহাপুরুষের অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি নট অনুকরণ করে? তাহা যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির না হয়, তবে কাহার অঙ্গভঙ্গী যে অনুকরণ করিবে তাহা সে মনে কি প্রকারে কল্পনা করিবে? যদি বলা যায় যে, শোক হইলে এইরূপ যে কাঁদে তাহারই অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি নট অনুকরণ করিতেছে, তাহা হইলে ইহাও বলা চলে যে নট নিজেরই শোকানুরূপ অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করিতেছে। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে অনুকরণের দ্বারা রস-প্রতীতি হয় একথা বলা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

পুনশ্চ নট একদিকে যেমন তাহার নিজের পূর্ব্বানুভূত আলম্বন উদ্দীপনাদি বিভাব স্মরণ করিতে পারে তেমনি স্বকীয় শিক্ষাবলে তাহাকে আপন ব্যক্তিগত ভাবে মনের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া সাধারণ ভাবে তাহা মনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া ও তাহার সহিত মিলাইয়া বাহ্য অঙ্গভঙ্গ্যাদি প্রকাশ করে, এবং যথাযথ ভাবে কাব্যোক্ত শব্দাদি উচ্চারণ করিয়া আপনার মধ্যে যতটুকু প্রকাশ করে সেইটুকুই নর্ত্তকের কার্য্য এবং সেইটুকুই নটের প্রতীতি। কিন্তু সে যে অনুকরণ

করে, এ কথা কোন রূপেই বলা যায় না। অভিনয়ে পুরুষের বেশ-ভূষাদিরই অনুকরণ চলে; কিন্তু তাহার চিত্তবৃত্তি এবং তাহার শরীর-বিকারের অনুকরণ চলে না। এ কথাও বলা চলে না—নাটকীয় ঘটনার অনুকরণের দ্বারা নট অভিনয় করে বা দর্শক রস উপভোগ করেন; কারণ নাটকীয় ঘটনা কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই। কাব্যের মধ্য দিয়া আমরা যাহা জানি তাহা বস্তুতঃ নাটকীয় ঘটনা নহে। ভরতের সূত্রেও কোনও অনুকরণাদি বা অনুমানাদির উল্লেখ নাই।

শ্রীশঙ্কুক যে বলেন যে, যে প্রণালীতে চিত্রিত অশ্বে অশ্ববোধ হয়, সেই প্রণালীতেই নাটকীয় অভিনয় হইতে দর্শকের চিত্তে রসানুভূতি হয় তাহাও ঠিক নহে। বর্ণদ্বারা যে অশ্ব অভিব্যক্ত হয়, আলোক দ্বারা অভিব্যক্ত যথার্থ অশ্ব হইতে তাহা পৃথক্। কেবল মাত্র ইহাই বলা যাইতে পারে যে, যথার্থ অশ্বের অবয়বসন্নিবেশের সহিত চিত্রিত অশ্বের রেখাদি দ্বারা প্রকাশিত অবয়বের সাদৃশ্য আছে। সেই জন্য চিত্রিত অশ্বকে যথার্থ অশ্বের সদৃশ বলা হয়। কিন্তু বিভাব অনুভাব প্রভৃতির সমাবেশে যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহা রস-সদৃশ ইহাও বলা যায় না। এই জন্যই শ্রীশঙ্কুক বলিয়াছেন যে অনুকরণের দ্বারা রসবোধ হয় তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ আবার বলেন যে নাটকীয় ঘটনা একটি বাহ্য ব্যাপার। তাহার মধ্যে সুখ-দুঃখাদি উৎপাদনের একটি স্বাভাবিক শক্তি আছে। বহিঃস্থিত ঘটনাসামগ্রীর মধ্যে যাহা আলম্বন-উদ্দীপন-স্থানীয় তাহাই অনুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাবের উত্তেজক। কিন্তু স্থায়ী রসটি সেই সমস্ত বিষয়সামগ্রীর দ্বারা যুগপৎ উৎপন্ন হয় এবং অন্তরে সুখ-দুঃখাদি রূপে অনুভূত হয়। ইঁহারাও ভরতসূত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই। কারণ স্থায়ী ভাব ও রস এক বস্তু নহে। বাহ্য একটী

বাস্তব ঘটনায় যে সুখদুঃখাদি উৎপন্ন হয়, তাহা নাটকীয় বা কাব্যরস নহে।

ভট্টনায়ক বলেন যে, রস প্রতীতও হয় না, উৎপন্নও হয় না, অভিব্যক্তও হয় না। নট বা দর্শকের চিত্তে নাটকীয় ব্যাপার যদি নিজের বলিয়া মনে হইত, তাহা হইলে করুণ রসের সময় তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইত; কিন্তু তাহা হয় না। সীতা প্রভৃতির আলোচনায় কাহারও নিজের প্রণয়িনী স্ত্রীর কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক নহে। কাহারও নিজের জীবনে সমুদ্রলঙ্ঘনাদি ব্যাপার কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। রামের কি রকম ভাব হইয়াছিল তাহাও কাহারও স্মরণ হওয়া সম্ভব নয়; কারণ কেহ কোনও দিন রামকে দেখে নাই। আর শব্দ ও অনুকরণাদি দ্বারা যাহা অনুভূত হয় তাহাকে রস বলা যায় না। কারণ রস কেবল মাত্র প্রত্যক্ষই হইতে পারে। ইহাও বলা যায় না যে, রাম-চরিত্রে অভিনয়ের সময় নিজেকেই নায়ক বলিয়া দর্শক বা নট মনে করে। কারণ, সীতার ন্যায় পবিত্রা নারীর সম্বন্ধে যদি দুইটি নায়কের সম্ভাবনা ঘটে, তাহাতে চিত্তে জুগুপ্সাই ঘটে, রস হয় না। অনুভব বা স্মৃতি ছাড়া অন্য উপায়ে রসপ্রতীতি ঘটিতে পারে না। রসপ্রতীতি যে যে কারণে অসম্ভব, রসের উৎপত্তি হয় বলাও সেই সেই কারণেই অসম্ভব। রসের অভিব্যক্তি হয় ইহাও বলা যায় না; কারণ যাহা থাকে, তাহারই অভিব্যক্তি হয়। রস পূর্ব্বে ছিল না, বিভাবাদি দ্বারা প্রকাশ পাইল, এইরূপ বলা চলে না। এইজন্যই ভট্টনায়ক বলেন যে, কাব্যস্থলে দোষাভাব-প্রযুক্ত ও গুণালঙ্কারাদির সহযোগ-প্রযুক্ত এবং নাট্যে চতুর্ব্বিধ-অভিনয়-প্রযুক্ত ব্যক্তিগত বিভাবাদি সাধারণাকরে প্রতিভাত হয় এবং ভাবকত্বরূপ একটি স্বতন্ত্র ব্যাপারের দ্বারা বিভাবাদির যে

নূতন প্রকার সৃষ্টি বা প্রতিফলন হয়, সেই প্রতিফলনগত রস, অনুভব, স্মৃতি প্রভৃতি সাধারণ চিত্তবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। রসের ভোজকত্ব বা ভোগবৃত্তি দ্বারা সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশানন্দময় স্বকীয় স্বাভাবিক চিদ্‌বৃত্তি-বিলক্ষণ পরব্রহ্মাস্বাদসহোদর-রূপে অলৌকিকভাবে কাব্য-নাটকীয় রস আস্বাদিত হয়। এই মতে রসের প্রকাশ সাধারণ লৌকিক মনোবৃত্তি বা psychologyর অন্তর্ভুক্ত নহে। সেইজন্য রস প্রতীত হইতেছে, উৎপন্ন হইতেছে, বা অভিব্যক্ত হইতেছে এইরূপ কোনও বাক্য দ্বারাই রস প্রকাশের স্বরূপ বর্ণনা করা চলে না। রসের উপস্থাপনও কোন লৌকিক উপায়েও সঙ্ঘটিত হয় না। রসের অনুভবও কোন লৌকিক উপায়ে ঘটে না। তাই ভট্টনায়ক বলেন যে, রসের উপস্থাপন ও রসের প্রকাশ এই উভয়ের জন্যই দুইটী অলৌকিক স্বতন্ত্র বৃত্তি মানিতে হয়। একটীকে তিনি বলিয়াছেন ভাবকত্ব, অপরটীকে তিনি বলিয়াছেন ভোজকত্ব বা ভোগীকরণ।

অভিনবগুপ্ত তাঁহার অভিনবভারতীতে বলেন যে, রসের ভোগীকরণ বলিতে কি বুঝা যায়, তাহা ভট্টনায়কের কথায় স্পষ্ট হয় নাই। রতি, উৎসাহ প্রভৃতি রসের আস্বাদকেই রসের ভোগীকরণ বলা যাইতে পারে। যত প্রকারের রসাস্বাদ তাহার প্রণালীও তত প্রকার। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণের প্রকাশের দ্বারা যদিও রসাদির সম্ভোগ ঘটে, এই তিনটীর মিশ্রণপ্রণালী অসংখ্যরূপে ঘটিতে পারে। সেইজন্য রসভোগের প্রণালীও বহু। ভট্টনায়কের মতের তাৎপর্য্য এই যে, অভিধা শক্তির দ্বারা কাব্যের শব্দার্থের বোধ হইলে,শব্দার্থগত দোষাভাব,গুণ বা অলঙ্কারাদির দ্বারা এমন একটী নূতন ব্যাপার উদ্ভূত হয়, যাহার ফলে কাব্যগত বা নাট্যগত নায়ক-নায়িকাদি, তাহাদের মনোগত ভাব প্রভৃতি একটি অলৌকিক উপায়ে চিত্তের

মধ্যে উপস্থাপিত হয় অথচ সেই উপস্থিতিতে সেই নায়কাদির ব্যক্তিগত স্বভাব তিরোহিত হইলে রত্যাদি সাধারণ ভাবে তাহাদের একটি উপস্থিতি ঘটে। এই ভাবকত্ব ব্যাপার কোনও ordinary psychological state নহে, রসাদির উপস্থাপন করিবার জন্য এই জাতীয় একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি ভট্টনায়ক অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং এতদনুরূপ আন্তরিক বা subjective বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন যাহাকে তিনি ভোগীকরণ বা ভোজকত্ব এই আখ্যা দিয়াছেন। ভট্টনায়ক বলেন—

"অভিধা ভাবনা চান্যা তদ্‌ভোগীকৃতমেব চ।
অভিধা ধীমতাং যাতি শব্দার্থালঙ্কৃতী ততঃ॥
ভাবনাভাব্য এষোঽপি শৃঙ্গারাদিগণোহি যৎ।
তদ্ভোগীকৃতরূপেণ ব্যাপ্যতে সিদ্ধিমান্নরঃ॥"

অভিনবগুপ্ত বলেন যে, ভাবন শব্দের অর্থ যদি বিভাবাদির দ্বারা চর্ব্বণাত্মক রস-সম্ভোগ বোঝা যায় তবে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। অর্থাৎ কাব্যার্থ বা নাট্যার্থ যে পাঠক বা দর্শকের চিত্তে বিজ্ঞাপিত হইয়া রসরূপে অনুভূত হয়, ভাবনা বলিতে যদি শুধু এইটুকু বোঝা যায়, তবে তিনি তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন।

"সংবেদনাখ্যব্যঙ্গ্যপরসংবিত্তিগোচরঃ।
আস্বাদনাত্মানুভবো রসঃ কাব্যার্থ উচ্যতে॥"

এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত স্বকীয় মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, কাব্যাত্মক শব্দ হইতে কাব্যজ্ঞের চিত্তে কাব্যার্থাতিরিক্ত নূতন নূতন কিছু প্রতিভাত হয়। কাব্যের শব্দার্থবোধের পর এমন একটি মানস সাক্ষাৎকার ঘটে যাহার ফলে বর্ণিত বিষয়ের দেশ-কালাদি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া একটি সাধারণ

প্রতীতি জন্মে। শকুন্তলা-নাটকের রাজা দুষ্মন্ত যখন রথারূঢ় হইয়া শরবিদ্ধ করিবার জন্য হরিণকে অনুসরণ করেন এবং সেই হরিণ যখন মনোহর গ্রীবাভঙ্গীতে ধাবমান রথের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া 'এই শর পড়িল', এই ভয়ে পশ্চাতের পাদদ্বয় শরীরের অগ্রভাগের দিকে সঙ্কুচিত করিয়া ভয়োৎকম্পে উচ্ছ্বসিত ও ব্যাত্তানন হইয়া অর্দ্ধচর্ব্বিত শষ্পগুলি পথে ফেলিতে ফেলিতে ব্যোমমার্গে প্রায় উড়িয়া যাইবার মত লাফাইতে লাফাইতে প্রস্থান করে, তখন সেই শ্লোক পাঠ করিয়া পাঠকের চিত্তে তত্তদ্দেশকালাবচ্ছিন্ন সেই মৃগটি বা তাহার ভয়োৎপাদক রাজা বা কোন বিশেষজাতীয় বিশেষ ব্যক্তিগত ভয় উদিত হয় না। কোনও বিশেষ ব্যক্তিগত ভয় উৎপন্ন হইলে তাহার সহিত ব্যক্তিগত দুঃখোদ্বেগাদিরও উৎপত্তি হইত; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে উৎপন্ন না হইয়া কেবল মাত্র ভয়-সাধারণরূপে নির্ম্মল ভাব স্বরূপে উপস্থাপিত হওয়াতে তাহা অন্য ভাবের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া কলুষিত হয় না। এজন্য কাব্যার্থের অনুভূতি দ্বারা যে ভয়াদি ভাব উপস্থাপিত হয়, তাহা কোন দেশের, কালের বা ব্যক্তিবিশেষের সহিত জড়িত নহে। এই জন্যই তাদৃশ ভয়-ভাবের মধ্যে যে বিশুদ্ধ ভয়-ভাব উপস্থিত হয়, তাহা অন্য ব্যক্তিগত ভয়াদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সেই ভয়ভাবে আত্মা অভিষিক্ত হইলেও ব্যক্তিগত ভয়ভাবে যে সমস্ত অন্যপ্রকারের উদ্বেগ জড়িত থাকে—তাহাতে তাহা থাকে না। "তথাবিধে হি ভয়ে নাত্যন্তমাত্মা তিরস্কৃতো ন বিশেষত উল্লিখিতঃ"। বিভিন্ন ব্যক্তিগত ভাবের সহিত অসম্বদ্ধভাবে প্রতীত হয় বলিয়া এই উপস্থাপিত ভয়াদিভাব সঙ্কীর্ণ বা ক্ষুদ্র বলা যায় না। দূর হইতে যখন আমরা বহ্নির অনুমান করি, তখন সে ধূমও কোন বিশেষ ধূম নয়, সে বহ্নিও কোন বিশেষ বহ্নি নয়; কিন্তু ধূম-সাধারণ

হইতে বহ্নি-সাধারণের অনুমান করিয়া থাকি। ধূম-সাধারণের সহিতই বহ্নি-সাধারণের ব্যাপ্তি, কোনও বিশেষ ধূমের সহিত বহ্নির কোনও ব্যাপ্তি নাই। সেই রকম ভয়ব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী সাধারণ হইতে ভয় সাধারণের অনুভব উপস্থিত হয়। নট-শরীরের অঙ্গভঙ্গী হইতে তাদৃশ ভয়াদি ভাব দর্শকের চিত্তে যখন সাক্ষাৎকৃত স্ব স্বভাবে উপস্থাপিত হয়, তখন কাব্যলিখিত দেশকাল ও তদ্ধর্ম্মিত নায়কনায়িকাদি বিশেষ পরস্পর সম্বন্ধ বলিয়া এক যোগে ভয়াদি ভাব তাহার নির্ব্বিশেষ সাধারণ স্বভাবে উদ্ভাসিত হয়। বাস্তব জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে যে সম্বন্ধ পরস্পরের সহিত নিয়ত ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে, কতকগুলি সম্বন্ধ সরিয়া যাইতে হইলেই তাহার সমস্তগুলি সম্বন্ধ সরিয়া যাইতে হয়। এইজন্য বাস্তবজগতের দেশকাল ও নায়কাদি মন হইতে তিরোহিত হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্বন্ধের সকল বিশেষ স্বভাবই তিরোহিত হয় এবং তাহার ফলে চিত্তে উপস্থাপিত ভয়াদি ভাবের সাধারণতা জাগ্রত হইয়া উঠে। এইজন্যই কাব্যজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের মধ্যেই ভয়াদি যে সমস্ত ভাব কাব্যার্থ হইতে উপস্থিত হয়, তাহা এক জাতীয় সর্ব্বসাধারণ প্রতীতি। আমাদের সকলের চিত্তের মধ্যেই প্রসুপ্ত ভাবে অনাদি কাল হইতে নানাজাতীয় ভোগানুভূতি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণীকৃত ভয়াদি ভাব চিত্তের মধ্যে উপস্থাপিত হইলে অনাদিকাল-সঞ্চিত কোন না কোন ভোগবাসনার সহিত যে পরিচয় ঘটে তাহার ফলেই সেই সাধারণীকৃত ভয়াদি ভাব রসরূপে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। "অতএব সর্ব্বসামাজিকানামেকঘনতৈব প্রতিপত্তেঃ সুতরাং রসপরিপোষায় সর্ব্বেষামনাদিবাসনা-চিত্রীকৃতচেতসাং বাসনাসংবাদাৎ।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সাধারণীকরণ দুই প্রকারের; এক-দিকে কাব্য বা নাট্য-বর্ণিত বস্তু তাহার দেশকালাদিবিশেষ স্বভাব-

বর্জ্জিত হইয়া একটি সাধারণ স্বভাবে পাঠক বা দর্শকের চিত্তে উপস্থাপিত হয়; অপর দিকে এই সাধারণ স্বভাবটির স্বরূপ কাব্যজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের চিত্তেই একরূপেই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ বিভিন্ন কাব্যজ্ঞের চিত্তে এই সাধারণীকৃত স্বভাবটি বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায় না; কিন্তু কেবলমাত্র এই সাধারণীকৃত স্বভাবটি চিত্তে উদ্ভাসিত হইলে রসসম্ভোগ সম্ভব হয় না। প্রত্যেকের চিত্তের মধ্যেই অনাদিকাল সঞ্চিত নানাবিধ ভোগানুভূতি ও তজ্জন্য ভোগাকাঙ্ক্ষা, ভোগকুতুকতা সুপ্তপ্রায় ভাবে অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সাধারণীকৃত স্বভাবটি যখন চিত্তে উপস্থাপিত হয় তখন তাহার সহিত এই অর্দ্ধনিমগ্ন কোন না কোন বাসনার যে অন্তরের পরিচয় ঘটে, তাহার ফলে রসসম্ভোগ পরিপুষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। সাধারণীকৃতরূপের সর্ব্বহৃদয়ে একত্ব থাকিলেও বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্বুদ্ধ বাসনার বৈচিত্র্য-প্রযুক্ত পরিচয়ের বৈচিত্র্য সম্ভব হয়। সাধারণীকৃত ভয়াদি ভাবের সহিত হৃদয়স্থিত প্রসুপ্তপ্রায় বাসনার পরিচয়ে যে চেতনা উদ্বোধিত হয়, তাহার সহিত দেশকালাদি-সম্বলিত ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত সুখদুঃখাদি জড়িত থাকে না। এইজন্য সেই চেতনার উদ্বোধ বাধাবিহীন হয়। এই বাধাবিহীন চেতনোদ্বোধের নাম চমৎকার এবং তাহার দ্বারা উত্থাপিত কম্পপুলকাদি শারীর বিকারকেও চমৎকার বলা হয়।

চমৎকার শব্দ অনেক স্থলে এতৎসহচরিত অলৌকিক আহ্লাদকেও বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে চমৎকার শব্দের তিনটি অর্থ। একটি প্রসুপ্ত বাসনার সহিত সাধারণীকরণের মিলন বা পরিচয়জনিত একটি বিশিষ্ট চেতনোদ্বোধ বা aesthetic attitude of the mind। দ্বিতীয় অর্থ তজ্জনিত হ্লাদ। তৃতীয় অর্থ তজ্জনিত

শরীর পুলকাদি। আবার যে মানসিক বৃত্তি দ্বারা এই বিশেষ চিদ্‌গত ভাবকে ভোগ করা যায় তাহাকেও চমৎকার বলা হয়—"সা চ অবিঘ্না সংবিৎ চমৎকারঃ তজ্জোঽপি কম্পপুলকোল্লুকাদির্বিকারশ্চমৎকারঃ। তথাহি স চ অতৃপ্তিব্যতিরেকেণ অচ্ছিন্নভোগাবেশ ইত্যুচ্যতে। ভুঞ্জা-নস্য অদ্ভুতভোগাত্মস্পন্দাবিষ্টশ্চ মনঃ-করণম্ চমৎকার ইতি"।

এই চেতনোদ্বোধের মনোবৃত্তিরূপে বা psychologically কি স্বরূপ তাহার সম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত কিছু পরিষ্কার করিয়া বলিতে অনিচ্ছুক। তিনি বলেন যে ইহাকে সাক্ষাৎকার বলা যাইতে পারে, কি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বলা যাইতে পারে, কিংবা সঙ্কল্প বা স্মৃতি বলা যাইতে পারে, কিংবা স্ফূর্ত্তি মাত্র বলা যাইতে পারে, কিংবা প্রতিভা-মাত্র বলা যাইতে পারে—

স চ সাক্ষাৎকারস্বভাবো মনসাধ্যবসায়ো বা সঙ্কল্পো বা স্মৃতির্বা-তথাত্বেন স্ফুরন্নস্তু.................অপিতু প্রতিভানাপরপর্য্যায়সাক্ষাৎ কারস্বভাবেয়ম্।

অর্থাৎ ইহার সম্বন্ধে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে ইহা একটি স্ফূর্ত্তি বা প্রতিভা। ইহা কোন্ উপায়ে আসিল তাহা বুঝা যায় না—কিন্তু চিত্তের মধ্যে হঠাৎ ইহার প্রকাশ হইল এই ভাবে ইহাকে বুঝা যায়। ইহার স্বরূপ বলিতে গেলে দেশকালের সহিত জড়িত হইয়া ইহা প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাকে লৌকিকও বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না, অনির্ব্বাচ্যও বলা যায় না, লৌকিকতুল্যও বলা যায় না বা আরোপিত-লৌকিক-স্বভাবও বলা যায় না।

অভিনবগুপ্ত বলেন যে, সাধারণ লৌকিক প্রতীতিতে যে সমস্ত ভাব উদ্ভূত হয় তাহা নানাপ্রকার বিঘ্ন দ্বারা এমন ভাবে বিঘ্নিত হয় যে, তাহা দ্বারা এই সমস্ত ভাব স্বচ্ছন্দভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে

পারে না। কাব্য ও নাট্যের দ্বারা যে ভাবে ভাব উদ্ভূত হয়, তাহাতে এই সমস্ত বিঘ্ন থাকিতে পারে না। বিনা বাধায়, বিনা বিঘ্নে অন্তর্গত বাসনাত্মক রস যখন হৃদয়কে প্লাবিত করে তখনই তাহা রসের চমৎকার উৎপন্ন করে। বস্তুজ্ঞানসময়ে যখন যে বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞান হয়, জ্ঞানকে ছাড়াইয়া বহির্বস্তুরূপে বা বিষয়স্বরূপে তাহার সত্তা থাকে, তাহাকে জ্ঞানের মধ্যে ধরা যায় না। চক্ষু দিয়া সম্মুখে যে গাছটি দেখিতেছি চক্ষুর্দ্বারা কেবল মাত্র তাহার রূপ গ্রহণ করিতেছি—কিন্তু সেই রূপময়-রূপে যাহাকে দেখিতেছি সেই গাছটি সেইরূপেই বাহিরে রহিয়াছে। রূপের বাহিরে তাহার যে স্বরূপ রহিয়াছে, তাহাকে রূপের দ্বারা ধরা যায় না। অথচ যে বাহিরের সঙ্গে সেই জ্ঞানটি জড়িত, সেই বাহিরের সহিত আমাদের পরিচয় নাই। বাহিরের সহিত জড়িত বলিয়া বাহিরকে না পাইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারা যে রূপকে পাওয়া যায় তাহাকেও সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এইজন্য চাক্ষুষ বা অন্যবিধ প্রত্যক্ষ দ্বারা যে জ্ঞান আমরা আহরণ করি তাহার পূর্ণ স্বরূপ আমাদের নিকট স্ফূর্ত্ত হইতে পারে না। এইরূপ আমাদের অন্তর্গত ব্যক্তিগত বোধ বা সুখদুঃখাদিরূপে যাহা প্রকাশ পায়, তাহার সহিতও আমাদের ব্যক্তিস্বরূপটি একটি অজ্ঞাত বিষয়রূপে জড়িত থাকে এবং যেহেতু আমাদের ব্যক্তিগত পুরুষটি তাহার সহিত সম্বদ্ধ সুখদুঃখাদির বাহিরে থাকে, সেইজন্য সেই পুরুষ-ব্যক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব-প্রযুক্ত সুখদুঃখাদির যথার্থ স্বরূপও পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতে পারে না। সাধারণ প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান-মাত্রই বিষয়রূপে আর একটা কিছুর অপেক্ষা করে। এই অপেক্ষার পরিপূরণ না করিতে পারিলে কেবলমাত্র জ্ঞানের মধ্যেই জ্ঞানের বিশ্রাম হইতে পারে না। আপনার মধ্যে আপনি বিশ্রাম পায় না বলিয়া সে নিরন্তর শত শত সম্বন্ধের মধ্য দিয়া

আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকে, এইজন্য সাধারণ প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান নিয়ত পরাপেক্ষিক হইয়া থাকে। আপনার মধ্যে তাহার কোন সমগ্রতা বা পরিসমাপ্তি নাই। এই পরাপেক্ষিতাই যেমন খণ্ডভাবে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়া তাহাকে প্রকাশ-বহুল করিতে পারে অপরদিকে তেমনি অখণ্ডরূপে বা আপনার মধ্যে আপন পরিসমাপ্তিরূপে (its absolute totality) তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। সাধারণ জ্ঞানের নিয়ত পরাপেক্ষিতা তাহার অখণ্ড পরিসমাপ্ত প্রতীতিতে বাধা দেয় এবং অখণ্ড স্বপ্রকাশের স্ফুরণের বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া থাকে। ইহাকে অভিনব বলিয়াছেন স্বগতত্ব ও পরগতত্ব-রূপ বিঘ্ন। অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান যে কোনও আশ্রয়-ব্যতিরেকে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না এবং সেই আশ্রয় আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত বলিয়া ও তাহার স্বরূপ আমাদের অজ্ঞাত বলিয়া সে আশ্রয়ের স্বরূপ কি তাহাই আমরা জানি না এবং সেইজন্য কোন্ আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে তাহাও আমরা ঠিক করিতে পারি না বলিয়া নির্দ্দিষ্টরূপে তাদৃশ প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানকে কোথাও নিবদ্ধ বা পরিসমাপ্ত বলিয়া বুঝিতে পারি না।

> "সংবেদ্যমসম্ভাবয়মানসংবেদ্যে সংবিদং বিনিবেশয়িতুমেব।
> ন শক্নোতি কা তত্র বিশ্রান্তিরিতি প্রথমো বিঘ্নঃ॥"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কাব্য-নাট্যাদির সম্প্রতীতি-সময়ে তাহার আশ্রয়রূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহা স্বগতও নহে পরগতও নহে। অর্থাৎ তাহা দ্রষ্টারও নহে এবং অন্য কাহারও নহে; তাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া নাই। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ও বিষয়-নিরপেক্ষ ভাবে তাহা একটি সাধারণী রূপ মাত্র। ইংরেজীতে বলিতে গেলে বলিতে পারি তাহা Universal ideal content, এইজন্য কোনও

বিষয়কে অবলম্বন করিয়া বা কোনও ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া তাহা স্ফূর্ত্ত হয় না। সেইজন্য কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষ স্বরূপের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। এইজন্য তাহার কোনও পরাপেক্ষিতাও নাই। তাহা স্বগতও নহে, পরগতও নহে। এইজন্য সাধারণ প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের পরাপেক্ষিতাপ্রযুক্ত পরিসমাপ্ত-প্রকাশের যে জাতীয় বিঘ্নের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কাব্যানুগত চেতনোদ্বোধের তাদৃশ বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। এই জাতীয় পরাপেক্ষিতারূপ বিঘ্ন বিদূরিত হইলে চিত্তোপস্থাপিত চেতনোদ্বোধের সহিত হৃদয়লীন বাসনার পরিচয় ঘটা সহজ হইয়া ওঠে।

"তদপসারণে হৃদয়সংবাদো লোকসামান্যবস্তুবিষয়ঃ।"

অর্থাৎ এমনি করিয়া সাধারণ প্রাত্যক্ষিক জগতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, দেশ-কালাদি-সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া কাব্যশিল্পের মহিমায় তাহা যখন একটি সাধারণীকৃতরূপে বহিরঙ্গ সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ও অপেক্ষা-বর্জিত সামান্যরূপে পাঠকের চিত্তে প্রতিভাত হয়, তখন ব্যক্তি, বস্তু ও দেশ-কালাদি জনিত পরাপেক্ষিতারূপ বিঘ্ন বিদূরিত হইলে, তাদৃশ চেতনো-দ্বোধের সহিত অন্তর্হৃদয়ের বাসনার পরিচয় ও মিলন ঘটিয়া তৎপ্রসূত চমৎকৃতিকে প্রকাশ করিতে পারে। রামায়ণ প্রভৃতিতে যে সমস্ত সপ্ততালাদি ভেদ বা হনুমানের সাগরলঙ্ঘন প্রভৃতি অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের বর্ণনা আছে, সেখানেও দীর্ঘকালের প্রসিদ্ধি বশতঃ তাহার অসামঞ্জস্য ও অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমাদের চিত্তে কোনও সন্দেহ উদ্রিক্ত হয় না। পরন্তু চিরন্তন প্রসিদ্ধিবশতঃ রামায়ণাদি-বর্ণিত ঘটনাবলিকে সুপরিচিত ঘটনা বলিয়া মনে করিয়া লইয়া রামাদি বিশেষ নায়কের চরিতাবলিকেও তৎতৎ নায়কগত বিশেষ স্বভাব নিরপেক্ষভাবে সাধারণীকৃতরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

কোন ব্যক্তি যখন তাহার নিজের কোন বাস্তবিক ঘটনা-সম্পর্কে—কোন অর্থাগম, আত্মীয়বিয়োগ বা কান্তাসংযোগ প্রভৃতি উপলক্ষে সুখদুঃখাদি অনুভব করে, তখন সে অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে নানাবিধ আকাঙ্ক্ষাও জড়িত থাকে। যে সুখটুকু সে পাইয়াছে বা ভোগ করিয়াছে তাহা যেন দূরে সরিয়া না যায়, ধ্বংস না পায়, যে দুঃখটুকু অনুভব করিতেছে তাহা যেন শীঘ্রই অপসারিত হয় ইত্যাদি নানাপ্রকারের আকাঙ্ক্ষা ও অভিসন্ধি আসিয়া মিলিত হইয়া তাহার সুখদুঃখাদির ভোগের ভোগস্বরূপভাবে কলুষিত করিয়া তোলে। সাধারণ বাস্তব জীবনে সুখদুঃখাদি ভোগে এই জাতীয় বিবিধ ভাবের সংমিশ্রণ এই প্রকারে নিরবচ্ছিন্ন ভোগের বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে।

"স্বৈকগতানাঞ্চ সুখদুঃখসংবিদাম্ আস্বাদে যথাসম্ভবং তদপগমভীরুতয়া বা তৎপরিরক্ষাব্যগ্রতয়া বা তজ্জিহাসয়া বা তৎতৎপ্রচিখ্যাপয়িষয়া বা তদ্‌গোপনেচ্ছয়া বা প্রকারান্তরেণ বা সংবেদনান্তরসমুদ্গম এব পরমো বিঘ্নঃ।"

কাব্যরসের অনুভবের বেলায় এই জাতীয় বিভিন্ন ভাবপরম্পরা আসিয়া কাব্যরসাস্বাদের প্রতিকূলতা করিতে পারে না। কাব্যোপ-স্থাপিত চেতনোদ্ভবে যে রস অনুভূত হয় তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বাস্তব ঘটনার সহিত জড়িত নহে এবং সেইজন্য বাস্তব ঘটনায় যে সমস্ত অবান্তর চিন্তা বা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি থাকে কাব্যরসে তাহা থাকে না।

যখন অন্য কোন সুখদুঃখাদি জানা যায় তখন তাহাতেও সেই পুরুষের সহিত দ্রষ্টৃ-পুরুষের সম্বন্ধানুসারে নানাভাব মনে উদিত হইতে পারে। সেই পুরুষ যদি বন্ধু হয়, তবে তাহার দুঃখ জানিলে হৃদয়ে তৎপ্রতীকারের ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে পারে, সে ব্যক্তি যদি শত্রু হয় তবে তাহার আরও দুঃখ বাড়ুক এরূপ কামনা উদয় হইতে পারে। এই

জাতীয় সমস্তভাবই নিরবচ্ছিন্ন রস-প্রবাহের বিঘ্ন। সেই জন্যই এই জাতীয় ভাবোদ্বোধকে রসপ্রতীতি বলা যাইতে পারে না। রসপ্রতীতিতে চিত্তে যে আহ্লাদ ফুটিয়া উঠিবে, তাহা বাস্তবিক ভাবে সেই অনুভবিতার বা অন্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোন চিন্তার সহিত জড়িত নহে। বাস্তবিক ঘটনার সহিত যে সমস্ত সুখদুঃখ ব্যক্তিগতভাবে অনুভূত হয়, তাহার স্বভাবই এই যে, সেই সেই স্থলে লোকে আপন আপন সুখে দুঃখে আপনি কি ভাবে বঞ্চিত হইল বা উপচিত হইল, এই বিষয়ে এমন তৎপর হইয়া থাকে যে, উদ্বুদ্ধ সুখদুঃখাদিকে তাহার স্ব স্ব রূপে অনুভব করিবার অবসর পায় না। যখন কোন লোকের পুত্রবিয়োগ হয় তখন সে আপনাকে এমন ভাবে বঞ্চিত ও দীন মনে করে যে, উক্ত মননজনিত শোকোচ্ছ্বাসকে সে উপভোগ করিতে পারে না। তাহার স্বকীয় অভাববোধ বা ক্ষতি বা মোহ আসিয়া সেই শোকবোধকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে যে সে কিছুতেই তাহাকে তাহার রসস্বরূপে অনুভব করিতে পারে না।

"নিজসুখাদিবিবশীকৃতশ্চ কথং বস্তন্তরে সংবিদং বিশ্রাময়েৎ?"

কিন্তু কাব্যশিল্পের দ্বারা সাধারণীকৃতরূপে যে চেতনোদ্বোধ হয়, তাহাতে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসম্বন্ধ নয় বলিয়া তৎপ্রতিফলিত রস-সামগ্রী অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে। প্রত্যক্ষতঃ নিজের বলিয়া যে সমস্ত সুখদুঃখাদি অনুভূত হয়, তাহার অনুভবের সময় যে সমস্ত বাধা ও বিঘ্ন হইতে পারে তাহা কথঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। অপরের অনুভব বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে গেলে তাহার প্রধান বিঘ্ন এই যে, বাক্যদ্বারা অন্তরনুভূত সুখদুঃখাদির যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। অনুমানের দ্বারাও তাহা গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কারণ এই উভয়ের কোনটির দ্বারাই কোন অনুভূত ভাব স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে না।

কিন্তু নাট্যাদি স্থলে শব্দ ও অনুমানাদিব্যতিরিক্ত প্রত্যক্ষতুল্য একটী ব্যাপারের দ্বারা অনুভূত ভাব ব্যঞ্জিত হইয়া থাকে। এইজন্য অপরের ভাব নাট্যাদিতে যে ভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে, কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা বা অনুমানের দ্বারা তাহা হইতে পারে না।

আমাদের সাংসারিক সকলপ্রকার ভোগই কোন না কোনপ্রকারে দুঃখজনক। আমরা কোন বাস্তববিষয়ের সংযোগে, স্ত্রীসন্নিকর্ষে বা পুত্রাদিজন্মে বা অর্থাদিপ্রাপ্তিতে যে আনন্দ পাইয়া থাকি, সে আনন্দ সর্ব্বদাই বহির্মুখী এবং অপরাপেক্ষী। সে আনন্দের বিষয় প্রধান, আনন্দ গৌণ। কারণ সে বিষয়ের পরিবর্ত্তনে বা নিরোধে আনন্দের পরিবর্ত্তন ও নিরোধ ঘটিয়া থাকে। এইজন্য আনন্দের বা ভোগের কোন স্বতন্ত্রতা নাই, কোন প্রাধান্য নাই। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে অন্যাধীনত্বই দুঃখ ও স্বসমাপ্ততাই সুখ। চাঞ্চল্যই দুঃখের কারণ—এইজন্য রজোবৃত্তি দুঃখাত্মক বলিয়া সাংখ্যমতে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য বাস্তবজগতের সমস্ত সুখভোগের মধ্যে দুঃখ স্পন্দিত হইতেছে। কারণ সকল বাস্তব ঘটনার মধ্যে আমাদের সমস্ত সুখসম্ভোগ বাহ্যঘটনাকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। প্রত্যেক বাহ্য ঘটনা অপর একটী ঘটনার উপর নির্ভর করে, সেই অপরটী আবার আর একটীর উপর—এইরূপে নিরন্তর অবিচ্ছিন্নসূত্রে ঘটনাগুলির মধ্যে পরস্পরাপেক্ষিত্ব অনুস্যূত হইয়া চলিয়াছে। আমাদের সমস্ত সুখ-সম্ভোগ তাহারই সহিত শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্য তাদৃশ কোন সুখসম্ভোগই স্বপ্রধান হইয়া সমাপ্তভাবে আত্মপরিচয় দিতে পারে না।

কিন্তু কাব্যে ও নাট্যে যে রস পাঠক ও দর্শক অনুভব করে তাহার সহিত বাহ্যঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। প্রত্যেকের মধ্যেই কতকগুলি

স্থায়ী ভাব বা instinctive dominant emotion প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কাব্য বা নাট্যের দ্বারা যে বিশেষ একটী চেতনোদ্ভব বা aesthetic attitude ঘটে, তাহারই অনুপ্রেরণায় আমাদের অন্তরস্থ কোন স্থায়ী ভাব যখন উদ্রিক্ত হয় তখন আমরা যে রসসম্ভোগ করি তাহা বাহ্যবিষয়ের সহিত জড়িত নহে এবং পরাপেক্ষী নহে; সেইজন্য সে আনন্দে কোন দুঃখ জড়িত থাকিতে পারে না। এইজন্য নাট্য-রসাস্বাদের সময় আমাদের চিত্ত আমাদের অন্তরের ভাবকে লইয়াই সর্ব্বদা প্রধানভাবে নিমগ্ন থাকে, কোন বহির্বস্তুর অপেক্ষা করে না। এই জন্যই তাহাতে সর্ব্বদা আনন্দ অনুভূত হইতে পারে। ব্যভিচারী ভাবগুলিও আপন আপন বিশিষ্টতা অনুসারে স্থায়ী ভাবগুলির সহিত সংস্কাররূপে জড়িত হইয়া থাকে। সকল মনুষ্যমধ্যেই স্থায়ী ভাবগুলি সর্ব্বদা চিত্তের অভ্যন্তরে সুপ্তকল্প হইয়া থাকে। বিশিষ্ট উদ্বোধক চেতনাসামগ্রীর দ্বারা তাহা উদ্বুদ্ধ হইতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যভিচারী ভাবগুলিও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। ইহা সম্পূর্ণভাবে আন্তর-কারণ-জনিত বলিয়া কোন বাহ্যবস্তুর সহিত ইহার বন্ধন নাই। এইজন্য ইহা একান্তভাবে বাহ্যনিরপেক্ষ এবং স্বপ্রধান। সমস্ত ব্যভিচারী ভাবই স্থায়ী ভাবের সহিত অন্বিত ও স্থায়ী ভাবের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত। এইজন্য নাট্যাদিতে যে যে ব্যভিচারী ভাব ও রস উদ্বুদ্ধ হয় তাহা সমস্তই অন্তঃসামগ্রীজনিত এবং বাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ। বাহ্যবস্তুর সহিত জড়িত বলিয়া বাস্তবজগতের ভয়াদি বিভিন্ন ভাবে সর্ব্বত্র আনন্দ অনুস্যূত নাই। কিন্তু বাহ্যনিরপেক্ষভাবে প্রকাশ পায় বলিয়া নাট্য ও কাব্যে প্রস্তাবিত সকল ভাবই আনন্দে পর্য্যবসিত হয়।

শঙ্কুক প্রভৃতিরা যে বলেন যে, আমাদের অন্তরস্থ স্থায়ী ভাব বিভাবাদির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়, তাহা স্বীকার

করা যায় না। কারণ, লৌকিক ভয়াদিস্থলেও স্থায়ী ভাবই উদ্রিক্ত হইয়া ভয়রূপে আত্মপ্রকাশ করে—ইহা অস্বীকার করা চলে না। কারণ, যদি কাব্যনাট্যস্থ বিভাবাদির দ্বারায় স্থায়ী ভাব উদ্রিক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে বাস্তব বিভাবাদির দ্বারা স্থায়ী ভাব উদ্রিক্ত হয় না, ইহা বলা চলে না। তাহা হইলে বাস্তব ভয়াদির অনুভবকেও রস বলিতে হয়। কিন্তু কেহ শোকার্ত্ত হইলে কেহ বলে না যে শোকার্ত্ত ব্যক্তির করুণরসের উদয় হইয়াছে। রসশব্দ বিশেষভাবে কাব্যনাট্যাদির দ্বারা প্রয়োজিত অনুভবস্থলেই ব্যবহৃত হয়। এইজন্য একথা মানিতেই হয় যে কাব্য-নাট্যাদির স্থলে স্থায়ী ভাব স্বয়ং উদ্রিক্ত হইয়া আস্বাদিত হয় না। এইজন্যই ভরতসূত্রে "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ" এইস্থলে স্থায়ী ভাবের উল্লেখ হয় নাই। তথাপি অনেকস্থলে এরূপ বলা হয় যে, স্থায়ী ভাবই রসীভূত হইয়াছে বা "রসতামেতি রত্যাদিঃ"। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কাব্য নাট্যের অনুভূতিস্থলে যে জাতীয় রস অনুভূত হয়, তাহার প্রতি স্থায়ী ভাবের ঈষৎ জাগরণ-প্রযুক্ত উপযোগিতা বা উপকারিতা আছে। লৌকিক ভয়াদির অনুভবস্থলে স্থায়ী ভাবই জাগ্রত হইয়া উঠিয়া ভয়াদির অনুমান উৎপন্ন করে। কিন্তু কাব্যনাট্যাদির স্থলে বিভাবাদিকে অবলম্বন করিয়া যে রস আস্বাদিত হয়, স্থায়ী ভাবের কিঞ্চিৎ উদ্বোধ না হইলে বিভাবাদির দ্বারা ব্যঞ্জিত রসপদার্থের তাদৃশ উপচয় ঘটিতে পারিত না। লৌকিক অনুভবস্থলে স্মৃতি বা অনুমানের দ্বারা অন্যের চিত্তের ভাব যখন আমরা জানি বলিয়া মনে করি, তখন অন্যের চিত্তের সেই ভাব আমাদের চিত্তে অনুভূত হয় না। একটি লোককে পলাইতে দেখিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি যে, সে ভয় পাইয়াছে কিন্তু তাহার চিত্তে ভয়ের অনুভূতি আমাদের মনে অনুভূত হয় না। কিন্তু রসের আস্বাদ অভিনেয়-পুরুষ-গতরূপে প্রতীত হইলেও

তাহা নিজের চিত্তে সাক্ষাৎ অনুভূত হয়। এস্থলে হৃদয়ের মধ্যে বিভাবাদির দ্বারা যে ভাব উপস্থাপিত করা হয়,তাহার সহিত বাসনাত্মক স্বরূপে যে সমস্ত স্থায়ী বা ব্যভিচারী ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা ঈষৎ উদ্বুদ্ধ হয় ও তাহার বলে বিভাবাদির দ্বারা উপস্থাপিত রামাদিগত রস আস্বাদিত হয়। এইজন্য দর্শকের স্বকীয় হৃদয়গত স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাব কিঞ্চিৎ উদ্রিক্ত হয় বলিয়া ইহাকে সেই দর্শকের হৃদয়সাক্ষাৎকার বলা যাইতে পারে। আবার যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই রস প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সহিত দর্শকের বাস্তব জীবনের কোনও সম্পর্ক নাই বলিয়া সেই অনুভবকে একান্তভাবে দর্শকের বাস্তব অনুভব বলিয়া বলা যায় না। অথচ রামাদিগত রসের অনুভব দর্শকের মধ্যে অনুকরণাদির দ্বারা অনুভূত হইতেছে—ইহাও বলা যায় না। এই রসানুভবের মধ্যে কোনও অনুমান নাই বা সাদৃশ্যাদিনিবন্ধন অনুকরণও নাই। অনুমান, উপমানাদি সাধারণ বাস্তব জীবনের কোনও প্রমাণকে অবলম্বন না করিয়াই কেবলমাত্র কাব্যশিল্পের মাহাত্ম্যে হৃদয়ের মধ্যে যাহা উপস্থাপিত বা ব্যঞ্জিত হয় তাহাই স্বকীয় স্থায়িভাবাদির ঈষৎ উন্মেষের দ্বারা রসাস্বাদরূপে আত্মপরিচয় দেয়। অথচ এই রসাস্বাদ একান্ত লৌকিকব্যাপার-নিরপেক্ষও নহে। কারণ লোকপ্রসিদ্ধ বিভাবাদি অলৌকিকভাবে হৃদয়ে উপস্থাপিত হয় অথচ প্রত্যক্ষানুমানাদি লৌকিক প্রক্রিয়া হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যোগিপ্রত্যক্ষ-স্থলে যোগী হয়ত অপর চিত্তের ভয়াদি স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, কিন্তু সে প্রত্যক্ষ একান্তভাবে আসক্তিবিহীন এবং সেজন্যই তাদৃশ প্রত্যক্ষের কোন আনন্দানুভব নাই। বাস্তব ভয়াদি অনুভবে মানুষের চিত্ত বহির্বিষয়ের সহিত এমনভাবে জড়িত থাকে যে তাদৃশ অনুভবের সময় তাহার চিত্ত একান্তভাবে বহির্বস্তুর দ্বারা গৃহীত হইয়া পরাধীন হইয়া থাকে। কিন্তু

কাব্যনাট্যরসানুভবস্থলে বহির্বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে স্বকীর হৃদয়গহ্বর হইতে স্বতন্ত্রভাবে রসসঞ্চার হয়। সেইজন্য এই অনুভবস্থলে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত থাকে না। এইজন্য বিভাবানুভাবের দ্বারা রস উৎপন্ন হয়—ইহা বলা চলে না। কারণ বিভাবাদি দূর হইলেও রসবোধ হইতে পারে। এবং বিভাবাদিকে রসজ্ঞানের কারণ বলিয়াও বলা চলে না। কারণ, রস সিদ্ধ বস্তু নহে যাহা বিভাবাদির দ্বারা অনুমিত হইতে পারে। নানা বস্তুমিশ্রিত সুস্বাদু সুগন্ধ পানীয়ের আস্বাদের সময় যেমন তাহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বস্তুর আস্বাদ স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত হয় না কিন্তু তাহাদের সমগ্রতায় একটি রসের আস্বাদ পাওয়া যায়, বিভাবাদির দ্বারাও রস সেইভাবে আস্বাদনযোগ্য হয় অথচ তাহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাদ পৃথক্‌ভাবে পাওয়া যায়।

নানাবিধ বেশভূষা পরিধান করে বলিয়া নটকে কোন বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় অথচ রাম বলিয়া মনে হয় না। তাহা রোমাঞ্চাদি দ্বারা লৌকিক দেশকালাদির সহিত সম্বন্ধবিহীন ভাবে নটগত রত্যাদিভাব প্রকটিত করে। সেই রত্যাদি ভাবের মধ্যে স্বকীয় বাসনার উদ্বোধ প্রবুক্ত দর্শক অনুপ্রবিষ্ট হন। এই জন্য দর্শকের মনে যে রত্যাদি ভাব উপস্থিত হয়, তাহা তাহার ব্যক্তিগত নহে, এবং বাস্তব কোন কারণের সহিতও তাহা সম্বদ্ধ নহে। বিভাবাদির বর্ণনা দ্বারা পাঠক বা দর্শকের চিত্তে একটি সৌন্দর্য্য-ঘটিত চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই চিত্তবৃত্তিকে বিভাবাদির সাধারণীভাব কহে। কারণ, ইহারা বাস্তব ঘটনার সহিত সংযুক্ত না থাকিয়া বাস্তব ঘটনার সারভূত আলম্বন উদ্দীপন প্রভৃতিকে চিত্তে সংক্রান্ত করে। রস কাহাকে বলে এই বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ভরত বলিয়াছেন,—"রস ইতি কঃ পদার্থঃ ? উচ্যতে, আস্বাছত্বাৎ"। রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা নানাবিধ

মিশ্রবস্তুর রস আস্বাদ করা যায় এবং তাহাতে আনন্দ হয়; তেমনি নানাবিধ ভাবাভিনয় দ্বারা ব্যঞ্জিত স্থায়ী ভাব কাব্যজ্ঞ রসিকেরা আস্বাদ করিতে পারেন। অভিনব ইহার টীকায় বলিতেছেন—"তেঽপি স্থায়িনঃ আস্বাদয়ন্তি ইতি আভিমুখ্যেন সাদৃশ্যে ন ব্যাখ্যাতা অস্মাভির্ব্যবহৃতা।" অর্থাৎ ভাবের আভিমুখ্যে রসাস্বাদ হয়। বাস্তব জগতের ভাবানুভবের ন্যায় স্থায়ীভাব স্বয়ং সন্ধুক্ষিত হইয়া জাগ্রত হয় না; কিন্তু স্থায়ী ভাবগুলি অন্তরের নিভৃতে থাকিয়া এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে যে তাহার সহিত বিভাবাদিজনিত সাধারণীকৃত সৌন্দর্য্যাত্মক চিত্তবৃত্তির সাদৃশ্যে যে সংবাদ বা পরিচয় ঘটে তাহার ফলে চিত্তভূমি রসসিক্ত হইয়া উঠে। রসকে আস্বাদন-ব্যাপার বলার তাৎপর্য্য এই যে, জিহ্বেন্দ্রিয়েতে যেমন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় রস উদ্ভূত হয়. আমাদের আত্মা বা মনের মধ্যেও সেই প্রকার রস উদ্ভূত হয়। রসাস্বাদটি একটি মানস ব্যাপার বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, ইন্দ্রিয়জ ব্যাপার নহে। "ন রসনা-ব্যাপার আস্বাদনমপিতু মনস এব। কেবলং লোকে রসনাব্যাপারানন্তরভাবী স্বপ্রসিদ্ধ ইত্যুপচার ইহ দর্শিতঃ"। এই প্রসঙ্গে ভরত বলিয়াছেন—

"ভাবাভিনয়-সম্বন্ধ-স্থায়িভাবাংস্তথা বুধাঃ।
আস্বাদয়ন্তি মনসা তস্মান্নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥"

—অর্থাৎ বিভাব ও অনুভাবাদির সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকিয়া অন্তর্হৃদয় ও চেতনাবৃত্তির পরিচয়বশতঃ যখন অচিন্তনীয় স্থায়ী ভাবগুলির সহিত দর্শক বা পাঠকের চিত্তভূমি তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া একরূপ অভিন্ন হইয়া যায়, তখন সাধারণীকরণ দ্বারা বাস্তববস্তুর সহিত সম্পর্কপ্রযুক্ত যে সমস্ত বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে তাহার ব্যাঘাত ঘটে এবং অন্য কোনও ইন্দ্রিয় হইতেও কোন বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত

হইতে পারে না। এইজন্য তখন যে স্বাদ উৎপন্ন হয়, তাহাতে নিজের বা পরের, স্বগত বা পরগত কোনও ভেদ থাকে না এবং লৌকিক প্রত্যয় হইতে ও যোগি-প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইতে সুখদুঃখাদি বিচিত্র বাসনার ছায়াপাতে যে সমস্ত অতি মনোহর জ্ঞানধারা রসচর্ব্বণের রূপে প্রতিভাত হয়, তাহাকেই রসাস্বাদ বলা যায়। অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি যখন দেশকালাদি-নিরপেক্ষ ভাবে কাব্যকলার দ্বারা হৃদয়ের মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়, তখন সেই ব্যঞ্জনানুসারে হৃদ্‌গত নানা গ্লানি, শঙ্কা, নির্ব্বেদ, হর্ষ প্রভৃতি পূর্ব্বানুভূত ভাব-সংস্কার বাস্তবগত বা বিষয়গত (Real or Objective) সম্পর্কশূন্য হইয়া ভাসমান হয় ও তাহার সহিত সম্বদ্ধভাবে স্থায়ী ভাবটিও বাস্তবগত ও বিষয়গত সম্পর্কবিহীন ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। বাস্তবগত সম্পর্ক থাকে না বলিয়া অন্তর্গত ব্যভিচারী ও স্থায়ী ভাবগুলির অভিব্যক্তি কোনও প্রকারে দর্শকের বা পাঠকের চিত্তকে বহির্জগতের সহিত বদ্ধ করে না। বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন আস্বাদনের যে সমস্ত বিঘ্ন ঘটিতে পারে তাহাও সেখানে উপস্থিত থাকে না। ফলে পাঠক বা দর্শকের চিত্ত ঈষদ্‌-উদ্বুদ্ধ ব্যভিচারী ও স্থায়ী ভাবের দ্বারা এমন ভাবে অভিষিক্ত হয় যে তৎকালে অন্তর্হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ ব্যভিচারী ও স্থায়ী ভাবের আভাস প্রতিফলিত হয়; এবং তাহার সহিত একান্ত অভিন্ন ভাবে ও তন্ময় ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। চিত্তের এতাদৃশ আত্ম-প্রকাশকে রসাস্বাদ কহে। "অত্র ভাবা বিভাবব্যভিচারিণঃ। অভিনয়া অনুভাবা এবেদং পৃথগ্‌ বচনং প্রাধান্যাৎ, তৈর্যৈঃ সম্যগ্‌বদ্ধা হৃদয়সংবাদক্রমেণ তন্ময়ীভাবাপন্নপ্রমাতৃভূম্য-ভেদমুপসম্প্রাপ্তা অচিন্ত্যাঃ স্থায়িনঃ আ সমন্তাৎ সাধারণীভাবেন নির্বিঘ্ন-প্রতিপত্তিবশান্মনসেন্দ্রিয়ান্তরবিঘ্নসংভাবনাশূন্যমাস্বাদয়ন্তি স্বপরবিবেকশূন্য-স্বাদচমৎকারপরবশাৎ লৌকিকাৎ প্রত্যয়াদুপার্জ্জনাদিবিঘ্নবহুলাদ্

যোগিপ্রত্যয়াচ্চ বিষয়াস্বাদশূন্যতাপরত্বাদ্ বিলক্ষণাকারসুখদুঃখাদি-বিচিত্রবাসনানুবেধোপনতহৃদ্যতাতিশয়সংবিচ্চ বর্ণাত্মনা ভুঙ্‌ক্তে।”

ভরত লিখিয়াছেন,—“তস্মাৎ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।” ইহার অর্থ করিতে গিয়া অভিনব বলিতেছেন যে রসের সমুদয়ই নাট্য। রস যে কেবল মাত্র নাট্যের বিষয় তাহা নহে, ইহা কাব্যের বিষয়ও বটে। কাব্যার্থ-বিষয়ে যখন প্রত্যক্ষকল্প ভাবে কাব্যবস্তু উপস্থাপিত হয় তখনই রসের উদয় হয়। “কাব্যার্থবিষয়ে হি প্রত্যক্ষকল্পসংবেদনোদয়ে রসোদয়ঃ”। ভট্টতৌতকৃত কাব্যকৌতুকেও লিখিত আছে যে কাব্যার্থ নাট্যের ন্যায় প্রতিফলিত না হইলে তাহার আস্বাদ হয় না। বিভা-বাদি দ্বারা সম্যক্ প্রতিফলিত কাব্যার্থ প্রত্যক্ষের ন্যায় স্ফুট হইয়া উঠে।

“প্রয়োগত্বমনাপন্নে কাব্যে নাস্বাদসম্ভবঃ ইতি।”
বর্ণনোৎকলিকাভোগ-প্রৌঢ়োক্ত্যা সম্যগর্পিতাঃ॥
উদ্যানকান্তাচন্দ্রাদ্যা ভাবাঃ প্রত্যক্ষবৎ স্ফুটাঃ॥

পূর্ব্বে ভামহ হইতে বামন পর্য্যন্ত যে সমস্ত আলঙ্কারিকের কথা বলিয়াছি, তাঁহারা প্রধানতঃ গুণ, অলঙ্কার ও সৌন্দর্য্যাতিশয্যের দ্বারাই কাব্যের রসাস্বাদ বর্ণনা করিয়াছেন। এই কথা লক্ষ্য করিয়া অভিনব বলিয়াছেন,—“অন্যে তু কাব্যেঽপি নানালঙ্কারসৌন্দর্য্যাতিশয়কৃতং রস-চর্ব্বণমাহুঃ।” কিন্তু অভিনব মনে করেন যে কাব্যই নাট্য এবং সে জন্যই নাট্য হইতেও যে প্রণালীতে রসাস্বাদ ঘটে, কাব্য হইতেও সেই প্রণালীতে রসাস্বাদ ঘটে। যাহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই নির্ম্মল এবং কাব্য-রস গ্রহণের উপযোগী, তাহারা কাব্য শুনিতে শুনিতেই তাহার রসাস্বাদ করিতে পারে। যাহাদের স্বাভাবিক শক্তি কম তাহাদের জন্যই নাট্যপ্রক্রিয়া। নাট্যে প্রাত্যক্ষিক ভাবে অভিনয় না দেখিলে

তাহাদের চিত্তে রসাস্বাদ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। আবার এই সমস্ত লোকের চিত্ত নাট্যরসাস্বাদন করিতে করিতে পাছে হঠাৎ সাধারণ লৌকিক অনুভবে পরিণত হয়, এই ভয়ে নাট্যরসের মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য ভরতমুনি নাট্যের মধ্যে গীতবাদ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশীয় কোনও প্রসিদ্ধ ও প্রাতঃ-স্মরণীয় ব্যক্তি এক সময় নীলদর্পণ অভিনয় দেখিতে গিয়া সাহেবদের অত্যাচারের অভিনয় দেখিয়া এতই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে দর্শকের স্থান হইতে উঠিয়া চটি নিষ্কাশন করিয়া ষ্টেজের উপর নীলকর সাহেবের ভূমিকায় যে ব্যক্তি অভিনয় করিতেছিল তাহাকে ছুঁড়িয়া মারেন। এস্থলে উক্ত দর্শকের চিত্তে যে ভাব হইয়াছিল তাহা নাট্যরস নহে, লৌকিক ভাবের আপ্লাবন। কোনও নাট্যরস দীর্ঘকাল ধরিয়া আস্বাদন করিতে গেলে যাঁহারা যথার্থ রসস্বাদচতুর নহেন তাঁহাদের চিত্তে নাট্যরস ব্যাহত হইয়া লৌকিক ব্যক্তিগত অনুভব প্রকাশ পাইতে পারে—এই আশঙ্কায় নাটকীয় রসের বিচ্ছেদ জন্মাইয়া দর্শকের চিত্তকে নাট্যের উপভোগের উপযোগী করিবার জন্য গীতাদি প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা—"স্বগতক্রোধশোকাদিসঙ্কটহৃদয়গ্রন্থিভঙ্গনায় গীতাদি-প্রক্রিয়া চ মুনিনা বিরচিতা।" নাট্যস্থলে নটকে পাত্র বলা হয়। এই নটের মধ্য দিয়া প্রকাশিত ভাব দর্শক গ্রহণ করিয়া থাকে। অভিনয়াদিসামগ্রীময় বহির্দৃশ্যমান নাট্যব্যাপারকে নাট্য বলা যায় না। কিন্তু নাট্য বাস্তবিক আন্তর বস্তু এবং অভিনয়াদি সামগ্রী দ্বারা উপস্থাপিত আস্বাদ্যমান আন্তরবস্তুকে নাট্য কহে। স্থায়ী ভাবগুলির প্রত্যেকটীরই বিশেষ বিশেষ স্বভাব থাকিলেও কাব্য বা নাট্যের দ্বারা উপস্থাপিত হইলে তাহাদের সকলগুলি রসাকারে আস্বাদিত হয়। শোক মাত্রেই দুঃখের কারণ নহে। কোন ব্যক্তির নিজের ক্ষয়

বা ক্ষতিতে যে শোক হয় তাহাতে দুঃখ উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই অথচ সেই ক্ষয় ক্ষতি যদি কোন শত্রুর হয় তবে তাহাতে সুখ উপস্থিত হয় এবং তাহা যদি কোনও অজ্ঞাত মধ্যস্থ ব্যক্তির হয় তবে তাহাতে সুখও হয় না দুঃখও হয় না। অভিনব বলেন যে বিভাবাদি ব্যাপারের দ্বারা যাহা উপস্থাপিত হয় তাহা জ্ঞানে আনন্দময়রূপে প্রকাশ পায়। রতিসুখাদি বাসনা দ্বারা আনন্দের আস্বাদে যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঘটে তাহাই বিভিন্ন বিভিন্ন রসরূপে পরিচিত হয়।

অভিনয়াদি দ্বারা অন্তর্হৃদয়গত রসকে যাহা প্রকাশ করে তাহাকে ভাব কহে। রস উৎপন্ন না হইলে ভাবের কোনও পৃথক সত্তা নাই। ভাবের দ্বারা যেমন রস প্রকটিত হয়, রসের দ্বারাও তেমনই ভাব প্রকটিত হয়। "ভাবা রসান্ ভাবয়ন্তি নিষ্পাদয়ন্তি। রসাস্তু ভাবান্ ভাবয়ন্তি ভাবান্ কুর্ব্বন্তি ভাবাদিব্যপদেশ্যান্ কুর্ব্বন্তি।" বীজ যেমন বৃক্ষের মূলীভূত কারণ, রসও তেমনই ভাবের মূলীভূত কারণ। কবিগত রসানুভূতি সমস্ত রসাস্বাদের বীজ, কাব্য তাহার বৃক্ষ, অভিনয়াদি ব্যাপার সেই বৃক্ষের পুষ্প-স্বরূপ, পাঠক বা দর্শকের রসাস্বাদ তার ফল। এই দিক দিয়াই বিশ্বকে রসময় বলা হইয়াছে। ভাব হইতে রস হয় কি রস হইতে ভাব হয়, কি উভয় হইতে উভয় হয় ইহা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। ইহা অনেক পরিমাণে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। কোনো দিক দিয়া দেখিতে গেলে যেমন ভাব হইতে রস হয় বলা যায়, অপর দিক হইতে রস হইতে ভাব হয় একথাও বলা যায়। আকার, ভাব ও রসের পরস্পরোপকারিত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে রস ও ভাবের পরস্পরজনকত্বও স্বীকার করিতে হয়। নাট্যশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ের টীকায় ভাববিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া অভিনব বলিয়াছেন যে, ভাবশব্দের অর্থ কতকগুলি বিশেষ চিত্তবৃত্তি। ইহারা

কোনও সময়ে বা স্থায়ী রসরূপে কোনও সময়ে বা ব্যভিচারী ভাবরূপে কোনও সময়ে বা বিভাবাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বাহ্য অনুভাবাদি বা বাহ্য বসন্ত ঋতু, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতিকে কখনও ভাব বলা যায় না। এই ভাবকে একদিকে যেমন emotion বলা যায়, অপর দিকে তেমনি সংবিদ্ বা জ্ঞানও বলা যায়। কারণ, জ্ঞানস্বরূপেই ইহার আবির্ভাব এবং জ্ঞানস্বরূপেই ইহার লয়। জ্ঞান মাত্রের মধ্যেই ভাব বা emotion আছে, এবং emotion মাত্রের মধ্যেই জ্ঞান আছে। যদিও ভাবকে চিত্তবৃত্তি এই আখ্যা দেওয়া হয় তথাপি 'ভবতি' এই ব্যুৎপত্তি হইতে ভাবশব্দ নিষ্পন্ন করার কারণ এই যে, এই ভাব বা emotionগুলির পুনঃ পুনঃ সঙ্ঘটনের দ্বারা স্থায়ী ভাবটি ক্ষণ ক্ষণান্তরে গৃহীত হইয়া পরিমিতকালব্যাপী হইয়া আস্বাদনের যোগ্য হয়। আবার 'ভাবয়ন্তি' এই ব্যুৎপত্তি দ্বারাও ভাবশব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। ভরত বলিয়াছেন,—

"বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ।"

কাব্যার্থ বলিতে কাব্যের দ্বারা উপস্থাপিত অভিধেয়স্বরূপ কোনও বস্তু-সংক্ষেপ বুঝা যায় না। অর্থ শব্দের অর্থ অভিধেয় নয়, "অর্থ্যন্তে প্রাধান্যেন যে তে অর্থাঃ।" অর্থাৎ কাব্য যাহা প্রধান ভাবে প্রকাশ করিতে চায় তাহাই অর্থ। কাব্য প্রধান ভাবে কি প্রকাশ করিতে চায়?—রস। এই জন্য কাব্যার্থ শব্দের অর্থ কাব্যদ্বারা প্রকাশ্য রস। কাব্যার্থ যে রস তাহাকে যাহা 'ভাবয়ন্তি' অর্থাৎ নিষ্পাদন করে, অর্থাৎ স্থায়ী ও ব্যভি-চারী প্রভৃতিরূপে আস্বাদনযোগ্য করে তাহাই ভাব। স্থায়ী ভাবটি হৃদ্‌গত হইয়া থাকিলেও তাহার ব্যক্তিগত রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে সর্ব্বসাধারণীরূপে যাহা আস্বাদনযোগ্য করে তাহাকেই ভাব বলে। 'ভাবয়ন্তি' শব্দের আর একটি অর্থও ভরত লিখিয়াছেন। "ভূ ইতি

করণে ধাতুঃ ; তথা চ ভাবিতং বাসিতং কৃতম্ ইত্যর্থান্তরম্। লোকেঽপি চ প্রসিদ্ধং অহো হি অনেন গন্ধেন রসেন বা সর্ব্বমেব ভাবিতম্ ইতি তচ্চ ব্যাপ্ত্যর্থম্। শ্লোকাশ্চাত্র—

"বিভাবৈরাহৃতো যোঽর্থো হ্যনুভাবৈস্তু গম্যতে।
বাগঙ্গসত্ত্বাভিনেয়ৈঃ স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ॥
বাগঙ্গমুখরাগেণ সত্ত্বেনাভিনয়েন চ।
কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে॥
নানাভিনয়সম্বন্ধান্ ভাবয়ন্তি রসান্ ইমান্।
যস্মাদ্ তস্মাদ্ অমী ভাবা বিজ্ঞেয়া নাট্যযোক্তৃভিঃ॥"

ইহার টীকায় অভিনব বলেন যে, কস্তূরীর গন্ধ যখন বস্ত্রকে অনুবাসিত করে, সেখানে অনুবাসন শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি। নটের দ্বারা অভিনীত ভাবগুলি এইভাবেই সাধারণীকৃত হইয়া কস্তূরীগন্ধের ন্যায় দর্শকদের চিত্তকে ব্যাপ্ত করে। নটের চিত্তবৃত্তি এখানে সাধারণীকৃত হইয়া দর্শকের চিত্তকে ব্যাপ্ত করে। অভিনব বলেন যে, ভরত আরও একটি অর্থ এখানে সূচিত করিয়াছেন। যেহেতু বিভাবাদি দ্বারা ভাব উৎপন্ন হয় সেই জন্য ভাবকে ভাব বলা হয়। কেহ কেহ বলেন যে, বাগঙ্গাদি অভিনয়ের দ্বারা সেই অভিনয়সহকৃত ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা অন্যান্য ব্যভিচারী ভাব উৎপন্ন হয় ও তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, এবং তাঁহারা আরও বলেন যে, ব্যভিচারী ভাবেরও ব্যভিচারী ভাব আছে। নির্ব্বেদ একটি ব্যভিচারী ভাব, ইহারও একটি ব্যভিচারী ভাব আছে,—চিন্তা। শ্রম একটি ব্যভিচারী ভাব, নির্ব্বেদ এই ব্যভিচারী ভাবের ব্যভিচারী ভাব। এই মতে ব্যভিচারী ভাবের সংমিশ্রণই স্থায়ী ভাব। অভিনব এ মত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে স্থায়ীভাবই ব্যভিচারী ভাবরূপে আত্মপ্রকাশ করে ; কিন্তু ব্যভিচারী ভাব কখনও স্থায়ী ভাবকে

উৎপন্ন করে না। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্থায়ী ভাবের ব্যভিচারী ভাবের আস্বাদের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেখানে কোনও ব্যভিচারী ভাবের স্বতন্ত্র ব্যভিচারী ভাব পরিলক্ষিত হয় সেখানে বস্তুতঃ সেই সেই বিভিন্ন ব্যভিচারী ভাবগুলি স্থায়ীভাব হইতেই বিনির্গত বা প্রকটিত বলিয়া বর্ণিত হয়। উন্মাদ একটি ব্যভিচারী ভাব, কিন্তু এই উন্মাদের সহিত সহচরিত ভাবে বিতর্ক ও চিন্তা প্রভৃতিও দেখা যায়, যেমন বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে পুরূরবার চরিত্রে। কিন্তু এ সমস্ত স্থলে উন্মাদ, তর্ক, চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবগুলি সমস্তই রত্যাখ্য স্থায়ী ভাব হইতে উৎপন্ন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কোনও কবি যখন তাঁহার কাব্য-শিল্পের রচনা করেন, তখন তাঁহার লৌকিক যে সমস্ত ভাব বাস্তব ঘটনার সহিত জড়িত, তাহাকে অবলম্বন করিয়া তিনি সেই কাব্যশিল্প রচনা করিতে পারেন না। লৌকিক ভাবে বাস্তব ঘটনার সহিত অনুভূত ভাবগুলি যখন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বাসনারূপে অবস্থিত হয়, এবং যখন সেই বাসনাগুলি বাস্তবকে অবলম্বন না করিয়া তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়, তখনই তিনি দেশকালাদি রহিত ভাবে সাধারণীকৃত-রূপে কাব্যার্থের বিভাবন করিতে পারেন, এবং তাদৃশ বিভাবন ব্যাপারের ফলেই যে কাব্য রচিত হয় তাহা লোকের আস্বাদযোগ্য হইতে পারে। নিজের ব্যক্তিগত বাস্তব ঘটনার বা তৎসহচরিত অনুভবের বর্ণনায় কখনও কাব্য হইতে পারে না। তাহা জীবন-চরিত হইতে পারে, তাহাদ্বারা লোকের চিত্তে অনেক অনুভব উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাব্যরস জনিত অনুভব নহে।—"বাগঙ্গমুখরা-গাত্মনাভিনয়েন সত্ত্বলক্ষণেন চাভিনয়েন করণেন কবেঃ সাধারণং তদাপি বর্ণনানিপুণস্য যঃ অন্তর্গতোঽনাদিপ্রাক্তনসংস্কারপ্রতিভানময়ো

ন তু লৌকিকবিষয়জঃ, রাগান্তে এব দেশকালাদিভেদাভাবাৎ সর্ব্বসাধারণীভাবেন আস্বাদযোগ্যঃ তং ভাবয়ন্ আস্বাদযোগ্যী কুর্ব্বন্ ভাবশ্চিত্তবৃত্তিলক্ষণ এব উচ্যতে।" তাৎপর্য্য হইল এই যে, নট তাহার অভিনয়ের দ্বারা তাহার আস্বাদযোগ্য চিত্তবৃত্তিবিশেষের দ্বারা দর্শকের চিত্তে তাদৃশ চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করে। The player communicates by his actions, such of his mental states as can be enjoyed aesthetically, to the audience. এইরূপে নটের চিত্তবৃত্তি দর্শকের চিত্তবৃত্তিকে প্রভাবিত করিতে যাওয়ার সময় তাহা দর্শকের অনুরূপ স্থায়ী বৃত্তিকে যে নাড়া দেয়, তাহারই ফলে সেই স্থায়ীবৃত্তির উদ্বোধন হইতে যে সমস্ত আস্বাদ উদ্বুদ্ধ হয় তাহার মধ্য দিয়া সেই সেই স্থায়ীভাব রসরূপে সেই সমস্ত ব্যভিচারী ভাবের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া আস্বাদযোগ্য হইয়া থাকে। এই জন্যই ভরত বলিয়াছেন যে আটটি স্থায়ী ভাব, তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব এবং আটটি সাত্ত্বিক ভাব এই ঊনপঞ্চাশটী একত্রিত হইয়া কাব্যরস সঞ্চারিত করে; এই জন্য এই ঊনপঞ্চাশটিকেই ভাব বলা হয়। যে রস অন্তর্হৃদয়ের সহিত পরিচয়প্রযুক্ত আপনাকে চিত্তের মধ্যে ব্যাপ্ত করে তাহাই রসের কারণ।

"যোহর্থো হৃদয়-সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।"

ভাবগুলির আস্বাদ্যমানতাই রস। অনেকস্থলে স্থায়ী ভাবকেই রস বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার স্থায়ী ভাবকেও ভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থায়ীভাব যদি ভাবই হয় তবে অন্যভাব হইতে বিভিন্নরূপে তাহার রসরূপতা কেমন করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তরে ভরত বলেন,—স্থায়ী ভাবের যদিও অন্যভাবের সমানরূপতা আছে, তথাপি তাহার এমন একটি বিশিষ্টতা আছে যে কারণে অন্যান্য

বিশিষ্ট আস্বাদও স্থায়ীভাবেরই আস্বাদ বলিয়া বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভরত বলেন যে, সকল মানুষই অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমান, তথাপি কুলশীলাদির বৈশিষ্ট্যপ্রযুক্ত কাহাকেও বা রাজা বলা হয়, কাহাকেও বা অনুচর বলা হয়। এখানেও সেইরূপ। স্থায়ীভাবের অন্য ভাবের সহিত সামান্যতঃ মিল আছে, তথাপি অন্য সমস্ত ভাবগুলি স্থায়ী ভাবকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। এইজন্য স্থায়ী ভাবকেই রস বলা যাইতে পারে। সাত্ত্বিক ভাব বলিতে একমনস্কতা বা সমাধি বুঝা যায়। আটটি স্থায়ীভাবের অনুকূল আটপ্রকার মনঃসংযোগকে আটটি সাত্ত্বিক ভাব বলা হইয়াছে। এই মনঃসংযোগপ্রসূত শারীর ধর্ম্ম স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য ও অশ্রুপাত এবং একান্তভাবে চিত্ত-শূন্যতা এই আটরকমে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রসসম্বন্ধে বলিতে গিয়া অভিনব আরও বলিয়াছেন যে সংবিদাত্মতা রূপে রসের প্রকাশ হয়। কোনও নারীর প্রতি কোনও পুরুষের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া সেই নারীর প্রতি তাহার আকর্ষণ বা কামনা অভিব্যক্ত করে, এবং এই কামনা বা আকর্ষণ যদি সাধারণীভূতরূপে প্রকাশ পায় তাহা হইলে আমরা তাহাকে রতি বলিব না। তাহাকে আমরা রত্যাভাস মাত্র বলিব। যখন স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে একাত্মরূপে গ্রহণ করে, অর্থাৎ When they enter into an ideal unity, তখনই তাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রকাশিত ভাবের আস্বাদকে যথার্থ রতি বলা যায়। "একৈব হ্যসৌ তাবতী রতি র্যত্র অন্যোন্যসংবিদৈকবিয়োগো ন ভবতি।" (নাট্যসূত্র, পৃঃ, ৩০৩)।

ভরত আরও বলেন যে, চারিপ্রকার মূল রস,—শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস। শৃঙ্গার হইতে হাস্য, রৌদ্র হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত ও বীভৎস হইতে ভয়ানক রস উৎপন্ন হয়। শৃঙ্গারের অনুকরণ হইতে

হাস্য হয়, রৌদ্র রসপ্রযুক্ত ব্যাপারের ফলে করুণ রস দেখা যায়। বীর রসের কার্য্য হইতে অদ্ভুত রসের উৎপত্তি হয়, এবং বীভৎস হইতে ভয়ানক রস হয়। রৌদ্র রসের ফলে বধ-বন্ধনাদি দেখা যায়, তাহার ফলে করুণ রস হইতে পারে। অভিনব বলেন যে, রৌদ্র হইতেও ভয়ানক হইতে পারে এবং শৃঙ্গার হইতেও করুণ হইতে পারে। এমনই বীররস হইতেও ভয়ানকোৎপত্তি হয়।

অভিনব যদিও কাব্যার্থকে রস বলিয়া বলিয়াছেন এবং কাব্যের একান্ত তাৎপর্য্য রসের মধ্যেই ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করিয়াছেন তথাপি এই রসের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বের যে একটি অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে এবং কবি যে তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব-ভুবনের সত্যকে নিত্য নবোন্মেষিণী বুদ্ধির দ্বারা রসসিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া ভগবৎ প্রাপ্তির ন্যায় চরমানন্দ লাভ করেন তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন।—

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বেহপ্যবলম্ব্য বিশ্বমনিশং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়নং ত্বদ্‌ভক্তিতুল্যং সুখম্॥"

কবির বাক্যের মধ্য দিয়া কেবল যে নির্ঝরধারায় রসগঙ্গা প্রবাহিত হয় তাহা নহে। সেই রসগঙ্গার প্রত্যেক ঊর্ম্মির মধ্য দিয়া নব নব স্ফূর্য্যোচ্ছ্বাসে সত্যের দীপ্তি উদ্ভাসিত ও উন্মেষিত হইয়া ওঠে। সত্যকে রসের পথ দিয়া প্রবাহিত করাতেই কবির সার্থকতা। রসের মধ্যেও যে একটি জ্ঞানস্বরূপতা বিরাজ করে এবং জ্ঞানস্বরূপতার মধ্যে ও যে রস বিরাজ করে ইহা অভিনব অতি সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন। সেই জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার শৃঙ্গার রসের লক্ষণটির কিছু আলোচনা করা

যাইতে পারে। ভরত শৃঙ্গারের লক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যাহা উজ্জ্বলবেষাত্মক তাহাকেই শৃঙ্গার বলা হয়।—"শৃঙ্গারো নাম রতিঃ স্থায়িভাবপ্রভাবঃ উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ"। ইহার টীকা করিতে গিয়া অভিনব বলিয়াছেন যে স্ত্রীপুরুষের পরস্পরাভিলাষরূপ কামপ্রবৃত্তিকে শৃঙ্গার বা রতি বলে না। ইহা ব্যভিচারী ভাব মাত্র। কিন্তু প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মিলন ও বিরহে একরূপ পরিপূর্ণ সুখস্বভাবকে রতি কহে। যেখানে পরস্পরের মধ্যে একজ্ঞানাত্মক ভাব ও অমূলক ঐক্য এমন ভাবে প্রসূত হইয়া থাকে যাহার কখনও বিচ্ছেদ হয় না তাহাকেই রতি কহে—"একৈব হ্যসৌ তাবতী রতিঃ যত্র অন্যোন্যসংবিদৈক-বিয়োগো ন ভবতি।" পরস্পর জ্ঞানের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে ধ্যানরূপে বা সমাধিরূপে পরস্পরের যে অবস্থিতি তাহাই শৃঙ্গারের স্থায়িভাব বা রতি। বাহ্যিক মিলনেচ্ছা রতি নহে—"অবিযুক্তসংবিৎপ্রাণস্থঃ শৃঙ্গারঃ—পরস্পরজীবিতসর্ব্বস্বাভিমানরূপা বেষয়তি চিত্তবৃত্তিম্ অন্যত্র জ্ঞাপনয়া সংক্রাময়তীতি বেষো বিভাবানুভাবাত্মা।" অর্থাৎ একজন যেখানে অপরকে নিজের প্রাণস্বরূপ মনে করে এবং অপরের মধ্যে সেই ভাবকে সংক্রামিত করে তাহাই শৃঙ্গারের স্থায়ী ভাব বা রতি। এখানে দেখা যাইতেছে যে, যদিও শৃঙ্গারের মধ্যে পরস্পরের আস্বাদ আনন্দরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তথাপি সেই আস্বাদের মূল কেন্দ্রস্বরূপ রহিয়াছে জগতের একটি গভীর সত্য—আত্মার সহিত আত্মার মিলন. প্রাণের সহিত প্রাণের মিলন। বিভাবাদিও সেইজন্য বাহ্যবস্তু নহে, তাহারা আন্তর বস্তু। এই জন্য অভিনবের রসবাদকে idealism না বলিয়া উপায় নাই। সম্ভোগ বা বিপ্রলম্ভ উভয়স্থলেই আস্বাদনের মূলভূত কারণই স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের ঐক্য এবং বিশ্বাস। এই জন্য সম্ভোগের মধ্যেও বিপ্রলম্ভ আছে এবং বিপ্রলম্ভের মধ্যেও

সম্ভোগ আছে। সম্ভোগের সময় ভয় হয়, পাছে বিপ্রলম্ভ ঘটে, এবং বিপ্রলম্ভের মধ্যে উভয়ের চিত্তের সন্নিকর্ষই সম্ভব হয়। উজ্জ্বলবেষাত্মক শব্দটির মধ্যে উজ্জ্বল শব্দের অর্থ পরস্পর সন্নিকর্ষজনিত আস্বাদ এবং বেষ শব্দের অর্থ পরস্পরের মধ্যে তাহার ব্যাপ্তি। একই শৃঙ্গাররস নানাপ্রকার বিভাব-অনুভাবের মধ্য দিয়া নানা আস্বাদে আস্বাদিত হয়। কবি যে ভাবকে প্রকাশ করেন, নট তাহাই স্বকীয় কল্পনা দ্বারা স্বকীয় ব্যবহারের মধ্য দিয়া তাহার সাক্ষাৎকারের যে পরিচয় দেয় তাহাই অবিঘ্নিত ভাবে দর্শক তৎক্ষণাৎ উপভোগ করেন। অথচ এ ব্যাপারের মধ্যে ক্রিয়াদ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইতে গেলে সম্পাদিত কার্য্য যেমন ক্রিয়াকালকে অপেক্ষা করিয়া তাহার অবসানেই ঘটিয়া থাকে, এখানে সেরূপ কোনও কালাপেক্ষা নাই। যে মুহূর্ত্তে বিভাবাদি তাহার রসরূপে দর্শকের হৃদ্গত হয় সেই মুহূর্ত্তেই রসের সাক্ষাৎ ঘটে। বিভাবাদির সাক্ষাৎকারেই রসের সাক্ষাৎকার। "কবিনোপনিবদ্ধৈর্নটেন চ সাক্ষাৎকারকল্পতামানীতৈঃ সম্যগিত্যবিঘ্নভোগাত্মকসম্ভোগো রস উৎপদ্যতে ঝটিত্যেব। নহি গমনক্রিয়াবৎ পর্য্যন্তে রসনাক্রিয়া নিষ্পদ্যতে, অপিতু প্রথমে বাবসরে; স চ বিভাবসাক্ষাৎকারাত্মক এব।" ব্যভিচারী ভাবের সহিত স্থায়ীভাবের সম্পর্ক বলিতে গিয়া অভিনব বলিয়াছেন যে ব্যভিচারী ভাবগুলি বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় দ্রুতগতি প্রবাহিত হইয়া স্থায়ী ভাবের মধ্যে লয় পায় এবং তাহাদের বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে। তাহারা কখনও স্থির হইয়া থাকে না। অবশ্য মনোবৃত্তি হিসাবে কোন মনোবৃত্তি স্থির হইয়া থাকিতে পারে না এবং সেইজন্য স্থায়ী ভাবও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু স্থায়ী ভাবগুলি সংস্কাররূপে Subconscious mindএর মধ্যে নিরন্তর একজাতীয় প্রবাহের মধ্যে প্রবাহিত হয় বলিয়া তাহাকে সেই হিসাবে

স্থায়ী বলা যাইতে পারে। "এতে চ ব্যভিচারিণো বিদ্যুদুন্মেষনিমেষ-যুক্তেব স্থায়িসূত্রমধ্যে প্রকটয়ন্ত স্তিরোদধতশ্চ তদ্বৈচিত্র্যমাবহন্তি ন তু স্থিরাঃ। যদ্যপি স্থায্যপি ন স্থির স্তথাপি সংস্কাররূপতয়া ধারাবাহি-সজাতীয়প্রবাহতয়া চ স্থির এব।"

অভিনব যেরূপ একমাত্র রসকেই কাব্যের তাৎপর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর কেহই সেরূপ করেন নাই। তৎপরবর্ত্তীদের মধ্যেও অনেকে সম্পূর্ণভাবে অভিনবের মত গ্রহণ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ভামহ প্রভৃতিরা শব্দার্থের সাহিত্যকে কাব্য বলিয়াছেন। রুদ্রট বলিয়াছেন,—"ননু শব্দার্থং কাব্যম্" এই করিয়া শব্দ ও অর্থকে কাব্য বলিয়াছেন। কুন্তক বক্রোক্তিযুক্ত শব্দার্থের সাহিত্যকে কাব্য বলিয়াছেন। মম্মট বলিয়াছেন, সগুণ ও দোষবর্জ্জিত শব্দার্থ ই কাব্য। প্রতাপরুদ্র-যশোভূষণ ও বিদ্যাধর মোটামুটি মম্মটকেই অনুসরণ করিয়া "গুণালঙ্কারসহিতৌ শব্দার্থৌ দোষ-বর্জ্জিতৌ" এই লক্ষণ করিয়াছেন। বাগ্‌ভটও তাঁহার কাব্যানুশাসনে প্রায় ঐরূপই বলিয়াছেন,—"শব্দার্থৌ নির্দ্দোষৌ সগুণৌ প্রায়ঃ সালঙ্কারৌ চ কাব্যম্।" বামন বলিয়াছেন যে, রীতি কাব্যের আত্মা। দণ্ডী কাব্যের শরীরভূত শব্দের উপরেই বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। অগ্নিপুরাণেও অনেকটা দণ্ডীর মতই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ ও কেশবমিশ্র তাঁহার অলঙ্কারশেখর গ্রন্থে অভিনবকেই অনুসরণ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলে। কেশবমিশ্রও বলিয়াছেন,—রসই কাব্যের আত্মা। "অলঙ্কারস্তু শোভায়ৈ রস আত্মা পরে মনঃ।" ভোজ বলিয়াছেন,—

"নির্দ্দোষং গুণবৎ কাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্ব্বন্ কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ বিন্দতি।"

এখানেও মম্মটের দোষাভাব, গুণ ও অলঙ্কারকেই তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন, যদিও রসকে তিনি অস্বীকার করেন নাই এবং রসমাধুর্য্যের দ্বারাই যে কাব্য প্রীতি বর্দ্ধন করে তাহা স্বীকার করিয়া গৌণতঃ রসকে স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় রসকে প্রধান স্থান না দিয়া ঔচিত্যকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, লোকে রসকে কাব্যের আত্মা কহে, কিন্তু ঔচিত্যই রসের প্রাণ।

"ঔচিত্যস্য চমৎকারকারিণশ্চারুচর্ব্বণে।
রসজীবিতভূতস্য বিচারং কুরুতেঽধুনা॥
কাব্যস্যালমলঙ্কারৈঃ কিং মিথ্যাগণিতৈর্গুণৈঃ।
যস্য জীবিতমৌচিত্যং বিচিন্ত্যাপি ন দৃশ্যতে॥
অলঙ্কারাস্ত্বলঙ্কারা গুণা এব গুণাঃ সদা।
ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্॥"

অর্থাৎ অলঙ্কার, গুণ প্রভৃতির গণনার অবকাশ নাই; কারণ একমাত্র ঔচিত্যই কাব্যের জীবন-স্বরূপ। এই ঔচিত্যসম্বন্ধে আমরা পরে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ঔচিত্যের অর্থ propriety বা সদৃশতা। যাহার সহিত যাহা মেলে বা খাপ খায় তাহাকেই ঔচিত্য বলে। বিশ্বনাথ প্রধানতঃ ভরত ও অভিনবকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে তিনি মম্মটকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ লেখেন; তথাপি মম্মটকে কঠিন তিরস্কার করিতেও তিনি ছাড়েন নাই। মম্মটের লক্ষণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে কাব্য হইতে হইলেই যদি তাহা দোষরহিত হইতে হয়, তবে অনেক উত্তম কাব্যকেও দোষপ্রযুক্ত বলিয়া বর্জ্জন করিতে হয়। যদি বলা যায় যে কোনও একটি শ্লোকের মধ্যে যে অংশ অদুষ্ট তাহাকেই কাব্য বলিব, তবে একটি শ্লোকের মধ্যেই

কাব্য এবং অকাব্য উভয়ই পড়িয়া যায়। যথার্থভাবে রসকে দূষিত না করিলে দোষই হয় না। অতএব দোষ থাকিলেই কাব্য হইবে না একথা বলিলে কাব্য খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন হইবে।—"কিঞ্চ এবং কাব্যং প্রবিরলবিষয়ং নির্ব্বিষয়ং বা স্যাৎ সর্ব্বথা নির্দ্দোষস্য একান্তমসম্ভবাৎ।" মম্মটোক্ত অদোষ শব্দের অর্থ ঈষদ্দোষও বলা যায় না, কারণ কেহ যদি দোষবিহীন কাব্য লেখে তবে তাহাকে আর কাব্য বলা চলে না। গুণেরও পৃথক্ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কারণ গুণ রসেরই ধর্ম্ম,—রস না থাকিলে গুণ থাকে না। এই প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—"কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরং, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষবৎ, অলঙ্কারাশ্চ কটককুণ্ডলাদিবৎ।" অলঙ্কারশেখরে শৌদ্ধোদনী উক্তি বলিয়া কেশবমিশ্র যে বচনটি তুলিয়াছেন তাহা এই বচনটির একান্ত অনুরূপ। বিশ্বনাথ বক্রোক্তিকে অলঙ্কার মনে করিয়া 'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্' কুন্তকের এই লক্ষণকেও নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত ভোজের লক্ষণও নিন্দা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ধ্বনিকারের লক্ষণকেও নিরাকরণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ' এই উক্তি কেবলমাত্র রসধ্বনির স্থানেই স্বীকার করা যায়, বস্তু বা অলঙ্কারধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে তিনি অগ্নিপুরাণের মত উল্লেখ করিয়া সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

"বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্।" (অগ্নিপুরাণ) এইরূপে অন্য প্রধান প্রধান মতগুলির উল্লেখ করিয়া বিশ্বনাথ রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়াছেন,—"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্।"

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মম্মট যদিও কাব্য লক্ষণের মধ্যে রসকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই তথাপি দোষ গুণ, অলঙ্কারাদির আলোচনা করিতে

গিয়া তিনি বিশ্বনাথের ন্যায় রসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। দোষের লক্ষণ ধরিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—"মুখ্যার্থ ইতি দোষো রসশ্চ মুখ্যস্তদাশ্রয়াদ্বাচ্যঃ" অর্থাৎ মুখ্য অর্থের অপকর্ষক যাহা তাহাই দোষ। আর রসই কাব্যের মুখ্য অর্থ। রসকে আশ্রয় করিয়া যাহা থাকে তাহাকেই শব্দের অর্থ বলা যায়। অভিনব যেমন তাঁর ভারতী টীকাতে রসকে কাব্যের অর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এখানেও প্রকারান্তরে তাহাই বলা হইল; এবং 'মুখ্যার্থহতি র্দোষঃ' এই লক্ষণটি বিশ্বনাথের 'রসাপকর্ষকা দোষাঃ' এই লক্ষণের একান্ত অনুরূপই হইল। যে বাক্যে রস আছে তাহারই দোষ সম্ভব, যাহাতে রস নাই তাহার সম্বন্ধে কোন রসের আলোচনা হয় না, তাহা তুচ্ছ। অষ্টমে গুণের লক্ষণ দিতে গিয়াও মম্মট বলিয়াছেন যে, আত্মার যেমন শৌর্য্যাদিগুণ তেমনি রসের যে সমস্ত অঙ্গীভূত ধর্ম্ম অব্যভিচারী ভাবে তাহার উৎকর্ষ উৎপাদন করে তাহাকেই গুণ বলা যায়। "যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্ম্মাঃ শৌর্যাদয়ইবাত্মনঃ। উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুরচলস্থিতয়ো গুণাঃ ॥"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রীতিকে মম্মট অনেকটা গুণের মধ্যেই নিবিষ্ট করিয়াছেন। অলঙ্কারসম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, হারাদির ন্যায় শব্দার্থরূপ অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতে গিয়া যাহা মুখ্য রসের শোভা বর্দ্ধন করে তাহাকেই অলঙ্কার কহে।

"উপকুর্ব্বন্তি তং সন্তং যেঽঙ্গদ্বারেণ জাতুচিৎ।
হারাদিবদলঙ্কারাস্তেঽনুপ্রাসোপমাদয়ঃ ॥"

যে বাচ্যবাচকলক্ষণাঙ্গাতিশয়মুখেন মুখ্যং রসং সম্ভবিনমুপকুর্ব্বন্তি তে কণ্ঠাদ্যঙ্গানামুৎকর্ষাধানদ্বারেণ শরীরিণোঽপি উপকারকা হারাদয় ইব অলঙ্কারাঃ ॥"

বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন,—

"শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্ম্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ।
রসাদীনুপকুর্ব্বন্তোঽলঙ্কারাস্তেঽঙ্গদাদিবৎ ॥"

বলা বাহুল্য যে, বিশ্বনাথ এই সমস্ত বিষয়ে মম্মটেরই সরণী অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। তবেই দেখা যাইতেছে, যদিও মম্মট অদোষ ও গুণযুক্ত শব্দকেই কাব্য বলিয়াছেন তথাপি দোষ ও গুণের লক্ষণের মধ্যে রসকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন বলিয়া কাব্যলক্ষণের মধ্যে কাব্যার্থকে রস বলিয়া পরিগণনা করায় বাস্তবিক কাব্যলক্ষণের মধ্যে রসকেই প্রধানভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য, জগন্নাথ রসগঙ্গাধরে, বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে, মম্মট কাব্যলক্ষণের মধ্যে রসকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই এই যে দোষ দেওয়া হইয়া থাকে তাহা ঠিক বলিয়া বলা যায় না। কেশবমিশ্রও বলিয়াছেন "রস আত্মা ইত্যুক্তং। তস্য যথা আত্মানং বিনা শরীরমপ্রয়োজকং তথা রসং বিনা কাব্যমিত্যর্থঃ"।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা যে মত পর্য্যালোচনা করিলাম, তাহাতে সাহিত্যবিচারের প্রধান বিষয়ই রস। অভিনব প্রভৃতিরা বলিয়াছেন যে কাব্যের উদ্দেশ্যই রসকে অভিব্যক্ত করা। রস যদি সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত হয় এবং দোষাদিদ্বারা তাহা যদি গুরুতররূপে ব্যাহত না হয় এবং অলঙ্কারাদিদ্বারা যদি তাহা পরিপুষ্ট হয় তাহা হইলেই কাব্যের সফলতা হয়। যে বাক্যে রস নাই তাহাতে কাব্যত্ব নাই, কাজেই সেখানে দোষগুণালঙ্কারাদির আলোচনাও অনাবশ্যক।

বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্যদর্পণে বলিয়াছেন যে, যখন রজঃ ও তমঃ গুণ তিরোহিত হয় এবং সত্ত্ব গুণ উদ্রিক্ত হয় তখন হৃদয়ের চমৎকারিতা রূপ যে বিস্তার ঘটে তাহার ফলে কোন কোন প্রাক্তন পুণ্যশালীরা স্বপ্রকাশ, চিন্ময়, অখণ্ড, অন্য জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কবিহীন. লোকোত্তর-

চমৎকার-প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মাস্বাদতুল্য রসকে নিজের সহিত অভিন্ন ভাবে আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই সময়ে মন রজঃ ও তমঃ দ্বারা আক্রান্ত থাকে না এবং সেই জন্য স্বকীয় সত্বস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে। চমৎকার শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে চমৎকারিত্ব হৃদয়ের বিস্তার। হৃদয়ের বিস্তারকে বিশ্বনাথ অদ্ভুত বা wonder ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইংরেজীতে বলিতে গেলে আমরা হয়ত ইহাকে Sublimity বলিতে পারি। বিশ্বনাথের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত প্রকার রসাস্বাদের সময়েই তাহার প্রাণভূত হইয়া একটি চমৎকারিতা বা Sublimity থাকে। এই মর্ম্মে তিনি ধর্ম্মদত্তের গ্রন্থ হইতেও উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ॥"

চমৎকারিত্ব শব্দকে ইতিপূর্ব্বে কেহই অদ্ভুত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। কেহ বা চমৎকারিতাকে সৌন্দর্য্যাত্মক বিশিষ্ট বোধ বা aesthetic attitude, কেহ বা হৃদয়সংবাদজনিত হ্লাদ এই অর্থেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রস যে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর এবং আনন্দাত্মক আস্বাদের সহিত অভিন্ন (স্বাকারবদভিন্ন) ইহা বিশ্বনাথ মম্মট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মম্মট চমৎকার শব্দ আস্বাদ বা চর্ব্যমাণতা অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু সকল রসের মধ্যেই তাহার প্রাণস্বরূপ যে একটি অদ্ভুত বা বিস্ময়ের ভাব আছে তাহা তিনি কোথাও বলেন নাই। বিশ্বনাথের ব্যাখার সহিত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিদের ব্যাখ্যার একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে অভিনবগুপ্ত মম্মট প্রভৃতি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীরা রসের psychological ব্যাখ্যা দিতেই চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কোনও রূপ metaphysical ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নাই। মম্মট

অভিনবগুপ্তের অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, দর্শক বা পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ীভাব বাসনারূপে ব্যক্তিবিশেষ ও দেশকালাদিবিশেষের সহিত নিতান্ত personal ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সাধারণীকরণের দ্বারায় সেই সমস্ত ব্যক্তিত্ব বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধতারূপ যে সমস্ত বিঘ্ন রহিয়াছে তাহা হইতে একান্তভাবে নির্মুক্ত হইয়া সমস্ত বাধা বন্ধনের সীমা অতিক্রম করিয়া যখন সেই বাসনারূপে স্থিত স্থায়ী ভাবটি উন্মেষিত হইয়া আস্বাদিত হয় তখনই তাহাকে রস বলে। মম্মট অভিনবকে অনুসরণ করিলেও কোন কোন বিষয়ে একটু অন্যথাচরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অভিনব যেখানে বলিয়াছেন, 'হৃদয়-সংবাদেন' সেখানে মম্মট বলিয়াছেন 'সকল-সহৃদয়-সংবাদ-ভাজা।' দুইটি কথা এক নহে ; হৃদয়-সংবাদ অর্থে বুঝায় যে হৃদয়ের বাসনারূপ যাহা রহিয়াছে তাহার সহিত বিভাবাদি দ্বারা উপস্থাপিত কাব্যার্থের সাদৃশ্যময় একরূপতা। সংবাদ শব্দের অর্থ, এক জায়গায় যেরূপ দেখা যায় অন্য জায়গায় সেইরূপ দেখা—'একস্য দৃষ্টস্য অন্যত্র তথা দর্শনং সংবাদঃ।' 'সকল-সহৃদয়-সংবাদ-ভাজা' অর্থ এই যে রস সমস্ত সহৃদয় ব্যক্তির চিত্তেই একরূপে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু এই পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের মতে সীমাবদ্ধ বাসনার বন্ধনহীন অসীম সাধারণীভাবে স্ফুরণই রসাস্বাদের কারণ। এই ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণভাবেই মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ-মূলক বা Psychological কিন্তু বিশ্বনাথ বলেন যে সাধারণী বৃত্তিরূপে কাব্যার্থ উপস্থাপিত হইলে তাহার ফলে চিত্তের রজোগুণ ও তমোগুণ অভিভূত হওয়াতে চিত্ত চিন্ময় হইয়া ওঠে ও দুঃখ অভিভূত হইয়া সত্ত্ব গুণ উদ্রিক্ত হওয়াতে চিত্ত স্বপ্রকাশ ও আনন্দময় হইয়া দেখা দেয়। প্রকাশ ও আনন্দ উভয়েই সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণের প্রাচুর্য্যপ্রযুক্ত ইহা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারতুল্য একথা বলা হইয়াছে। বিষয়ের সম্পর্কে

যে জ্ঞান প্রকাশ পায় তাহা বিষয়ধর্ম্মী, জড়ধর্ম্মী এবং সেই জন্যই রজঃ ও তমোগুণের সহিত সংযুক্ত। কিন্তু বাহ্য বিষয়ের সহিত অসম্বদ্ধভাবে যাহা কেবলমাত্র সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করে তাহা বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য অর্থাৎ অন্য জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কবিহীনভাবে স্ফূর্ত্ত হইতে বাধ্য। রসাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে যদি রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া ওঠে তবে কাব্যরসাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্তবৃত্তি যে পবিত্র ও নির্ম্মল হইয়া ওঠে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। উপদেশ দিবার জন্য কবি কাব্য সৃষ্টি করেন না, মানুষের চিত্তকে পুণ্য পবিত্র করিবার জন্যও কবি কাব্যশিল্প রচনা করেন না। কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট কাব্য যদি রস উৎপাদন করিতে পারে তবে তাহার ফলে হৃদয়ে যে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয় তাহাতে আপনা হইতেই মানুষের চিত্ত রসসম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই বিধৌতপাপ হইতে থাকে। মম্মট কাব্যপ্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

> "কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
> সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে ॥"

কাব্য লিখিলে যশঃ হয়, অর্থ হয়, নানা সমাজের ব্যবহার জানা যায় ও পরমানন্দ লাভ করা যায় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে কান্তা যেমন আপন হাব ভাব ও বিক্ষেপাদির সৌন্দর্য্যের চাতুর্য্যের দ্বারা তাহার ভালবাসার পাত্রকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করে, কাব্যও তেমনি রসস্ফূর্ত্তি দ্বারা উন্নত চরিত্র প্রকাশ করিয়া তাদৃশ চরিত্রের প্রতি পাঠক বা দর্শককে আকৃষ্ট করিতে পারে। ভামহ বলিয়াছেন—

> "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
> প্রীতিং করোতি কীর্ত্তিঞ্চ সাধুকাব্যনিবন্ধনম্ ॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যেমন প্রথম মধু লেহন করিলে পরে কটু ঔষধও লোকে পান করে তেমনি কাব্যরসের সহিত মিশ্রিত হইলে লোকে শাস্ত্রপাঠ করিতেও প্রবৃত্ত হইতে পারে।

"স্বাদুকাব্যরসোন্মিশ্রং শাস্ত্রমপ্যুপযুজ্যতে।
প্রথমালীঢ়মধবঃ পিবন্তি কটুভেষজম॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এমন শব্দ নাই, এমন অর্থ নাই, এমন যুক্তি নাই, এমন কলা নাই, যাহা কাব্যের অঙ্গভূত হয় না।

"ন স শব্দো ন তদ্বাচ্যং ন স ন্যায়ো ন বা কলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গং অহো ভাবো মহান্ কবেঃ॥"

কাব্যের নানা চরিত্রাদি হইতে যে উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে ইহা ভামহের বাক্য হইতেও বুঝা যায়। ভরত বলিয়াছিলেন—

"দুঃখার্ত্তানাং শ্রমার্ত্তানাং শোকার্ত্তানাং তপস্বিনাং
বিশ্রান্তিজননকালে নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি॥
ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্।
লোকোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি॥"

অভিনব ইহার টীকায় বলিতেছেন যে, এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ইহা নহে যে নাট্য গুরুর ন্যায় উপদেশ দেয়, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি বর্দ্ধিত করিয়া তাহাদের প্রতিভার বৃদ্ধি করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, অভিনবের মতে কাব্য বা নাট্য কোন উপদেশ দেয় না কিন্তু প্রতিভা-বৃদ্ধি করিয়া গৌণভাবে বুদ্ধির বৈশদ্য উৎপাদন করিয়া তাহার নিজের মঙ্গলের দিকে তাহাকে ধাবিত করিতে সহায়তা করে। দণ্ডী, বামন, রুদ্রট, উদ্ভট প্রভৃতিরাও মুখ্যভাবে কাব্যের উপদেশকে কাব্যের উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। রাজশেখর বলিয়াছেন যে, কবি ত্রিবিধ

শৌচ অভ্যাস করিবেন। বাক্‌শৌচ অর্থাৎ বাক্যের পটুতা, নির্দোষতা ইত্যাদি, মনঃশৌচ অর্থাৎ মনের পবিত্রতা। রাজশেখর বলেন যে কবি যে স্বভাবের তাঁহার কাব্যও সেই স্বভাবেরই হইবে, চিত্রী যে স্বভাবের তাঁহার চিত্রও সেই স্বভাবেরই হইবে।

"স যৎস্বভাবঃ কবিস্তদনুরূপং কাব্যং।
যাদৃশাকারশ্চিত্রকর স্তাদৃশাকারমস্য চিত্রম্॥"

রুদ্রট, মম্মট প্রভৃতি কাব্যের যে উপদেশোপযোগিত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাহার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে কাব্য-নাট্যে অনেক সময় মহাপুরুষদের চরিত্র রস-প্রবণ ভাবে উপস্থাপিত হয় এবং তাহার ফলে পাঠক বা দর্শকের চিত্ত তাদৃশ চরিত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। বিদ্যানাথ তাঁহার প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ গ্রন্থে মম্মটকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"যদ্বেদাৎ প্রভুসম্মিতাদধিগতং শব্দপ্রধানাচ্চিরং
যচ্চার্থপ্রবণাৎ পুরাণবচনাদিষ্টং সুহৃৎসম্মিতাৎ।
কান্তাসম্মিতয়া যয়া সরসতামাপাদ্য কাব্যশ্রিয়া
কর্ত্তব্যে কুতুকী বুধো বিরচিতস্তস্মৈ স্পৃহাং কুর্ম্মহে॥"

তিনি আরও বলেন,—

"পরিবর্দ্ধতে বিজ্ঞানং সম্ভাব্যতে যশো বিসর্পন্তে গুণাঃ।
শ্রূয়তে সুপুরুষচরিতং কিন্তৎ যেন ন হরন্তি কাব্যালাপাঃ॥"

বিদ্যানাথ আরও বলেন যে, উত্তম পুরুষের চরিত্র বর্ণিত না হইলে সে কাব্য পরিত্যাজ্য। দণ্ডীও বলিয়াছেন,—

"আদিরাজ যশোবিম্বমাদর্শং প্রাপ্য বাঙ্ময়ং।
তেষামসন্নিধানেঽপি ন স্বয়ং পশ্য নশ্যতি॥"

নল-নহুষাদির স্থায় বড় বড় রাজার চরিত্রকে যে কাব্য প্রতিবিম্বিত করে তাহাদের কখনও বিনাশ হয় না। প্রতিপাদ্য বস্তুর মাহাত্ম্য দ্বারাই যে কাব্যের মাহাত্ম্য হয় তাহা ভামহও স্বীকার করিয়াছেন। ভামহ বলেন,—

"উপশ্লোক্যস্থ মাহাত্ম্যাদুজ্জ্বলাঃ কাব্যসম্পদঃ।"

উদ্ভট বলেন যে, কাব্যের আশ্রয়-সম্পত্তির দ্বারাই কাব্যের মহত্ত্ব সাধিত হয়।

"কাব্যমাশ্রয়সম্পত্ত্যা মেরুমেবামরদ্রুমঃ"

রুদ্রটও বলিয়াছেন,—

"উদারচরিতনিবন্ধনা প্রবন্ধপ্রতিষ্ঠা।"

ভোজ বলিয়াছেন যে, লোকোত্তর চরিত্র বর্ণনা করিলে অল্পশক্তি-সম্পন্ন কবিরও কাব্য আদৃত হয়।

"কবেরল্পাপি বাগ্‌বৃত্তির্বিদ্বৎকর্ণাবতংসতি।
নায়কো যদি বর্ণ্যেত লোকোত্তরো গুণোত্তরঃ॥"

বিদ্যাধর তাঁহার একাবলীতেও লিখিয়াছেন,—

"ধ্বনিপ্রধানং কাব্যং তু কান্তাসম্মিতমীড়িতম্।"

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন আলঙ্কারিকদের অনেকেই কাব্যের উপদেশোপযোগিত্ব কাব্যবর্ণিত বস্তু-মাহাত্ম্য ও চরিত্র-মাহাত্ম্যের উপরেই প্রধান ভাবে নির্ভর করে বলিয়া মনে করেন।

বিশ্বনাথ রসকে স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া করুণ রসের প্রশ্ন তুলিয়া বলিয়াছেন যে, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস প্রভৃতি রসে যে সুখানুভব হয় তাহা সহৃদয় দর্শকেরা সকলেই জানেন। যদি ঐ জাতীয় রসাস্বাদের সময় দুঃখ অনুভূত হইত তবে উহার

আস্বাদের জন্য কেহ উন্মুখ হইত না, এবং রামায়ণাদি শ্রবণের জন্য কেহ ব্যাকুল হইত না।

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥
কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ॥"

করুণ-রসে দ্রাবিত হইলে দর্শকের যে অনেক সময় অশ্রুজল পড়ে তাহার কারণ দুঃখানুভব নহে। চিত্ত রসে বিগলিত হইলে তাহার ফলেও চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত ঘটিতে পারে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে অভিনব-গুপ্ত নাট্যসূত্রের ব্যাখ্যাতে কি উপায়ে কাব্য বা নাট্যরসের সহিত লৌকিক ভয়াদি অনুভবের পার্থক্য সংস্থাপন করিয়াছেন। উভয়স্থলে মনোবৃত্তির কি প্রকার পার্থক্য (psychological difference) ঘটে তাহা অভিনব অতি নিপুণ ভাবে দেখাইয়াছেন। কিন্তু বিশ্বনাথ সে পদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। তিনি সত্ত্বোদ্রেকের ফলে রস অভিব্যক্ত হয় এই কথা বলিয়াছেন। এই জন্যই দুঃখ-কারণ হইতে সুখোৎপত্তি কি করিয়া হইতে পারে এই তথ্যের কোনও যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, লৌকিক শোকহর্ষাদি কারণ হইতে যে তৎসদৃশ লৌকিক শোকহর্ষাদি উৎপন্ন হয়, ইহা যেমন সংসারের নিয়ম, কাব্য জগতে অলৌকিক বিভাবাদি দ্বারা যে সর্ব্বত্রই সুখ উৎপন্ন হয় ইহাও তেমন একটি নিয়ম।—"অতশ্চ লৌকিকশোক-হর্ষাদিকারণেভ্যো লৌকিকশোকহর্ষাদয়ো জায়ন্তে ইতি লোকে এব প্রতিনিয়মঃ, কাব্যে পুনঃ সর্ব্বেভ্যো বিভাবাদিভ্যঃ সুখমেব জায়তে ইতি নিয়মান্ন কশ্চিদ্দোষঃ।" কিন্তু এই নিয়মের প্রতি কারণ কি তাহা বিশেষ করিয়া তিনি ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। বিভাবাদি ব্যাপার সম্বন্ধেও বিশ্বনাথের মতের সহিত অভিনবের মতের পার্থক্য দেখা যায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিভাবাদি ব্যাপারে যে সাধারণীকরণ হয় তাহার অর্থ বুঝাইতে গিয়া অভিনব বলিয়াছেন যে সাধারণীকরণ অর্থ এই যে, লৌকিক জগতের সহিত সম্বন্ধবিহীন ভাবে, দেশ-কালাদিসম্বন্ধবিহীন ভাবে এবং কোনও ব্যক্তিবিশেষের অনুভব-সম্পর্কবিহীন ভাবে কেবল যে বিভাবাদিবর্ণিত ব্যাপারের সাধারণ ভাবে চিত্তে প্রতিবিম্বন তাহারই নাম সাধারণীকৃতি। কিন্তু বিশ্বনাথ বলেন যে, যে নায়ক সম্বন্ধে বিভাবাদি বর্ণিত হয়, দর্শক বা পাঠক তাহার সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করিয়া তদীয় বিভাবাদিকে আপন বিভাবাদি মনে করিয়া তাহা হইতে রস অনুভব করেন। নায়কবর্ণিত বিভাবাদিকে যে কোনও ব্যক্তি যে আপন বিভাবাদিরূপে ব্যবহার করিতে পারে ইহাই বিভাবাদির সাধারণী-করণরূপ ব্যাপার।

> "ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদে র্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ।
> তৎপ্রভাবেণ যস্যাসন্ পাথোধিপ্লবনাদয়ঃ॥
> প্রমাতা তদভেদেন স্বাত্মানং প্রতিপদ্যতে।
> উৎসাহাদিসমুদ্বোধঃ সাধারণ্যাভিমানতঃ॥"

কিন্তু নায়কবর্ণিত বিভাবাদি যদি পাঠক বা দর্শক স্বকীয় বিভাবাদি-রূপে মনে করেন তাহা হইলে তাহার ফলে লৌকিক হর্ষ, শোক, ব্রীড়া, আতঙ্ক প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে এই ভয়ে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সাধারণী-করণকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, বিভাবাদি-জনিত যে রসাস্বাদ হয় তাহা নায়কের হইয়াও যেন নায়কের নয়, দর্শকের বা পাঠকের হইয়াও যেন তাহার নয়। স্বগতত্ব বা পরগতত্বরূপ কোন বন্ধনই যেন তাহার ভিতরে নাই।

"পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিশ্বনাথ পূর্ব্বশ্লোকে সাধারণীকরণ অর্থ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'পরস্য ন পরস্যেতি' শ্লোক তাহারই বিরোধিতা করিতেছে। যদি দর্শক বা পাঠক কাব্য বা নাট্যবর্ণিত নায়কের সহিত আপনাকে অভিন্নই মনে করে এবং সেই জন্যই যদি তদ্গত ব্যভিচারী ভাবগুলি তাহার চিত্তে উদ্ভূত হয় তবে তাহাত' তাহার স্বগত লৌকিক ভাবের তুল্যই হইল। তবে তাহা কিরূপে স্বগতত্ব ও পরগতত্ব এই উভয়বিলক্ষণরূপে প্রতীত হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বনাথের একমাত্র উত্তর এই যে, বিভাবাদির অলৌকিকত্ব-প্রযুক্তই এইরূপ ঘটিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, নায়কের চরিত্রের সহিত দর্শক বা পাঠক যখন আপনাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন তাহার ফলে রসাস্বাদ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, এবং তাহা যখন পরে পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে তখন তাহা স্বগত-পরগতত্বাদিবিলক্ষণরূপে আপনাকে প্রকাশ করে। যদিও বিভাব অনুভাবাদি সমস্তগুলি একত্র হইয়া রসবোধ উৎপন্ন করে, তথাপি কোনও কোনও স্থলে কেবলমাত্র তাহার কোনও একটি বর্ণনা দ্বারা অপরগুলি আক্ষিপ্ত হইয়া তাহার সহিত যুক্ত হয় এবং রস উৎপাদন করে। অভিনবের ন্যায় বিশ্বনাথও বলিয়াছেন যে, অনুকরণের দ্বারা রস উৎপন্ন হয় না। রস জ্ঞাপ্যও নহে কার্য্যও নহে। রস নিত্যও নহে, নির্ব্বিকল্পও নহে, সবিকল্পকও নহে, পরোক্ষও নহে, অপরোক্ষও নহে, এই জন্যই তাহাকে অলৌকিক বলিতে হয়। রসের একমাত্র প্রমাণ তাহার আস্বাদ। ভরত যে তাঁহার নাট্যসূত্রে নিষ্পত্তি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থ চর্ব্বণা। নিষ্পত্তি শব্দ যদিও কার্য্যবাচী তথাপি এখানে

তাহা গৌণ অর্থে ব্যবহার হইয়াছে এবং নিষ্পত্তি শব্দের যথার্থ তাৎপর্য্য আস্বাদন। রসকে কি হিসাবে স্বপ্রকাশ ও অখণ্ড বলা যায়? বিভাবাদির মিলনের ফলে যদি রস উৎপন্ন হয় তবে তাহা অখণ্ডও নহে, স্বপ্রকাশও নহে। ইহার উত্তরে বিশ্বনাথ বলেন, যে রতিপ্রভৃতি স্থায়ী ভাব ও তাহার প্রকাশ অভিন্ন; তাহার প্রকাশ ছাড়া তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। রস সর্ব্বদা অনুভূত হয় না, কোনও সময়ে কোনও বিশেষ অবস্থায় তাহা উৎপন্ন হয়। এইজন্য যদিও তাহাকে কার্য্য বলিতে হয় তথাপি তাহা যথার্থ কার্য্য নহে। দর্শক ও পাঠকের প্রাক্তন এবং ইদানীন্তন বাসনার পরিণতিরূপে তাহার প্রকাশ হয়—এই মাত্র বলা যায়। রসাদি আস্বাদ যে স্বপ্রকাশস্বরূপ এ সম্বন্ধে বিশ্বনাথ নিজে কোনও যুক্তি না দিয়া বলিয়াছেন যে ইহা বেদান্তসিদ্ধান্ত এবং ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে বেদান্তীরাই তাহার জবাব দিবেন। বিভাবাদি যদিও প্রথমতঃ খণ্ডশঃ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুভূত হয় তথাপি তাহারা যখন একত্রিত ভাবে স্ফূর্ত্ত হয় তখনই তাহা রসরূপে আস্বাদিত হয়। বেদান্তের ব্রহ্মের ন্যায় রসের আস্বাদ অখণ্ড। বিভাবাদির বৈশিষ্ট্যপ্রযুক্ত রসের বৈশিষ্ট্য হয় এইজন্য বিশ্বনাথ নানাবিধ বিভাব ও নানাবিধ নায়ক-নায়িকা ও তাহার বিভিন্ন প্রকারের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

কবি কর্ণপূর রসের লক্ষণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্।
সকারণাদিসংশ্লেষে চমৎকারি সুখং রসঃ॥"

অর্থাৎ যখন চিত্ত কাব্যবর্ণিত বিভাবাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে এবং বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় ও তদতিরিক্ত সমস্ত বিষয়কে নিরুদ্ধ করিয়া দেয়, তখন যে চিত্তের একটি চমৎকারজনক সুখ ঘটে তাহার নাম রস। কর্ণপূর বলেন যে ভক্তদিগের চিত্তেই এইরূপ রস স্বতঃসিদ্ধ।

কাব্যাদিস্থলে সহৃদয় ব্যক্তিদের চিত্তে সর্বরসের অভিব্যঞ্জন করিতে পারে এমন একটি সর্ব্বরসাস্বাদের মূলভূত চিত্তের ধর্ম্ম আছে—যাহাকে স্থায়ীভাব বলা যায়। রস আনন্দস্বভাব বলিয়া ইহা একরূপ। নানাবিধ উপাধিভেদে তাহাকে নানারূপে দেখা যায়। সূর্য্যের রশ্মি যেমন এক হইয়াও নানা স্থানে প্রতিফলিত হইয়া নানারূপ উৎপন্ন করে, তেমনই একই রস নানা উপাধিভেদে নানাভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রাকৃত লোকের মধ্যে যে শৃঙ্গারাদির বর্ণনা দেখা যায় তাহার আস্বাদ প্রাকৃত রস; অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণরাধাদিনিষ্ঠ রসকে অপ্রাকৃত রস বলা যায়। অপ্রাকৃত রসস্থলে পরোঢ়রমণী-রতি প্রভৃতি যাহা প্রাকৃত রসে রসাভাস বলিয়া পরিগণিত হয় তাহাই সর্ব্বোত্তম কারণ, সেখানে আলম্বন প্রভৃতি সমস্তই অলৌকিক। ব্রজ-বধূদিগের চিত্ত প্রথম হইতেই স্বপতিবিমুখ এবং একান্তভাবে কৃষ্ণগত বলিয়া তাহাদের চিত্ত কেবলমাত্র অনুরাগকেই অনুভব করিত, এইজন্য তাহাকে অশুদ্ধ বলা যায় না। কর্ণপূর বাৎসল্যরস ও ভক্তিরসকে পরিগণনা করিয়া দশটি রস স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি প্রেমরস বলিয়া একটি স্বতন্ত্ররসও স্বীকার করিয়াছেন যাহা কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের মধ্যেই পাওয়া যায়। শৃঙ্গার রস হইতে এই রসের পার্থক্য এই যে শৃঙ্গারে প্রেম অঙ্গ, অঙ্গী শৃঙ্গার, অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে নায়িকা-জনোচিত অভিলাষাদিই প্রধান, কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রেম গৌণ। আর প্রেমরসে আধ্যাত্মিক প্রেমই প্রধান, অভিলাষাদি গৌণ।

> "প্রেয়াংস্তেঽহং ত্বমপি চ মম প্রেয়সীতি প্রবাদ-
> স্ত্বং মে প্রাণা অহমপি তবাস্মীতি হন্ত প্রলাপঃ।
> ত্বং মে তস্যাহমিতি চ যত্তচ্চ নো সাধু রাধে
> ব্যাহারে নৌ ন হি সমুচিতো যুষ্মদস্মৎপ্রয়োগঃ॥"

প্রেমরস ছাড়া কর্ণপূর ভক্তিরস নামে স্বতন্ত্র রস স্বীকার করিয়াছেন। কবি কর্ণপূর সাধারণতঃ অনেক স্থলে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথকেই অনুসরণ করিয়াছেন, যদিও স্থানে স্থানে বিভিন্ন মতও প্রকাশ করিয়াছেন। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য না বলিয়া কবিকৃত বিচিত্র শিল্পকে তিনি কাব্য বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই লক্ষণ করিলে কাব্যপ্রকাশের "অদোষৌ শব্দার্থৌ" ইত্যাদি লক্ষণের কোন প্রয়োজন হয় না। কবিকৃত অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনার মধ্যে দোষের বাহুল্য বা গুণের অভাব থাকিতে পারে না। অদোষ শব্দার্থকে কাব্য বলিতে গেলে 'কুরঙ্গনয়না' এ পদটিও কাব্য হয়। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলিতে গেলে—'গোপীভিঃ সহ বিহরতি হরিঃ' এই বাক্যেরও কাব্যত্ব হয়। তিনি বলেন যে বাক্য না হইলেও কাব্য হইতে পারে। যেমন—

"কূর্ম্মলোমপটচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গধনুর্দ্ধরঃ।
এষ বন্ধ্যাসুতো ভাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ॥

যোগ্যতা নাই বলিয়া এই শ্লোকের শব্দনিচয়ের বাক্যত্ব নাই তথাপি ইহার কাব্যত্ব আছে। বামন বলিয়াছেন রীতিই কাব্যের আত্মা—তাহাও ঠিক নয়। কারণ রীতি কাব্যের বাহ্যগুণ মাত্র। রীতিমাত্রকে কাব্য বলিলে গুণালঙ্কাররহিত সদোষ অথচ রীতিমান্ বাক্যকে কাব্য বলিতে হয়। এইজন্য কবিবাঙ্‌নির্ম্মিতিই কাব্য এই কথা বলিতে হয়। তিনি আরও বলেন যে ধ্বনি কবিবাঙ্‌নির্ম্মিতিরূপ কাব্যের প্রাণ আর শব্দ ও অর্থ তাহার শরীর। প্রাক্তন সংস্কারই কাব্যের বীজ। এই বীজ আপনাকে দুইভাবে প্রকাশ করে। নব-নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা দ্বারা কাব্যনির্ম্মাণশক্তিরূপে ইহা আপনাকে প্রকাশ করে কিম্বা কাব্য আস্বাদনের যোগ্যতারূপে আপনাকে বিকশিত

করে। কাব্যের ফল কেবলমাত্র যশ অর্থপ্রাপ্তি ইত্যাদি নহে কিন্তু কৃষ্ণের গুণ, লাবণ্য, কেলি প্রভৃতি বর্ণনের সময় চিত্তাভিনিবেশ দ্বারা গভীর আনন্দলাভ এবং পাঠকদের চিত্তে তাদৃশ আনন্দের আস্বাদ।

"যশঃ প্রভৃত্যেব ফলং নাস্ত কেবলমিষ্যতে।
নির্ম্মাণকালে শ্রীকৃষ্ণগুণলাবণ্যকেলিষু॥
চিত্তস্যাভিনিবেশেন সান্দ্রানন্দালয়স্ত যঃ।
স এব পরমো লাভঃ স্বাদকানাং তথৈব সঃ॥"

কর্ণপূর একদিকে রসের স্থায়ী ভাবকে নিত্য বলিয়াছেন ও অপরদিকে তাহার পরিণাম স্বীকার করিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণের যেরূপ বাল্য, কৈশোর, পৌগাণ্ডাদি অবস্থা নিত্যকাল বিদ্যমান থাকিলেও ভক্তের দর্শনোৎকণ্ঠা ও জগদুদ্ধারাদি প্রয়োজনের জন্য সেই সমস্ত অবস্থা কোন কোন সময় প্রকট হয়, কখনও অপ্রকট হয়, সেইরূপ বিভাবাদির দর্শনেও সেই সব ভাব কখনও প্রকট হয়, তাহার অদর্শনে আবার অপ্রকট হয়। প্রাকৃত রসস্থলে স্থায়ী ভাব, বিভাবাদির সহযোগে পূর্ব্বদশা পরিত্যাগ করিয়া রসরূপে প্রকাশিত হয়। অপ্রাকৃতস্থলে অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা পূর্ব্বদশা পরিত্যাগ না করিয়াই পরিণামজ রূপকে প্রকটিত করে। কারণ এস্থলে পরিণামী ও পরিণামজ রূপ উভয়ই নিত্য। কর্ণপূর আরও বলেন যে, স্থায়ীভাব সমবায়ী কারণ এবং বিভাবাদি তাহার নিমিত্ত কারণ। স্থায়ী ভাবের মধ্যে যে জাতীয় বিকার ঘটিলে রসের অভিব্যক্তি হয় তাহাই অসমবায়ী কারণ। বিভাবাদি বা স্থায়ী ভাবের অন্তর্নিহিত বিকারবিশেষ রসের প্রতি কারণ নহে, কিন্তু রসের অভিব্যক্তির প্রতি কারণ। স্থায়ী ভাব বলিতে রজস্তমোরহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপে বিদ্যমান চিত্তের একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম বোঝা যায়। এই শুদ্ধসত্ত্বরূপ অবস্থা

অবিদ্যারহিত চিদ্রূপ এবং হ্লাদিনী শক্তির আনন্দাত্মক মূর্ত্তিরূপ। এই চিদ্রূপ ধর্ম্মটি নানা উপাধিভেদে ও সঙ্গবৈচিত্র্যে করুণ, শৃঙ্গার, বীর প্রভৃতি নানা ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। কৃষ্ণানুগত সাধকদের এই স্থায়ী ভাবের আস্বাদ নিত্য এবং তাহা কোনও কারণকে অপেক্ষা করে না। কিন্তু প্রাকৃত সহৃদয় পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন কারণ-যোগে ইহার রসাভিব্যক্তিরূপে প্রকাশ দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কর্ণপূর দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য উভয় স্থলেই এগার প্রকার রস স্বীকার করিয়াছেন। আটটি পূর্ব্বস্বীকৃত নাট্যরস, বিশ্বনাথ-স্বীকৃত শান্তরস ও ভোজস্বীকৃত বৎসলতা ও প্রেমরস। ইহা ছাড়া ভক্তিরসকেও স্বতন্ত্র রস বলিয়া কর্ণপূর স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিশ্বনাথের ন্যায় কর্ণপূরও চমৎকারিত্বকেই রসের সার বলেন। চমৎকারিত্ব অর্থ হৃদয়ের বিস্তার বা অদ্ভুততা। নাট্যদর্শনকালে যে রসোদ্বোধ হয় তাহার কারণ অনুকরণ নহে। কিন্তু চিত্রোৎকীর্ণ প্রতিমাদিকে যেরূপ রামসীতা বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ সম্যক্-মিথ্যাসংশয়সাদৃশ্যপ্রত্যয়াতিরিক্ত একটি অনির্ব্বচীয় প্রত্যয়বিশেষ দ্বারা কৃত্রিম বিভাবাদিতে অকৃত্রিমবৎ প্রতীতি হওয়াতে সহৃদয়দিগের চিত্তে আনন্দ উৎপন্ন হয়। এখানে তিনি শ্রীশঙ্কুকের মত অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীশঙ্কুকও বলিয়াছেন,—"সম্যঙ্-মিথ্যাসংশয়সাদৃশ্যপ্রতীতিভ্যো বিলক্ষণা চিত্রতুরগাদিন্যায়েন যঃ সুখী রামঃ অসৌ অয়মিতি প্রতীতিরস্তি।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত রসের কেন্দ্র। তথাপি শৃঙ্গাররূপেতেই তাঁহার প্রধান আবির্ভাব। নায়ক-নায়িকার অবস্থাকৃত ভেদ অনুসারে কর্ণপূর বহুবিধ রসাস্বাদের বর্ণনা করিয়াছেন।

উজ্জ্বলনীলমণিকার রূপগোস্বামী ও তদীয় টীকাকার জীবগোস্বামী

ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন যে, মধুর রসেই ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠ স্বাদ এবং অনেক ভক্তেরা যদিও শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদিকে ভক্তি বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং তজ্জন্য উন্মুখ হন, তথাপি মধুর বা উজ্জ্বলরসকে তাঁহারা কামাভিব্যক্তি মনে করিয়া তাহা হইতে বিমুখ হন। এই উজ্জ্বলরসের রহস্য প্রকাশ করিবার জন্যই উজ্জ্বলনীলমণি লেখা হইয়াছে। অপ্রাকৃত নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ইহার আলম্বন। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে নায়ক নায়িকা বিভিন্ন অবস্থায় ও নায়ক নায়িকার স্বভাবভেদে শৃঙ্গার রসের নানাবিধ বিচিত্র আস্বাদ অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় ঔচিত্যকেই রসের প্রাণস্বরূপ বলিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে উচিত স্থানে বিন্যাস করিলেই অলঙ্কার দেহকে অলঙ্কৃত করিতে পারে। এবং উচিত স্থান হইতে চ্যুত হইলে গুণকেও গুণ বলা যায় না। কণ্ঠে মেখলা পরিলে কিম্বা নিতম্বে হার পরিধান করিলে সে অলঙ্কারের মর্য্যাদা থাকে না। শৌর্য্য গুণ বটে কিন্তু ভীত বা প্রণত ব্যক্তির প্রতি শৌর্য্য-প্রকাশ হাস্যকর। যাহার সহিত যাহা খাটে তাহাকেই তাহার উচিত বলা হয়। ঔচিত্য অর্থে অনুরূপতা বা সামঞ্জস্য। "যৎ কিল যস্য অনুরূপম্ তদুচিতমুচ্যতে তস্য ভাবমনুরূপম্।" যে পদ যেখানে প্রয়োগ করিলে সমগ্র অর্থের সঙ্গে খাটে সেইরূপ পদই সেইখানে প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন—

"মগ্নানি দ্বিষতাং কুলানি সমরে ত্বৎখড়্গধারাকুলে
নাথাস্মিন্নিতি বন্দীবাচি বহুশো দেব শ্রূয়তাং পুরা ?
মুগ্ধা গুর্জরভূমিপালমহিষী প্রত্যাশয়া পাথসঃ
কান্তারে চকিতা বিমুঞ্চতি মুহুঃ পত্যুঃ কৃপাণে দৃশৌ ॥"

পাণ্ডিত্যের সহিত উন্নত চরিত্র যেমন শোভা পায় তেমনই কোনও

মহাবাক্যের মধ্যে বাক্যগুলি যদি এভাবে রচিত হয় যাহাতে বর্ণনীয় বিষয়কে সমুচিত ভাবে সপ্রাণ করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলেই তাহাকে বাক্যের ঔচিত্য বলা যাইতে পারে। যথোপযুক্ত বিশেষণ দিলে প্রবন্ধের ঔচিত্য সাধিত হয়। যক্ষ মেঘকে দৌত্যে পাইবার প্রার্থনা করিবার সময় 'জাতং বংশে ভুবনবিদিতে' প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণের বর্ণনা করিয়াছিলেন। রসের উপযুক্ত বাক্যবিন্যাসকে গুণৌচিত্য বলে। এইরূপ রসানুকূল বা অর্থানুকূল পদকেই অলঙ্কারৌচিত্য কহে। এইরূপ রসৌচিত্য বর্ণনা করিতে গিয়া কোন্ রসের সহিত কোন্ রসের মিলন কি অবস্থায় সম্ভবপর তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্র এইরূপ কারকৌচিত্য, লিঙ্গৌচিত্য, বচনৌচিত্য, বিশেষণৌচিত্য, উপসর্গৌচিত্য, নিপাতৌচিত্য, কালৌচিত্য, দেশৌচিত্য, কুলৌচিত্য, ব্রতৌচিত্য, তত্ত্বৌচিত্য, অভিপ্রায়ৌচিত্য, স্বভাবৌচিত্য, সারসংগ্রহৌ-চিত্য, প্রতিভৌচিত্য, অবস্থৌচিত্য, নামৌচিত্য প্রভৃতি বহুবিধ ঔচিত্যের আলোচনা করিয়াছেন। ভামহ হইতে আরম্ভ করিয়া দণ্ডী, বামন প্রভৃতি সকলেই ঔচিত্যকে কাব্যের একটি প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কুন্তকও ঔচিত্যকে একটি প্রধান স্থান দিয়াছেন। ভামহ বলিয়াছেন,—

> 'মালাকারো রচয়তি যথা সাধু বিজ্ঞায় মালাং
> যোজ্যং কাব্যেষ্ববহিতধিয়া তদ্বোধে বাভিধানম্।'

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

> "দেশকালকলালোকন্যায়াগমবিরোধি চ।
> প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টান্তহীনং দুষ্টঞ্চ নেষ্যতে॥"

কিন্তু ইহারা কেহই ঔচিত্যকে রসের প্রাণস্বরূপ বলিয়া বলেন নাই। কুন্তক ঔচিত্যকে বক্রোক্তির একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার

করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঔচিত্যহানি হইলে রসের অপকর্ষ ঘটে ; কিন্তু তাই বলিয়া ঔচিত্যকে রসের প্রাণ বলা যায় না। কিন্তু একথা স্বীকার করা যায় না যে, ঔচিত্য-বোধটি সৌন্দর্য্যবোধের একটি প্রধান অঙ্গ। কোন্ রেখার সহিত কোন্ রেখা মিলিত হইলে কিংবা কোন্ বর্ণের সহিত কোন্ বর্ণ মিলিত হইলে, কিংবা চিত্রে অঙ্কিত কিরূপ পুরুষের কিরূপ বিন্যাস হইলে তাহা সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় তাহা বাহ্য যুক্তির দ্বারা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। শিক্ষিত চিত্রীর কাছে সেই ঔচিত্য আপনিই প্রতিভাত, এবং সেই ঔচিত্যের হানি হইলে কোন বস্তুই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় না। বস্তুতঃ রসোৎপত্তি-স্থলেও বিভাবাদির যথাযথ সন্নিবেশ না হইলে চিত্ত ধাতুতে উপস্থাপিত হইয়া তাহার হৃদয়-সংবাদ উৎপন্ন করিতে পারে না। উপস্থাপিত বস্তুর সহিত ইদানীন্তন বা প্রাক্তন বাসনার অনুরূপতা না থাকিলে হৃদয়-সংবাদ থাকিতে পারে না ও রসও উৎপন্ন হইতে পারে না। অবশ্য ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যকে এই ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই; কিন্তু পরম্পরাভাবে বিভিন্ন আলঙ্কারিকেরা ঔচিত্য যে ভাবে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন তাহা একত্র করিয়া দেখিলে মনে হয় যে ব্যাপক ভাবটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া দেখিলে ঔচিত্যকে কাব্যের একটি essential condition বা জনকীভূত কারণ বলিয়া বলা যাইতে পারে।

জগন্নাথ পণ্ডিত তাঁহার রসগঙ্গাধর গ্রন্থে কাব্যের লক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক শব্দকে কাব্য বলে। রমণীয়তা অর্থ—লোকোত্তরাহ্লাদজনক জ্ঞানগোচরতা। লোকোত্তর শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জগন্নাথ বলিয়াছেন যে, যে জাতীয় আহ্লাদের মধ্যে একটা বিশেষ চমৎকারিত্ব থাকে, যাহা কেবলমাত্র রসজ্ঞের

অনুভবের দ্বারা অনুভূত হয় এবং যাহাকে অপর সকল প্রকার আহ্লাদ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করা যায়। এই জন্য এই চমৎকারিত্বকে তিনি একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সাধারণ লৌকিক বাক্যের দ্বারা যে আনন্দ হয় তাহাতে এতাদৃশ লোকোত্তরত্ব নাই; এইজন্য তাদৃশ বাক্যকে কাব্য বলা যায় না। এই চমৎকারিত্বের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া জগন্নাথ বলিয়াছেন যে, কোন কাব্যের স্বাদ গ্রহণের সময় চমৎকারিত্বজাতীয় চিত্তের যে একটি বিশেষ অবস্থা ঘটে, অর্থাৎ অন্তর্হৃদয়েরও প্রকাশমান চিত্তের একীকরণরূপ বা অনুসন্ধানরূপ যে একটি বিশেষ মনের অবস্থা তাহারই ফলে ইহা স্ফুট হইয়া উঠে। "কারণঞ্চ তদবচ্ছিন্নে ভাবনাবিশেষঃ পুনঃপুনরনুসন্ধানাত্মা।" ফল কথা এই যে, জগন্নাথের মতে চমৎকারিত্ব-বত্বই কাব্যত্ব। চমৎকার শব্দে জগন্নাথ আহ্লাদ বা আনন্দমাত্র বোঝেন না; কিন্তু কাব্যের আহ্লাদে যে একটি সৌন্দর্য্যরূপ বাসনার সহিত স্ফুট চিত্তের মিলনজনিত এক দুর্ব্যাখ্যেয় অনুভূতি আছে তাহাকেই তিনি চমৎকার শব্দের দ্বারা লক্ষিত করিতে চাহিয়াছেন। মম্মটের 'অদোষৌ সগুণৌ সালঙ্কারৌ শব্দার্থৌ কাব্যং' এই লক্ষণের বিচার করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে শব্দার্থ উভয়কে কাব্য বলার হেতু নাই, কেবলমাত্র শব্দকেই কাব্য বলা যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, আস্বাদের বা রসের উদ্বোধক হইলেই তাহাকে কাব্য বলা যায় একথাও ঠিক নহে। কারণ, নটের বিবিধ হাবভাব, অঙ্গবিকারও রসের উৎপাদন করে, তাই বলিয়া তাহাকে কাব্য বলা যায় না। শব্দ এবং অর্থ এই উভয়ের যদি পৃথক্ পৃথক্ কাব্যত্ব মানিতে হয় তবে একটি পদ্যের ভিতরেই দুইটি কাব্য মানিতে হয়। দোষরাহিত্য বা গুণশালিত্ব কাব্যের নিয়ামক নহে। কারণ, বিশেষ

কোন গুণ নাই বা অলঙ্কার নাই এরূপ বহু কাব্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। দোষ থাকিলেই যদি কাব্যত্বহানি হইত তাহা হইলে অনেক সৎ কবির কাব্যকেই বাদ দিতে হইত। একথাও বলা চলে না যে, একটী কবিতার ভিতরে যেটুকুতে দোষ নাই তাহা কাব্য, এবং যেখানে দোষ আছে তাহা অকাব্য। কারণ কাব্যত্ব স্বীকার স্থলে এইরূপ আংশিক কাব্যত্ব-ব্যবহার কোথাও দেখা যায় না। সাহিত্যদর্পণকার যে বলিয়াছেন যে, রসাত্মক বাক্যই কাব্য তাহাও ঠিক নহে, কারণ তাহা হইলে বস্তু বা অলঙ্কার-প্রধান কাব্যকে কাব্য বলা চলে না এবং নানাবিধ স্বভাব-বর্ণনাত্মক কাব্যকেও কাব্য বলা যায় না। কারণ স্বভাব বর্ণনাস্থলে শৃঙ্গার-বীর-করুণাদি রসের আভাস পাওয়া যায় না। যদি বলা যায় যে, সে স্থলেও কোন প্রকারের রস হয় তবে সকল বাক্যেরই রস হয় ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ বাক্যমাত্রেই কোন না কোন প্রকার বিভাব অনুভাবাদি প্রকাশ করিয়া থাকে। 'গৌশ্চলতি', 'মৃগোধাবতি' এ সমস্ত বাক্যেও কোন না কোন প্রকারের বিভাব-অনুভাব খুঁজিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং ইহাদিগকে কাব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

জগন্নাথের মতে কবিপ্রতিভাই কাব্যোৎপত্তির প্রতি কারণ। প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। এই প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে, ইহার বলে যেরূপ শব্দ বা অর্থের দ্বারা কাব্য রচিত হইতে পারে তাদৃশ বাক্যার্থ কবিচিত্তে সহসা প্রাদুর্ভূত হয়। "তস্য চ কারণং কেবলং কবিগতা প্রতিভা। সা চ কাব্যানুকূলশব্দার্থোপস্থিতিঃ।"

রসের বর্ণনা করিতে গিয়া জগন্নাথ বলিতেছেন যে, বিভাবাদি দ্বারা রস ব্যক্ত হয়। অর্থাৎ দীপ যেমন আবরণের দ্বারা আবৃত থাকে, কিন্তু আবরণের দ্বারা আবৃত থাকার পর কেহ সেই আবরণকে

ভাঙ্গিয়া দিলে সেই দীপ যেমন আপনাকে প্রকাশ করে এবং অন্যকেও প্রকাশ করে, বিভাবাদির দ্বারা আত্মচৈতন্যের আবরণ খণ্ডিত হইলে সেইরূপ আত্ম-চৈতন্যও আপনাকে প্রকাশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভাবাদিসম্বলিত রত্যাদিকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। বিভাবাদি যখন চিত্তে উপস্থাপিত হয় তখন তাহারা চিত্ত-ধর্ম্ম বলিয়াই পরিগণিত হয়। স্বাপ্ন পদার্থ যেমন সাক্ষি-চৈতন্যের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তেমনই বিভাবাদির আস্বাদের সময় যে আবরণ-ভঙ্গ ঘটে তাহা দ্বারা যে আস্বাদন ঘটে তাহাকেই লাক্ষণিক ভাবে রসের উৎপত্তি বলা হয়। বস্তুতঃ স্থায়ী ভাবের উৎপত্তিও নাই, ধ্বংসও নাই। রসের আস্বাদন-প্রকার বর্ণনা করিতে গিয়া জগন্নাথ অন্যপ্রকারেও ইহা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিভাবাদির আস্বাদ সহৃদয়তা-প্রযুক্ত, স্বকীয় স্ব-স্ব রূপে স্থায়ী ভাবে প্রতিফলিত হয় এবং যোগীর চিত্ত যেমন সমাধিতে তন্ময় হয়, সেই ভাবে সহৃদয় ব্যক্তি, আনন্দরূপ স্থায়ীভাবে তন্ময় হইয়া যান। কাব্যের এই আনন্দ লৌকিক সুখ হইতে স্বতন্ত্র; কারণ ইহা আত্মার স্বরূপানন্দের স্থায়ী ভাবের ভিতর দিয়া সাক্ষাৎকার। সাধারণ সুখ অন্তঃকরণের বৃত্তি; কিন্তু রসাস্বাদন চৈতন্যের স্বরূপস্বাদ।

জগন্নাথ এইভাবে রসের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা তিনি প্রধানতঃ অভিনবগুপ্তের এবং মম্মট প্রভৃতির মতানুসারিণী বলিয়া মনে করেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত এই মতকে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে,এইমতের প্রধান তাৎপর্য্য এই যে, বিভাবানুভাবাদির উপস্থিতির দ্বারা চিৎস্বরূপের আবরণ ভঙ্গ হইলে তাদৃশ সাক্ষিস্বরূপের দ্বারা যখন রতি, ক্রোধ, উৎসাহ প্রভৃতি স্থায়ী ভাব উদ্ভাসিত হয়, অর্থাৎ তাদৃশ চিদ্বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয় তখন তাহাই রসরূপে প্রতীত হয়। মম্মট বলিয়াছেন,—

"সম্বন্ধবিশেষস্বীকারপরিহারনিয়মানধ্যবসায়াৎ সাধারণ্যেন প্রতীতৈঃ অভিব্যক্তঃ সামাজিকানাং বাসনাত্মকতয়া স্থিতঃ স্থায়ী রত্যাদিকো নিয়তপ্রমাতৃগতত্বেন স্থিতোঽপি সাধারণোপায়বলাৎ তৎকালবিগলিত-পরিমিতপ্রমাতৃভাববশোন্মেষিতবেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্যাপরিমিতভাবেন প্রমাত্রা সকলহৃদয়সংবাদভাজা সাধারণ্যেন স্বাকার এব অভিন্নোঽপি গোচরীকৃতশ্চর্ব্ব্যমাণতৈকপ্রাণো বিভাবাদিজীবিতাবধিঃ পানক-রসন্যায়েন চর্ব্ব্যমাণঃ পুর এব পরিস্ফুরন্ হৃদয়মেব প্রবিশন্ সর্ব্বাঙ্গীণ-মেবালিঙ্গন্ অন্যৎ সর্ব্বমেব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্ অলৌকিক-চমৎকারকারী"। তাৎপর্য্য এই যে, সহৃদয়দিগের চিত্তে যে সমস্ত বাসনা অর্থাৎ রত্যাদি ভোগাকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি, তাঁহাদের জীবনের ব্যক্তিগত বিশেষ বিশেষ বাহ্যবস্তুগত ভোগাভিলাষরূপে নিয়ত দেশকালাদির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, কাব্যনাটকীয় বিভাবাদিবলে তাহা তাহার ব্যক্তিগত স্বভাব হইতে ও দেশকালাদির বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হয়। ইহারই অর্থ এই যে তাহা পরিমিত প্রমাতৃভাব (finite personality) হইতে বিযুক্ত হয়। অর্থাৎ এই ভোগ আমার, আমি এই রসের আস্বাদয়তা ইত্যাদিরূপে সঙ্কীর্ণ আত্মনিবদ্ধ ভাবে প্রতীত হয় না। সারবোধিনী টীকায় ইহার ব্যাখায় বলা হইয়াছে "অপারিমিত্যং সাধারণ্যং প্রমাতৃবিশেষনিষ্ঠাগ্রহে সতি গৃহ্যমাণত্বম্, ভাবো বর্ণনীয়-তন্ময়ীভবনযোগ্যঃ।" এইভাবে বিশেষ কোনও প্রমাতৃভাবের দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া এবং অন্য জ্ঞেয়বস্তুর সম্পর্কশূন্যভাবে স্বকীয় জ্ঞানস্বরূপের সহিত অভিন্নভাবে অর্থাৎ বিষয়বিষয়িভাবরহিত হইয়া আস্বাদ্য ও আস্বাদ এই ভাব রহিত হইয়া কেবলমাত্র আস্বাদস্বরূপে রস অনুভূত হয়। যদিও বিভাবাদি না থাকিলে রস প্রতীত হয় না, তথাপি স্বাদু, সুস্নিগ্ধ, সুগন্ধ পানকরসে যেমন তদুপাদানীভূত সামগ্রী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিলক্ষণ

একটি নূতন স্বাদ প্রতীত হয় তেমনি বিভাবাদির স্বাদ হইতে সম্পূর্ণ একটি নূতন স্বাদ রসে প্রতীত হয়। এই রসাস্বাদ সমস্ত হৃদয়কে ব্যাপ্ত করে এবং সমস্ত ভাবকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করে। মুক্তিদশাতে যেরূপ ব্রহ্মস্বরূপ মাত্র স্ফূর্ত্ত হয় সেইরূপ রসাস্বাদকালে কেবলমাত্র রসই স্ফূর্ত্ত হয়। এইজন্য ব্রহ্মাস্বাদের সহিত রসাস্বাদের সাদৃশ্য আছে।

জগন্নাথ বলেন যে, রসাস্বাদে চিদ্বিশিষ্ট রত্যাদি স্থায়িভাব প্রকাশ পায় না কিন্তু রত্যাদিবিশিষ্ট ভগ্নাবরণ চিৎস্বরূপই রসরূপে প্রকাশ পায় —"রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ।" রত্যাদিবিশিষ্ট চিৎ-প্রতিভাসের চিদংশের নিত্যপ্রকাশকে অবলম্বন করিয়া রসকে স্বপ্রকাশ বলা হয়। আবার রত্যাদি অংশের প্রতিভাসকে লক্ষ্য করিয়া ইহাকে পরপ্রকাশ্য বলা যায়। চিদ্‌গত আবরণভঙ্গ বা তদাকারক অন্তঃকরণ বৃত্তিকে রসাস্বাদ বা রসচর্ব্বণা বলা যায়। বিভাবাদি-বিষয়সংযুক্ত বলিয়া ইহা ব্রহ্মাস্বাদ বা যৌগিক সমাধি হইতে ভিন্নজাতীয়। বৈদিক বাক্যের প্রামাণ্যে ইহা স্পষ্ট বলিতে পারা যায় যে, আবরণভঙ্গ-প্রযুক্ত চিৎস্বরূপের প্রতিভান আনন্দ স্বরূপ এবং রসস্বরূপ। কারণ, শ্রুতি বলেন 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' তাহা ছাড়া, সকল সহৃদয় ব্যক্তি স্বসংবেদ্যরূপে এই আনন্দ-প্রতিভানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

জগন্নাথ রসাস্বাদের প্রকার সম্বন্ধে নানা বিভিন্ন মতের অতি নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। ভট্টনায়কের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ভাবকত্ব ও ভোজকত্বরূপ দুইটি বৃত্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, বিভাবাদি আলম্বন না থাকিলে রসের প্রতিপত্তি হইতে পারে না। শকুন্তলা নায়িকা দর্শক বা পাঠকের নিকট তাহার নিজের রসের আলম্বন হইতে পারে না। এ কথা বলা যায় না যে,

শকুন্তলাদি নায়িকা স্ত্রী সাধারণরূপে প্রতীত হয় বলিয়া তাহাকে অবলম্বন করিয়া রস উৎপন্ন হইতে পারে; কারণ, সাধারণ স্ত্রীরূপে প্রতীত হইলেই তাহা আমাদের শৃঙ্গারবৃত্তির আলম্বন হয় না। সাধারণ স্ত্রীত্ববোধ মাতা ভগ্নী প্রভৃতির ভিতরেও থাকে; অতএব পাঠক ও দর্শকের ভোগযোগ্যা এই বোধ না থাকিলে কেবল মাত্র সাধারণ ভাবে প্রতীত হইলে তাহাকে অবলম্বন করিয়া শৃঙ্গার বৃত্তি উদিত হইতে পারে না। পাঠক বা দর্শকের সঙ্গে দুষ্মন্ত প্রভৃতির অবস্থাগত ও প্রকৃতিগত এত পার্থক্য থাকে যে পাঠক বা দর্শক দুষ্মন্তের সহিত আপনাকে বিভিন্ন বলিয়া মনে করে এবং দুষ্মন্তের নায়িকাকে আপন নায়িকা বলিয়া মনে করে ইহাও সম্ভব নয়। ইহাও বলা যায় না যে, শব্দের দ্বারা তাদৃশ প্রতীতি উপস্থিত হয়; কারণ, সাধারণ শব্দপ্রয়োগের দ্বারা কোনও স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রণয়ব্যাপার বর্ণিত হইলে কেহ সেই পুরুষের সহিত নিজকে অভিন্ন মনে করিয়া সেই স্ত্রীকে আপন নায়িকা বলিয়া মনে করে না। শুধু শব্দের দ্বারা যে এইরূপ প্রতীতি হয় না তাহা নহে, চিন্তা বা স্মৃতি দ্বারাও এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে না। এইজন্যই ইহা স্বীকার করিতে হয় যে শব্দের অভিধা-শক্তির দ্বারা পদার্থ উপস্থিত হইলে চিত্তের মধ্যে কাব্য-নাটকদ্বারা বর্ণিত নায়িকা স্বভোগযোগ্য নায়িকারূপে চিত্তে উপস্থাপিত হইতে পারে এইরূপ একটি স্বতন্ত্র ভাবকত্ব ব্যাপার আছে। এই ভাবকত্ব ব্যাপারের দ্বারা কাব্য-নাট্য বর্ণিত নায়িকাদের স্থলে চিত্তের মধ্যে স্বভোগযোগ্য নায়িকারূপে একটি নূতন চৈত্তিক নায়িকার সৃষ্টি হয়। এই চৈত্তিক নায়িকা সাধারণীকৃত নায়িকা এবং ইহাতে দেশকালাবস্থাদির কোনও সম্বন্ধ নাই। এই ভাবক-বৃত্তির দ্বারা সৃষ্ট নায়িকা স্বতন্ত্র একটি বৃত্তির দ্বারায়

উপভুক্ত হয়। এই ভোজকত্বরূপ ব্যাপারের মহিমায় চিত্তের রজঃ ও তমোগুণ তিরোহিত হয় এবং সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, এবং তাহার ফলে স্বকীয় চিৎস্বভাবের সাক্ষাৎকারপ্রযুক্ত একটি পরমানন্দ-জ্ঞানাত্মক ভাব আস্বাদিত হয়। ইহাকে রত্যাদি স্থায়ী রস বলিয়া বলা হয়। এই আস্বাদ বাহ্যবিষয় হইতে নির্ম্মুক্ত বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মাস্বাদের সদৃশ বলিয়া বলা যাইতে পারে। এই মতে কাব্যাস্বাদে তিনটি জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথম—অভিধা বা বাক্যার্থের দ্বারা পদার্থের উপস্থিতি, দ্বিতীয়—ভাবনাবৃত্তির দ্বারা সেই পদার্থকে অবলম্বন করিয়া নূতন কাব্যপদার্থের সৃষ্টি ও তৃতীয়—তাহার আস্বাদন। এই মতের সহিত অভিনবের মতের এই মাত্র পার্থক্য যে এখানে ভাবকত্ব-রূপ একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার স্বীকার করা হয়। এখানে ভোজকত্ব বলিয়া যাহা স্বীকার করা হইয়াছে তাহা ব্যঞ্জনা ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নহে।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, কাব্য ও নাট্য কবি ও নটের দ্বারা বিভাবাদি ব্যঞ্জনাব্যপারের দ্বারা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাদির পরস্পর রতিস্বভাব দ্যোতিত হইলে কল্পনা বা ভাবনারূপ দোষবশতঃ দুষ্মন্ত বা শকুন্তলাদির স্বভাব আচ্ছাদিত হইয়া একটি স্বতন্ত্র অনির্ব্বচনীয় শকুন্তলাদি-স্বরূপ ভ্রমাত্মক সৃষ্টি হয়। তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে রত্যাদি আস্বাদ উদ্বুদ্ধ হয় তাহাকেই রস বলে। এই মতটিতে বেদান্তসিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়া রসের স্বরূপ বর্ণনা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। বেদান্তে বলে যে, শুক্তিতে যখন রজত ভ্রম হয় তখন শুক্তিগত চাকচিক্যাদিদোষপ্রযুক্ত তাহার শুক্তি-স্বভাব আচ্ছাদিত হয়, এবং শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের রজতাকার একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয়। এই ভ্রমাত্মক রজতের সহিত চক্ষুঃকর্ণাদির দ্বারা রজত

বোধ হয়। এই মত অনুসারে যখন কাব্যের ব্যঙ্গার্থের দ্বারা দুষ্মন্ত-শকুন্তলাদির রতিভাব চিত্তে দ্যোতিত হয় তখন হৃদয়গত বাসনা বা কল্পনার দোষে সেই রতিভাব যে দুষ্মন্ত বা শকুন্তলার এই অংশটুকু আচ্ছাদিত হয় এবং যেমন শুক্তিখণ্ডে অনির্ব্বচনীয় রজতখণ্ড উৎপন্ন হয় এবং অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন আত্মাতে শকুন্তলাবিষয়ক রতি দর্শক বা পাঠকের সাক্ষিভাষ্যরূপে (impersonal experience) যখন প্রকাশ পায় তখনই তাহাকে রস বলে। এই মতে দুষ্মন্তাদিগত রতি দুষ্মন্তাদি রূপে প্রকাশিত না হইয়া বাসনা কল্পনা প্রভৃতি দোষমাহাত্ম্য স্বকীয় রসাস্বাদরূপে স্বকীয় স্বরূপের মধ্যেই প্রতিভাত হয়। এই আস্বাদটি শুক্তিরজত সৃষ্টির ন্যায় একটি ভ্রান্তিময় সৃষ্টি। চিৎ-স্বরূপের লোকোত্তর আলোকের সহিত তদানীন্তন কালে ইহার কোনও ভেদ উপলব্ধি হয় না বলিয়া ইহা অলৌকিক আহ্লাদরূপে অনুভূত হয়। ইহার প্রথমারম্ভ ব্যঞ্জনাব্যপারের দ্বারা ; এই জন্য ইহাকে ব্যঙ্গ্য বলা হয়। দুষ্মন্তাদি অনুভূত রতির যে দুষ্মন্তাদিগতত্ব অংশ আচ্ছাদিত হয় তাহাকে ভ্রমের অঙ্গ বলিয়া অনির্ব্বাচ্য বলা যাইতে পারে। এই দুষ্মন্তাদিগতত্ব আচ্ছাদিত হয় বলিয়াই রত্যাদি-বোধে কোন ব্যক্তি-স্বভাব থাকে না। এই মতে পাঠক বা দর্শক দুষ্মন্তাদিগত রসকে আস্বাদ করেন না। নিজেকেও দুষ্মন্তাদি মনে করেন না। কিন্তু দুষ্মন্তাদিগত রতির দুষ্মন্তাদিগতত্ব অংশ আচ্ছাদিত হইয়া যে একটি স্বতন্ত্র রতিভাব উৎপন্ন হয় তাহাই আস্বাদ করিয়া থাকেন। দুষ্মন্তাদিপরত্বরূপ আচ্ছাদিত হয় বলিয়াই ইহা সাধারণীকৃত হয় একথা বলা যায়। রসাস্বাদের মূলে দোষের ব্যাপার স্বীকার না করিলে দুষ্মন্তাদিগতত্বরূপ অংশ কিরূপে আচ্ছাদিত হয় তাহার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এইজন্য যদি দোষ মানিতেই হয় তবে দুষ্মন্তাদির সহিত কিরূপে পাঠকের

অভেদবুদ্ধি হয় তাহারও ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। বিভাবাদির যে সাধারণীকরণের কথা প্রাচীনেরা বলিয়াছেন তাহাও উপপত্তি করিতে হইলে বাসনা বা কল্পনারূপ দোষের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হয়। কারণ, তাহা না হইলে শকুন্তলাদি শব্দের দ্বারা শকুন্তলাদি-প্রচারক বুদ্ধির উৎপত্তি হইতে পারে কিন্তু তাহা দ্বারা সাধারণীকৃত নায়িকার বোধ কেমন করিয়া হয় তাহা বলা যায় না। এইরূপে বাসনা ও কল্পনারূপ দোষ বলে দর্শক বা পাঠক একদিকে আপনাকে দুষ্মন্তাদির সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে, অপরদিকে শকুন্তলাদি নায়িকা সাধারণীকৃতরূপে তাহার চিত্তে আবির্ভূত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, করুণ রসাদি স্থলে পাঠক বা দর্শকের চিত্তে আহ্লাদ কি করিয়া আবির্ভূত হইতে পারে। নায়কের সহিত অভিন্ন ভাবে যদি রসের প্রতীতি হয় তাহা হইলে নায়কগত শোকাদি ভাবই পাঠক বা দর্শকের চিত্তে সংক্রমিত হইতে পারে। এ কথা বলা যায় না যে, সত্য শোক-স্থলেই দুঃখ উৎপন্ন হয়, কল্পিত শোকে দুঃখ উৎপন্ন হয় না। কারণ, কল্পিত রজ্জুসর্পাদি স্থলেও ভয়কম্পাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ যুক্তিতেই কল্পিত রত্যাদি স্থলেও সুখ না হইতে পারে। করুণ রসের আস্বাদন সময়ে যদি সমস্ত সহৃদয় ব্যক্তিই আনন্দ অনুভব করেন তাহা হইলে অলৌকিক কাব্যব্যাপারের দ্বারা দুঃখানুভবটি নিরুদ্ধ হয় এই উত্তর ছাড়া আর কোনও উত্তর নাই। আর যদি করুণ রস আস্বাদনের সময় কোনও দুঃখলেশ থাকে বলিয়া অনুভূত হয় তবে দুঃখ একেবারে নিরুদ্ধ হয় এ কথা বলা উচিত হইবে না। দুঃখলেশ অনুভূত হইলেও সুখানুভবের প্রাচুর্য্যবশতঃ করুণ রস আস্বাদে লোকে উন্মুখ হয়—"ইষ্টস্যাধিক্যাৎ অনিষ্টস্য চ ন্যূনত্বাৎ চন্দনদ্রবলেপনাদাবিব প্রবৃত্তেরুপপত্তেঃ।" করুণরস আস্বাদনের সময় যে অশ্রুপাতাদি

ঘটিয়া থাকে, কেহ বলেন যে হৃদয় দ্রবীভূত হওয়ার জন্যই তাহা ঘটে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে আনন্দানুভবের জন্যই তাহা ঘটিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তেরা যখন ভগবদ্‌বর্ণনা শ্রবণ করেন তখনও তাঁহাদের আনন্দাশ্রু বিগলিত হয়। এইখানেই কাব্যব্যাপারের অলৌকিকত্ব যে, শোকাদি হইতেও আহ্লাদ উৎপন্ন হয়। লৌকিক যে সমস্ত প্রমাণের দ্বারা আমরা বিষয় গ্রহণ করি কাব্যসংবেদনস্থলে সেই সমস্ত প্রবাদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অন্য প্রকার বৃত্তির দ্বারা তাহা উৎপন্ন হয়। এইজন্য সাধারণ প্রমাণের দ্বারা লব্ধ বস্তু হইতে যে সমস্ত ভাব অনুভূত হয় অলৌকিক প্রমাণের দ্বারা তাহা অনুভূত হইলে সেই ভাবের আস্বাদ যে বিভিন্ন প্রকারের হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। এই স্থলে কাব্যব্যাপারের একটি স্বতন্ত্রতাও স্বীকৃত হইয়াছে। কাব্য ব্যাপারের ফলেই রসাস্বাদ ঘটিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন দুষ্মন্তাদিতে অভেদবুদ্ধি হয় বলিয়াই শকুন্তলাদিতে নায়িকারূপ সাধারণীকরণ সম্ভব হয়। কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বোক্ত ভ্রমজনিত সাধারণীকরণাদি না জানিলেও বাসনাদিদোষবশতঃ দুষ্মন্তাদির সহিত তাদাত্ম্যবোধের দ্বারা শকুন্তলাদি দুষ্মন্তের যে রতি ভাব তাহার সহিত আপন আনন্দের অভেদবুদ্ধিবশতঃ রসাস্বাদ ঘটিয়া থাকে। কাব্যার্থভাবনা বা কাব্যব্যাপারই ইহার কারণ। স্বপ্নে নায়িকাদি-দর্শন জনিত যে সমস্ত ভাব অনুভূত হয় তাহা কাব্যব্যাপার জনিত নয় বলিয়াই তাহাকে রস বলা যায় না। পূর্ব্ব মত হইতে এই মতটির পার্থক্য এই যে, এখানে পূর্ব্ব মতের ন্যায় শকুন্তলাদিতে নায়িকা বোধ ঘটে না, কিন্তু শকুন্তলার প্রতি যে মনোভাব, যে রত্যাস্বাদ, পাঠক বা দর্শক আনন্দের সহিত তাহাই অভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। দর্শক বা পাঠকের মনে কোনপ স্বতন্ত্র রত্যাস্বাদ থাকে না। এখানে

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে দর্শকের চিত্তে যদি স্বতন্ত্র ভাবে রত্যাস্বাদ না থাকে তবে তাহা কি প্রকারে অনুভূত হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, লৌকিক প্রত্যক্ষস্থলে বাস্তব বিষয় যে থাকিতেই হইবে এরূপ দাবী করা চলে না। এখানেও দুষ্মন্তগত রতিতে কাব্যব্যাপারের ফলে স্বাত্মগত রতিরূপে যে অনুভব করা হয় তাহাও একরূপ প্রত্যক্ষ। যখন শকুন্তলা নাটক আমরা দেখি বা পাঠ করি তখন আমাদের যে আনন্দ হয় তাহার মধ্যে আমরা কেবলমাত্র দুষ্মন্তের শকুন্তলার প্রতি যে প্রীতি তাহার সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলার দুষ্মন্তের প্রতি যে প্রীতি,তাহারও আস্বাদ পাই। এবং উভয়ের প্রীতির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহারও আস্বাদ পাই। রত্যাস্বাদজনিত যে রস তাহা এই তিন প্রকারেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা ব্যঞ্জনাব্যাপার না মানিয়া এই প্রকারের রসাস্বাদ মানেন তাঁহারা বলেন যে দুষ্মন্তের হাবভাব দেখিয়া সে যে শকুন্তলাবিষয়ে প্রীতিমান্ এইরূপ অনুমান করিয়া পরে অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা লোকে স্বচিত্তে অলৌকিক ভাব আরোপিত করেন।

কেহ কেহ আবার বলেন যে, বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী এই তিনের সম্মিলনেই রস। কেহ বা বিভাবকেই রস বলেন, কেহ বা অনুভাবকে রস বলেন,—কেহ বা ব্যভিচারীকেই রস বলেন, এবং এই সমস্ত বিভিন্নবাদীরা ‘বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ’ এই সূত্রকে আপন আপন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। কেহ বলেন, বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারীর সংযোগের দ্বারা অর্থাৎ অভিব্যঞ্জনা দ্বারা চিদানন্দবিশিষ্ট স্থায়ী আত্মার রসরূপে প্রকাশ হয়; অথবা স্থায়ী ভাব উপহিত হইয়া চিদানন্দস্বরূপের যে প্রকাশ তাহাই রস। কেহ বলেন যে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী বস্তুরূপে এবং সাধারণীকৃতরূপে যে যোগ

ভাবকত্বব্যাপারের দ্বারা ঘটিয়া থাকে সেই রস স্থায়ী চিত্তবৃত্তিতে উপহিত হইয়া যখন সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করে তখন আনন্দশীল আত্মার যে প্রকাশ তাহাই রস। ভরতসূত্রের 'রসনিষ্পত্তি' এই শব্দের নিষ্পত্তি শব্দে ভোগব্যাপারের দ্বারা সাক্ষাৎকার বুঝায়। কেহ বা বলেন যে বিভাবানুভাব ব্যভিচারীর সংযোগ ঘটিলে ভাবনা বা কল্পনারূপ দোষের দ্বারা যে অনির্ব্বচনীয় দুষ্মন্তাদির সৃষ্টি হয় তাহারই রসরূপে উৎপত্তি বা নিষ্পত্তি। কেহ বা বলেন, বিভাবাদির সংযোগে যে জ্ঞান ঘটে তাহাতেই রসরূপ সংবিদ্-বিশেষের উৎপত্তি হয়। কেহ বলেন, বিভাবাদির সংযোগপ্রযুক্ত দুষ্মন্তাদিগত রতি পাঠকে আরোপিত হয়। কেহ বা বলেন যে কৃত্রিম বিভাবাদি যখন অকৃত্রিমরূপে গৃহীত হয় তখন তাহা হইতে অনুমানদ্বারা রসের গ্রহণ হইয়া থাকে। কেহ বা বলেন বিভাবাদি এই তিনটির সংযোগ হইলেই তাহাকে রস বলা যায়। কিন্তু বিভাবাদির কোনও একটিকে রস বলিলে সূত্রার্থের অপব্যাখ্যা হয়। কিন্তু জগন্নাথ বলেন যে নানারূপ বিচক্ষণতাদ্বারা উদ্ভাবিত যে সমস্ত নানা মতের আমরা আলোচনা করিলাম তাহাদের যতই সূক্ষ্মভেদ থাকুক না কেন, রসাস্বাদের যে অহ্লাদ হয় এবং অহ্লাদব্যতীত যে রস-প্রতীতি সম্ভব নহে, এবং সেই আহ্লাদ-স্বাদ-স্বরূপ রসই যে পরম রমণীয় রূপে প্রতীত হয় এ সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই।

স্থায়ী ভাব বর্ণনা করিতে গিয়া জগন্নাথ বলিয়াছেন যে বাসনারূপে যাহা চিত্তের মধ্যে চিরন্তন স্থির হইয়া রহিয়াছে তাহাই স্থায়ী ভাব। বাসনারূপে স্থায়ী থাকিয়া মুহুর্মুহুঃ ইহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ব্যভিচারীভাবগুলির কোনও স্থিরতা নাই, তাহারা প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তমান। কেহ কেহ রত্যাদি ভাবের প্রত্যেকটিকে স্থায়ী ভাব বলিয়াছেন। কিন্তু জগন্নাথ তাহা স্বীকার করেন না। কারণ,

রত্যাদিভাবের কোনও একটি প্রধানভাবে প্রকাশ পাইলে অন্যগুলি ব্যাভিচারীরূপে প্রকাশ পাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভরত তাঁহার নাট্যসূত্রে ৮টি রসের উল্লেখ করিয়া তাহাদের স্থায়িভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। শৃঙ্গারের স্থায়ী ভাব রতি, হাস্তের হাস। হাসের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে বাক্য প্রভৃতির বিকৃতিবশতঃ চিত্তের বিকাশ—"বাগাদিবৈকৃতাচ্চেতোবিকাশো হাস উচ্যতে।" করুণরসের স্থায়ী ভাব শোক, রুদ্র রসের ক্রোধ, বীররসের উৎসাহ, ভয়ানকরসের ভয়, বীভৎসের জুগুপ্সা ও অদ্ভুতের বিস্ময়। বিস্ময়ভাবটি অনেকটা পরিমাণে ইংরাজী sublime কে তার অন্তর্ভুক্ত করে—"বিস্ময়শ্চিত্তবিস্তারো বস্তুমাহাত্ম্যদর্শনাৎ" কিংবা "বিবিধেষু পদার্থেষু লোকসীমাতিবর্ত্তিষু, বিস্তারশ্চেতসো বস্তু বিস্ময়ঃ স উদাহৃতঃ।" সারবোধিনীকার করুণরসে যে আনন্দানুভব হয় সে সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সুখ দুঃখ উভয়ই মিশ্রিত থাকে তথাপি শোকাবচ্ছিন্ন চৈতন্তের আনন্দাংশেতেই আবরণভঙ্গ হওয়ায় করুণ রসেও নিরতিশয় আনন্দ অনুভূত হয়। সাধারণ ব্যক্তিগত শোকে মানুষের চিত্ত ব্যক্তিগত অনিষ্টস্পর্শে যেভাবে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায়, কাব্যোপস্থিত শোকে তাহা না থাকায় করুণরস আস্বাদনে অপ্রবৃত্তি হয় না। ভরত কতগুলি ব্যভিচারী ভাবেরও বর্ণনা করিয়াছেন। মম্মট প্রভৃতিরা তাহাই যথাদৃষ্ট ভাবে স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যভিচারী ভাবগুলির নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। নিত্য ও অনিত্যবস্তুর ভেদ-জ্ঞান হইতে কিংবা বিপদ্ ও ঈর্ষ্যাদি হইতে যে আপনাকে তুচ্ছ করিবার একটি প্রবৃত্তি ঘটে বা আপনাকে হেয় করিবার প্রবৃত্তি ঘটে যাহা হইতে দীনতা, চিন্তা, অশ্রুপাত, দীর্ঘশ্বাস ও মুখাদির বিবর্ণতা ঘটে সেইভাবকে নির্ব্বেদ কহে। প্রাণহীনতাবশতঃ শরীরকম্প ও অনুৎসাহ প্রভৃতি

যে দুঃখভাব তাহাকে গ্লানি কহে। পরের ক্রূরতা হইতে কিংবা নিজের দোষ হইতে যখন ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা জন্মে এবং তাহার ফলে বিবর্ণতা, কম্প, স্বরভঙ্গ হয় কিংবা মুখ শুকাইয়া আসে সেই জাতীয় ভয়কে শঙ্কা কহে। ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত অপরের গুণ সহ্য না করিবার ভাবকে অসূয়া কহে। ইহার ফলে অবজ্ঞা, উপহাস, ও ভ্রূভঙ্গাদি বিক্রিয়া ঘটে। আনন্দ হইতে যে মোহ উৎপন্ন হয় কিংবা মদ্যপানাদি জনিত যে মত্ততা, যাহাতে বাক্য ও গতি স্খলিত হয় তাহাকে মদ কহে। দূরপথগমনাদি কারণে যে ক্লান্তি হয় যাহার ফলে ঘন ঘন শ্বাস হয় বা নিদ্রা হয় তাহাকে শ্রম কহে, তাহাতে গ্লানি হয়। প্রার্থনীয় বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট-তাকে আলস্য কহে। শ্রম প্রভৃতি অন্য কারণেও নিশ্চেষ্টতাকে আলস্য কহে। শক্তিহীনতাপ্রযুক্ত বা দুঃখাদি দুরবস্থাজন্য দীন ভাবকে দৈন্য কহে। ইষ্ট বস্তু না পাওয়ার জন্য যে মনে শূন্যতা, তাপবোধ ও পুনঃ পুনঃ চিন্তা তাহাকেই চিন্তা কহে। প্রযত্নপূর্ব্বক কোন বিষয়ের অনুধাবনকেও চিন্তা কহে। ভয়, দুঃখ বা আবেগের জন্য যখন চিত্ত প্রায় সংজ্ঞাহীন হয় তখন তাহাকে মোহ কহে। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞানকে স্মৃতি কহে। অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতে যে শৃঙ্গার তাহাকে ধৃতি কহে। চিত্তের সঙ্কোচকে ব্রীড়া কহে। মাৎসর্য্য, দ্বেষ ও রাগাদি-প্রযুক্ত চিত্তের চাঞ্চল্যকে অবিমৃশ্যকারিতা বা চাপল্য বলে। কোনও অনর্থাতিশয্যে চিত্তের ভয়কে আবেগ কহে। কোনও বস্তু দেখিয়াও সে সম্বন্ধে মনের নিশ্চেষ্টতা ও বুদ্ধিহীনতাকে জড়তা কহে। মত্ততা, সম্পদ্, বিদ্যা, ও সৎকুলোৎপন্ন বলিয়া যে অপরকে অবজ্ঞা করিবার ভাব তাহাকে গর্ব্ব কহে। প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধিবশতঃ উৎসাহনাশকে বিষাদ বলে। বাঞ্ছিতবস্তুর প্রাপ্তির জন্য চিত্ত যখন বিলম্ব করিতে পারে না—মনের সেই ভাবকে ঔৎসুক্য কহে। শ্রমাদিকারণ নিশ্চেষ্টতাকে

নিদ্রা কহে। অত্যন্ত দুঃখপ্রযুক্ত বা পীড়াপ্রযুক্ত মূর্চ্ছাকে অপস্মার কহে। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখাকে সুপ্তি কহে। নিদ্রা দূর হইলে জাগিয়া ওঠাকে প্রবোধ কহে। স্থির ক্রোধকে অমর্ষ কহে। লজ্জাদিকারণে হর্ষ গোপন করাকে অবহিত্থ কহে। অবমানাদি কারণে চিত্তের চণ্ডতাকে উগ্রতা কহে। শাস্ত্রোপদেশ প্রভৃতির দ্বারা কোনও বিষয়ে নিশ্চয়কে মতি কহে। বিরহাদি কারণে চিত্তের সন্তাপকে ব্যাধি কহে। উৎকণ্ঠা, হর্ষ, শোকাদি কারণে চিত্ত-ভ্রমকে উন্মাদ কহে। প্রাণ বহির্গত হওয়ার পূর্ব্বাবস্থাকে মরণ কহে। কোনও আগন্তুক কারণে চিত্তের ভয়কে ত্রাস কহে। সন্দেহাদিকারণে মনের দোলাকে বিতর্ক কহে। এই তেত্রিশটি ভাবকে ব্যভিচারী ভাব কহে। এই ব্যভিচারী ভাবগুলি যথাযোগ্যরূপে বিভিন্ন স্থায়িভাবের দ্যোতকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। নির্বেদকে যদিও ব্যভিচারী ভাবরূপে গণনা করা হইয়াছে তথাপি নবমরসরূপে স্বীকৃত শান্তরসের তাহাই স্থায়ী ভাব।

দেবাদিবিষয়ক অর্থাৎ দেবতা, গুরু, মুনি, রাজা, পুত্র প্রভৃতিবিষয়ক চিত্তের প্রীতি, সন্তোষ বা রতিকে ভাব কহে। উহা কান্তাবিষয়ক হইলে শৃঙ্গার কহে। কোনও ব্যভিচারী ভাবকে যদি প্রধানরূপে বর্ণনা করা যায়, তবে তাহাকেও ভাব কহে। সারদাতনয়কৃত ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে ভরতলিখিত ব্যভিচারী ভাব ছাড়া আরও অনেক প্রকার ব্যভিচারী ভাবের উল্লেখ আছে এবং স্থায়ী ভাবেরও অনেক বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। সারদাতনয় লিখিয়াছেন যে বাস্কুকির মতে ব্যভিচারী ভাবগুলির সংযোগে রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভরত মুনির মতে এবং অন্য অনেকেরই মতে স্থায়ী ভাবটিই নানা ব্যভিচারীর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সারদাতনয় বলেন যে বিভাব ও অনুভাব, সাত্ত্বিক অব্যভিচারী ভাবের

মধ্য দিয়া বর্দ্ধিত হইয়া স্থায়িভাব রসরূপে আস্বাদিত হয়। সারদাতনয় বলেন যে, রস সামান্যও নয়, বিশেষও নয়, দ্রব্যও নয়, গুণও নয়, এবং তদ্ভিন্ন পদার্থান্তরও নয়। রস একটি মনের বিকার মাত্র। নানাপদার্থই রসরূপে আস্বাদিত হয়।

পদার্থই রসরূপে অনুভূত হয়। সারদাতনয় বলেন যে, সমুদ্রে যেমন ঢেউগুলি ওঠে এবং সমুদ্রের মধ্যে লীন হয়, কোন সময় সমুদ্রকে মাহাত্ম্যের সহিত প্রকাশ করে, এবং কোন সময় বা সমুদ্রের মধ্যে লীন হয়, সেইরূপ ব্যভিচারী ভাবগুলিও কোন সময় স্থায়ী ভাব হইতে স্বতন্ত্র প্রকাশিত হয় এবং তাহার আস্বাদকে পুষ্ট করে এবং কোন সময় বা তাহার মধ্যে লীন হইয়া যায়। কোন কোন সময় তাহাদের স্বরূপ যদিও রসরূপেই প্রতীত হয়, তথাপি তাহারা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তমান বলিয়া তাহাদিগকে রস আখ্যা না দিয়া তাহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারী ভাব কখনও স্থির ভাবে থাকে না। তাহারা স্থির ভাবে থাকিলে অনেক স্থলে বৈরস্যই হয়। যদি কোনও স্থলে কোনও একটি ব্যভিচারীকে এমন করিয়া বর্ণনা করা যায় যাহাতে চমৎকারিত্ব ঘটিতে পারে, তাদৃশ ব্যভিচারী ভাবকেই ভাব বলে। ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা জানা যায় যে রস উৎপন্ন হইয়াছে। রস উৎপন্ন হইলে তাহার বাহ্য লক্ষণকে অনুভাব কহে। আধুনিক কোনও কোনও চিন্তাশীল লেখক স্থায়ী ভাবগুলিকে ব্যভিচারী ভাব হইতে পৃথক্ পরিগণনা করার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, সকলগুলিই যখন emotion, তখন রস আটপ্রকার কি নয় প্রকার এইরূপ বিভাগ করা অসঙ্গত। কিন্তু আমাদের এই সমালোচনা ঠিক বলিয়া মনে হয় না; কারণ সকলগুলিই যে emotion একথা প্রাচীনেরা বুঝিতেন না এমন নহে; তবে তাঁহারা বলিতেন যে

মানুষের মধ্যে কতগুলি innate বা instinctive emotion আছে। তাহার মধ্যে কতগুলি পশুসাধারণ, কতগুলি বা বিশেষ ভাবে মনুষ্য-সাধারণ। মানুষের চিত্তে যে রকমের emotionই হউক না কেন সেগুলি কতগুলি প্রধান instinctive emotionএর সহিত জড়িত। সাধারণ emotionগুলি মুহূর্ত্ত মাত্র দেখা দেয়, এবং তাহার স্থলে হয়ত পরম্পরাক্রমে নূতন নূতন emotion আসে ও যায়। কিন্তু এই চঞ্চল emotionগুলির মূলে তাহার আশ্রয়রূপে কোন না কোন innate emotion আছে। কাব্যরসাস্বাদের সময় এই instinctive emotion গুলি উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে এবং তাহার সহিত জড়িত ভাবে বিভিন্ন ব্যভিচারী emotion ঢেউ খেলাইয়া যায়। এই জন্যই instinctive emotionগুলিকে আলঙ্কারিকেরা স্থায়ী ভাব বলিয়াছেন। সারদাতনয় বলিয়াছেন যে, স্থায়ীভাব বা ব্যভিচারী ভাব উভয়ই কাব্যের বিষয়। কেবল রসই যে কাব্যার্থের বিষয় তাহা নহে। অলঙ্কার, বাক্যার্থ, ভাব, রস এ সমস্তই কাব্যের বিষয়। ভারবি প্রভৃতি অনেকে ভাব এবং রসের তাদাত্ম্যও স্বীকার করিয়াছেন।

> "কেবলং ন রসঃ কাব্যে বাক্যার্থমনুপশ্যতি।
> অলঙ্কারোঽপি বাক্যার্থঃ স্যাদ্‌গুণোঽপি চ বাক্যতঃ॥
> বাক্যবাক্যার্থবশতো ধ্বন্যন্তে তেঽপি কুত্রচিৎ।
> ভাবা রসাশ্চ যুজ্যাঃ স্যুঃ নৃত্যনৃত্তাত্মনা নটৈঃ॥
> উদাহরণমেতেষাং দিঙ্মাত্রমভিধীয়তে।
> তাদাত্ম্যং ভাবরসয়োঃ ভারবিঃ স্পষ্টমূচিবান্‌॥"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সারদাতনয়ের মতে কেবল ভাবকেও রস বলা যাইতে পারে। ভাবশব্দের অর্থ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। কোন ব্যভিচারী ভাবকে প্রধান ভাবে বর্ণনা করিলে কিংবা

দেবাদি বিষয়ক রতিকে ভাব কহে। অভিনব, ধনঞ্জয়, মম্মট প্রভৃতি সকলেই স্থায়ী ভাবই রসরূপে আস্বাদিত হয় এই কথা বলিয়াছেন। ধনঞ্জয় দশরূপকে বলিয়াছেন যে সুখদুঃখাদি বিভিন্নভাব যখন কবির অন্তর্গত ভাবকে প্রকাশ করে তখনই তাহাকে ভাব বলে। ব্যভিচারী ভাবের সহিত স্থায়ীভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। সেইজন্য কোন ব্যভিচারী ভাব কোথাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে তাহাকেও অনেকে রস আখ্যা দিয়াছেন। ধনঞ্জয় বলেন যে, রসের সহিত কাব্যের ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ভাব্য-ভাবক সম্বন্ধ। অর্থাৎ বাক্যার্থের অনু-ধাবনের দ্বারা রস আপনা হইতে উৎপন্ন হয়। 'তে হি স্বতো ভবন্ত এব ভাবকেষু বিশিষ্টভাবাদিমতা কাব্যেন ভাব্যন্তে।' আত্মানন্দের সমুদ্ভবই কাব্যের রসাস্বাদ। চিত্তের বিকাশ, বিস্তার, বিক্ষোভ ও বিক্ষেপ বশতঃ শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস ও রৌদ্র অর্থাৎ Sex-passion, Heroism, Hatred এবং Anger, এই চারিটি প্রধান রসের উদ্রেক হয় এবং তাহারই ফলে অবান্তর হাস্য, অদ্ভুত, ভয় ও করুণ এই চারিটির উদ্রেক হইয়া থাকে।

ধ্বনি

রসই কাব্যের আত্মা-স্বরূপ, এই মত পূর্ব্বাধ্যায়ে যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে ধ্বনিই কাব্যের আত্মা এইরূপ একটি মতও প্রচলিত ছিল; কিন্তু অনেকেই তাহা স্বীকার করিতেন না। ধ্বনিকার এই মতকে সুন্দররূপে সমর্থন করেন এবং আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার বৃত্তিতে এবং অভিনব তাঁহার লোচন টীকাতে এই মত এমন করিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন যে মম্মট প্রভৃতি পরবর্ত্তী অনেক আলঙ্কারিকই ইহার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ধ্বনিকার লিখিয়াছেন,—

> "কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈ র্যঃ সমাম্নাতপূর্ব্ব-
> স্তস্যাভাবং জগদুরপরে ভাক্তমাহুস্তমন্যে।
> কেচিদ্বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমূচুস্তদীয়ং
> তেন ব্রূমঃ সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে তৎস্বরূপম্॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে কাব্যতত্ত্বজ্ঞেরা অনেকেই ধ্বনি স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে শব্দ, অর্থ এবং অলঙ্কার ছাড়া নিরতিশয়শোভাবর্দ্ধনকারী কাব্যের অন্য কোনও গুণ নাই। যাহা কিছু কাব্যের শোভাকারী বলিয়া বলা যায় তাহার যে নামই দেওয়া হউক না কেন তাহা গুণ বা অলঙ্কারের মধ্যেই পড়িবে। ভরত প্রভৃতিরা যেমন যমক ও উপমা এই দুই অলঙ্কার স্বীকার করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীরা তাহারই বৈচিত্র্যবশতঃ অনেকপ্রকার শ্রেণিবিভাগ করিয়াছেন। শ্রেণিবিভাগের বিচিত্রতা থাকিলেও তাহাতে নূতনত্ব

নাই। সেইরূপ গুণ, অলঙ্কার ছাড়া কাব্য-শোভার নিমিত্তভূত যে কোনও বৈচিত্র্যেরই আলোচনা করা হউক না তাহা গুণালঙ্কারেরই বৈশিষ্ট্যমাত্র হইবে। শব্দার্থই কাব্যের শরীর কিন্তু ইহারা কেহই ধ্বনি নহে। শব্দার্থের চারুতাকে ধ্বনি বলা যায় না। কারণ শব্দের চারুতা শব্দালঙ্কারের মধ্যেই পড়ে এবং শব্দবিন্যাসের চারুতা শব্দগুণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থের চারুতা অর্থালঙ্কারের মধ্যে পড়ে এবং অর্থ-সন্নিবেশের চারুতা অর্থগুণের মধ্যে পড়ে। রীতি গুণালঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নহে। অনুপ্রাসেরই ঘটনাবৈচিত্র্যে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি বা রীতির সৃষ্টি। অনুপ্রাস ছাড়া বৃত্তির আর কোনও বিশিষ্টতা নাই সেজন্যই ভামহ প্রভৃতি বৃত্তিকে আর স্বতন্ত্র স্থান দেন নাই। উদ্ভট বলিয়াছেন শ, ষ, রেফ-সংযুক্ত বর্ণ ও টবর্গের প্রয়োগে যে অনুপ্রাস হয়, তাহাকে পরুষ বৃত্তি বলে। সমানরূপ বর্ণের সংযোগে এবং বর্গের অন্ত্যবর্ণের সহিত সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগে যে অনুপ্রাস হয়, তাহাকে উপনাগরিকা বৃত্তি কহে। উপনাগরিকা ও পরুষবৃত্তিতে ব্যবহৃত বর্ণ ছাড়া লকারাদি যে বর্ণ তাহাদের প্রয়োগে গ্রাম্যবৃত্তি কহে। কাজেই বৃত্তি অনুপ্রাস ছাড়া আর কিছুই নহে। মাধুর্য্যাদি গুণ সমুচিত বৃত্তিতে প্রকাশিত হইলে পরস্পরের মিলনে যে আস্বাদ উৎপন্ন করে তাহাই গৌড়ী, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী রীতি রূপে খ্যাত হইয়াছে। অতএব বৃত্তি বা রীতি গুণালঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নহে। কাব্য আলোচনা করিলে সহজেই ধ্বনি বলিয়া এমন কিছু পাওয়া যায় না, শব্দার্থের গুণালঙ্কার ছাড়া যাহার অন্য কোনও স্বাতন্ত্র্য আছে। গীত, নৃত্য, হাস্যাদির সহৃদয়-হৃদয়াহ্লাদি শব্দার্থময়ত্বই কাব্যত্বের লক্ষণ। ধ্বনি বলিয়া যখন কোন প্রসিদ্ধ বস্তু নাই, তখন লক্ষণ করাও চলে না। ধ্বনিবাদীরা বলেন যে ধ্বনিই কাব্যের

বিষয়ীভূত অথচ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকেরা তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। যদি কাব্যের এতাদৃশ প্রাণস্বরূপ কিছু থাকিত, তবে তাঁহারা ইহার উল্লেখ করিতেন এবং এ সম্বন্ধে বিচারও চলিতে পারিত। অনুপ্রাসাদির মধ্যে মাধুর্য্যাদি গুণের মধ্যে পাওয়া যায় না কাব্যের এতাদৃশ কোন শোভাতিশায়ী ধর্ম্ম নাই। অতএব বর্ত্তমান লেখকেরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে 'ধ্বনি' 'ধ্বনি' করিয়া আনন্দে নৃত্য করেন, ইহার কোনও হেতু নাই। "ধ্বনিধ্বনিরিতি তদলীক-সহৃদয়ত্বভাবনামুকুলিতলোচনৈ নৃর্ত্যতে তত্র হেতুং ন বিদ্মঃ"। প্রাচীনেরা বহু অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের এমন দশা দেখা যায় না—"সহস্রশো হি মহাত্মভি রন্যৈরলঙ্কারপ্রকারাঃ প্রকাশিতাঃ প্রকাশ্যন্তে চ; ন চ তেষাম্ এষা দশা শ্রূয়তে তস্মাৎ প্রবাদমাত্র এব ধ্বনিঃ। কবি মনোরথ এইজন্যই বলিয়াছেন—

> "যস্মিন্নস্তি ন বস্তু কিঞ্চন মনঃপ্রহ্লাদি সালঙ্কৃতি
> ব্যুৎপন্নৈরচিতং চ নৈব বচনৈ র্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।
> কাব্যং তদ্ ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসন্ জড়ো
> নো বিদ্মোঽভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টস্বরূপং ধ্বনেঃ।"

যাহাতে কোনও বস্তু নাই, মনে আহ্লাদ দিতে পারে এমন অলঙ্কার নাই, ব্যুৎপন্ন রচনা নাই, বক্রোক্তি নাই, মূর্খেরা এমন কাব্যকেও ধ্বনি আছে বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। ধ্বনি কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা যে কি জবাব দেয় তাহা জানি না। কেহ কেহ বা বলেন যে লক্ষণার দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাই ধ্বনি। উদ্ভট বামন প্রভৃতি এই মতই পোষণ করিয়াছেন। উদ্ভট লিখিয়াছেন—"শব্দানামভিধানম্ অভিধাব্যাপারোমুখ্যো গুণবৃত্তিশ্চ।" শব্দের অভিধাব্যাপার দুই প্রকার—মুখ্য এবং গৌণ। বামন

বলিয়াছেন—"সা সাদৃশ্যাল্লক্ষণা বক্রোক্তিঃ"। কেহ কেহ বলেন যে ধ্বনিবস্তুর কোনও লক্ষণ দেওয়া যায় না। তাহা বাক্যের অগোচর, কেবল সহৃদয় ব্যক্তিরাই তাহার আস্বাদ পাইয়া থাকেন।

ইহার উত্তরে আনন্দবর্দ্ধন বলেন যে ধ্বনি সম্বন্ধে এই সমস্ত সন্দেহ আছে বলিয়া ধ্বনির স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক। যদিও পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিকেরা ধ্বনির স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তথাপি সূক্ষ্মদর্শী কবিরা সকল সৎ কাব্যের গোপন-রহস্যভূত, প্রাণভূত ধ্বনিকে আপনাদের কাব্যে গ্রহণ করিয়া তাহাকে হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধনের এই কথা হইতে বুঝা যায় যে ধ্বনিকারের পূর্ব্বে কেহই ধ্বনির স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারেন নাই—"তস্য হি ধ্বনেঃ স্বরূপম্—সকলসৎকবিকাব্যোপনিষদ্ভূতম্ অতিরমণীয়ম্ অনীয়সীভিঃ চিরন্তনকাব্যলক্ষণাভিধায়িনাং বুদ্ধিভিরনুন্মীলিতপূর্ব্বম্"। অভিনব ইহার টীকায় বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র সহৃদয় ব্যক্তিরাই সকল প্রকার ধ্বনির সারভূত রসধ্বনির যথার্থ আস্বাদ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে এরূপ স্বাভাবিক শক্তি আছে যাহার বলে সৎকবিবর্ণিত কাব্যার্থের আস্বাদে তিনি তন্ময় হইতে পারেন, তাঁহাকেই সহৃদয় বলা হয়—"যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়-তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ। যথোক্তম্—

"যোঽর্থো হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুষ্কং কাষ্ঠমিবাগ্নিনা ॥"

ধ্বনিকার বলিয়াছেন যে কাব্যের অর্থ দুই প্রকার—একটি বাচ্য ও আর একটি প্রতীয়মান। বাচ্য অর্থ উপমাদি বহুবিধ উপায়ে প্রকাশিত হয় তাহা পূর্ব্বতন আলঙ্কারিকেরা বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহাকবিদের বাক্যে রমণীর লাবণ্যের ন্যায় আর

একটি প্রতীয়মান অর্থ থাকে, যাহা কাব্যের শব্দ ও সাধারণ অর্থ হইতে, গুণালঙ্কারাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধ্বনিকার বলিয়াছেন—

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু" ॥

শরীরের লাবণ্য যেমন শরীরের অবয়ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অথচ তাহা অবয়বের দ্বারাই প্রকাশিত হয় এবং কোন অলঙ্কারাদির অপেক্ষা রাখে না, ধ্বনিও সেইরূপ কাব্যশরীরের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হয় অথচ কাব্যশরীর হইতে একান্ত স্বতন্ত্র। এই ধ্বনিগম্য অর্থটি তিন প্রকার—বস্তু মাত্র, অলঙ্কার এবং রসাদি যাহা বাচ্য অর্থের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় কিন্তু বাচ্য অর্থ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অভিনব বলেন যে এই তিন প্রকার ধ্বনির মধ্যে রসধ্বনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অভিনবের মতে রসই যথার্থ কাব্যার্থ। ধ্বনিকার বলিয়াছেন—ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। ধ্বনিকারের সহিত আপনার সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য অভিনব বলিয়াছেন যে, যে হেতু রস ধ্বনি দ্বারাই প্রতীত হইতে পারে, সেজন্য রসধ্বনিকেও ধ্বনি বলা যায় এবং সেই হিসাবে ধ্বনি কাব্যের আত্মা। যদিও ধ্বনি শব্দেরই ব্যাপার তথাপি সর্ব্বদাই শব্দের সহিত অর্থ সহকারীরূপে থাকে। সেইজন্য আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন যে ধ্বনি বাচ্যার্থের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় বা আনীত হয়। বাচ্যার্থের দ্বারা আনীত হইলেও ধ্বনিত অর্থটি অনেক সময় বাচ্যার্থের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আনন্দবর্দ্ধন বলিতেছেন যে কোন নায়িকার প্রিয় মিলনকুঞ্জে এক তপস্বী আসিয়া নিরন্তর পুষ্পপল্লবাদির চয়ন করিয়া সেই স্থানটির শোভা নষ্ট করিতেন এবং সেই স্থানের গোপনতা দূর করিতেন। এইজন্য সেই স্ত্রীলোকটি সেই তপস্বীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"ভ্রম ধার্ম্মিক বিশ্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন।
গোদাবরীনদীকুললতাগহনবাসিনা দৃপ্তসিংহেন।"

অর্থাৎ হে তপস্বী তুমি এখন নির্ভয়ে যেখানে সেখানে যাইতে পার, এখানে যে কুকুরটি ছিল তাহাকে গোদাবরীতটবাসী সিংহ বধ করিয়াছে। সাধারণ শ্লোকের অর্থ এই বুঝা যায় যে তপস্বীকে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি কুকুরের ভয়ে বাহির হইতে পারিত না সিংহের কথা শুনিলে সে যে কিছুতেই বাহির হইবে না বা তাহার বাহির হওয়া উচিত হইবে না এই অর্থটি দ্যোতিত হইয়াছে। বাচ্যার্থে কেবলমাত্র 'ভ্রমণ করিতে পার' এই বিধিই পাওয়া যায় এই বিধি অর্থটি বুঝাইবার পর বাচ্যার্থ আর কিছুই বুঝাইতে পারে না। একই বাক্যের দ্বারা দুইটি বিরুদ্ধ অর্থ একসময়ে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। একটি অর্থ বুঝাইয়া শব্দ বিরত হইলে দ্বিতীয় অর্থটি আসিতে পারে না। এখানে তাৎপর্য্য-শক্তিরও কোন অবকাশ নাই, কারণ তাৎপর্য্য-শক্তির দ্বারা বিভিন্ন শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থের অন্বয়মাত্র সাধিত হয়। এখানে মুখ্যার্থ বাধিত হয় নাই, সেজন্যই লক্ষণা স্বীকার করা যায় না। এখানে বাক্যার্থের মধ্যে কোনও পরস্পর-বিরোধ নাই। ইহাকে স্মৃতিও বলা যায় না, কারণ পূর্ব্বানুভূত কোনও বিষয়ের এখানে উল্লেখ নাই। এইজন্য এখানে নিষেধ-প্রতীতি শব্দের একটি স্বতন্ত্র ব্যাপারের দ্বারা সঙ্ঘটিত হয়, ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। ইহা বলা যায় না যে একই বাচ্যার্থ পরম্পরাক্রমে প্রসারিত হইয়া ব্যঞ্জিত অর্থটি প্রকাশিত করিয়াছে, কারণ ব্যঞ্জিত অর্থটি অভিধা অর্থের বিপরীত। যেখানে বাচ্যার্থ-সজাতীয় কোনও দূরগত অর্থ প্রতীত হয় সেখানে তাহা অভিধা-ব্যাপার বলিয়া মানা যাইতে পারে, কিন্তু যেখানে বাচ্যার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নজাতীয় অর্থ প্রতীত হয়, সেখানে ধ্বনি না

মানিয়া উপায় নাই। পুনশ্চ বাক্য হইতে ব্যঞ্জনীয় অর্থটি অতি শীঘ্রই সাক্ষাৎকৃত হয়। তাদৃশ অর্থে কোনও শব্দের সঙ্কেত যখন নাই তখন তাহাকে কি বলিয়া অভিধা-ব্যাপার-নিষ্পন্ন বলিয়া বলা যাইতে পারে? একথা বলা চলে না যে, নিমিত্তরূপ যে শব্দ, তাহারই সঙ্কেত আবশ্যক আর নৈমিত্তিক বা কার্য্যরূপ যে অর্থ তাহার স্থলে কোনও সঙ্কেতের আবশ্যক নাই। কারণ নিমিত্তকে অবলম্বন না করিয়া কি করিয়া নৈমিত্তিক উপস্থিত হইতে পারে? যদি প্রতীয়মান নিষেধাদি অর্থের শ্লোকের কোনও শব্দে সঙ্কেত না থাকে, তবে কোনও সঙ্কেতকে অবলম্বন না করিয়া বিনা কারণে অর্থ কি প্রকারে প্রতীত হইতে পারে? এমন বলা যায় না যে প্রতীয়মান অর্থটি আপনি আবির্ভূত হয় ও তাহার পর তাহার বলে শব্দের সঙ্কেতিত অর্থ উৎপন্ন হয়। কারণ পূর্ব্বেরটিই পরেরটির কারণ হয় পরেরটি পূর্ব্বেরটির কারণ হয় না। ইহাও বলা চলে না যে সঙ্কেতিত অর্থ গ্রহণের দ্বারা যাহার চিত্ত মার্জ্জিত হইয়াছে, তাহার নিকট প্রতীয়মান অর্থটির প্রতিপত্তি ঘটিতে পারে, কারণ তাহা হইলে সঙ্কেতিত অর্থটির বিরুদ্ধ কোনও অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। অন্বিতাভিধান-বাদীদের মতে কোনও পদার্থের পৃথক্ সঙ্কেত নাই, সমস্ত পদই অন্বিত হইয়া অর্থপ্রকাশ করে। সাধারণভাবে প্রকাশিত অর্থ অন্বয়ের পর আকার-বিশিষ্ট স্বরূপে প্রকাশিত হয়। ইহাও বলা চলে না যে প্রতীয়মান অর্থটি ঝটিতি চিত্তের সম্মুখে উপস্থিত হয়, ইহার কি করা যায়? কারণ ফল যখন হয় তখন তাহার একটি কারণ স্বীকার করিতেই হয়। এবং এই জন্যই ধ্বনিবাদীরা ধ্বনিরূপ শব্দের বিশেষ শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।

উপরি উক্ত শ্লোকের ব্যাখাস্থলে ভট্টনায়ক বলিয়াছেন যে ধার্ম্মিক পদপ্রয়োগের দ্বারা ধীরস্বভাব তপস্বীর চিত্তে সিংহ সম্বন্ধে যে ভীতিরস

উৎপন্ন হইয়াছে তাহারই বলে এখানে নিষেধ সূচিত হইতেছে তাহা ঠিক নহে। কারণ কেবল অর্থের দ্বারাই এখানে নিষেধজ্ঞাপন হইতেছে। কারণ কে বক্তা তাহার কি উদ্দেশ্য, কাহাকে বলা হইতেছে, কাহাকে কি বলা হইতেছে, কাহার কিরূপ ব্যবহার এসব জানা না থাকিলে উপরি উক্ত নিষেধ-ব্যঞ্জনা ঘটিতে পারিত না। আর যদি ভীতিরসাবেশ প্রযুক্তই নিষেধ ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে সেই রসটিও'ত ব্যঞ্জনা ছাড়া অন্য উপায়ে উৎপন্ন হইতে পারিত না। আর সেই ধার্ম্মিকের যে রসাবেশ হইবেই এমন কোনও কথা নাই। ব্রহ্মচারী মাত্রই সহৃদয় নহেন যে তাঁহার ভীতিরসের উদ্রেক হইবে। ভট্টনায়ক নিজে রসের শব্দ-বাচ্যত্ব স্বীকার করেন না। কাজেই রসের ব্যঙ্গ্যত্ব তাঁহাকেও মানিতে হইয়াছে। রসধ্বনি স্বীকার করিয়া বস্তুধ্বনি অস্বীকার করা একান্ত অসঙ্গত। এখানে যেমন বিধিস্থলে নিষেধ পাওয়া গেল, তেমনি কোনও কোনওস্থলে নিষেধস্থলে বিধি পাওয়া যায়।

"শ্বশ্রূরত্র শেতে অথবা নিমজ্জতি অত্রাহং দিবসকে প্রলোকয়।
মা পথিক রাত্র্যন্ধঃ শয্যায়ামাবয়োর্মা মাংক্ষীঃ।"

এখানে শ্লোকের অর্থ এই, কোনও প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীলোককে দেখিয়া সেইখানে আগত পথিকের কামোদয় হওয়াতে সেই স্ত্রীলোকটি তাহাকে বলিতেছে যে তাহার শাশুড়ী এইস্থানে অচেতনভাবে নিদ্রা যায় এবং সে ঐ স্থানে নিদ্রা যায়, রাতকাণা পথিক যেন তাহাদের ঘাড়ে গিয়া না পড়ে। এখানে নিষেধচ্ছলে পথিককে রাত্রে নিজের শয্যায় আমন্ত্রিত করা হইতেছে। ভট্টনায়ক এখানে বলেন যে 'অহং' এই পদের দ্বারা যে বিশেষভাবে নিজের বিরহদশা বর্ণিত হইয়াছে তাহার দ্বারা অর্থাৎ 'অহং' শব্দের দ্বারাই বিধি অর্থ প্রকাশ হইয়াছে। অভিনব বলেন যে এখানে শ্বশ্রূ শব্দের দ্বারা স্বচ্ছন্দবিহারের অসম্ভবতা

বুঝা যায়। যদিও স্ত্রীলোকটি মদনদাবদগ্ধা তথাপি দিবালোকে কিছুই সম্ভব নহে। অথচ পথিককেও উপেক্ষা করা যায় না। তাই বলিতেছি—যেখানে আমি রাত্রে থাকি তাহা দেখিয়া রাখ, দিনের বেলায় অনন্যোপায় হইয়া পরস্পরের দিকে কেবল চাহিয়াই কাটাইয়া দিব—রাত্রি হইলেই অন্ধের মত আমার শয্যার উপর পড়িয়ো না অর্থাৎ রাত্রি হইলেই গোপনে আমার শয্যায় আসিও—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। মুখ প্রভৃতির বিকার এই ধ্বনির সহায়তা করিতেছে।

উপরি উক্ত প্রকারে বাচ্যার্থ হইতে অনেক সময় সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান অর্থটি প্রকাশ পাইতে থাকে। বস্তুব্যঞ্জনার ন্যায় অলঙ্কার-ব্যঞ্জনাও বহুপ্রকার এবং সেগুলিও বাচ্যার্থ হইতে বিভিন্নভাবে প্রতীত হয়। বস্তু এবং অলঙ্কার এই উভয়েই বাচ্যার্থের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে এবং তাহাদের ব্যঞ্জনাও সাধারণতঃ বাক্য হইতে হইয়া থাকে। কিন্তু রস, ভাব, রসাভাস, ও ভাবাভাস প্রভৃতি কখনই বাচ্যার্থের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। তাহারা কেবলমাত্র আস্বাদ্যভাবেই প্রতিভাত হয়। কাজেই রসভাবাদি ধ্বননব্যাপার ছাড়া অন্য ব্যাপারের দ্বারা কখনই প্রতীত হইতে পারে না, কারণ ইহারা কোনও শব্দ বা বাক্যের অর্থ নহে। দেশ, কাল ও আচারাদির সহিত সামঞ্জস্যে ও ঔচিত্যে চিত্তবৃত্তিতে যখন স্থায়িভাব প্রধানরূপে উদ্রিক্ত হয়, তখন তাহাকে বলা যায় রস এবং ব্যভিচারী ভাব প্রধানভাবে উদ্রিক্ত হইলে তাহাকে বলে ভাব। দেশকালাচারাদির বিরুদ্ধরূপে স্থায়িভাব উদ্রিক্ত হইলে তাহাকে রসাভাস বলে। সীতার প্রতি রাবণের ভালবাসা রসাভাস। অনেকে বলেন যে রসাভাস হইতে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। কিন্তু প্রেমে তন্ময়ীভাবদশায় রাবণের রতিভাবও শৃঙ্গাররসরূপে আস্বাদিত হয়। "যদ্যপি তত্র হাসরূপতৈব শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ধাস ইতি বচনাৎ

তথাপি পাশ্চাত্যেয়ং সমাজিকানাং স্থিতিঃ। তন্ময়ীভাবদশায়াং তু রতেরেব আস্বাদ্যতা শৃঙ্গাররতয়ৈব প্রতিভাতি।” অর্থের সহিত যুক্ত হইয়া শব্দের ব্যাপারের দ্বারাই ধ্বনি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বিভাবাদিরূপ অর্থ হর্ষানুকূল চিত্তবৃত্তি উৎপাদন করে। এই উৎপাদনের মূলে শব্দ ও অর্থের যে ব্যাপার থাকে বা তাদৃশ মনোবৃত্তি ব্যঞ্জিত হইবার যে উপযোগিতা থাকে তাহাকে ধ্বনি কহে। রসাদি বস্তু কখনও কোনও শব্দের অর্থ হইতে পারে না। বিভাবানুভাবাদির কোনও একটি উল্লিখিত হইলেও অন্যগুলি তাহার দ্বারাই আক্ষিপ্ত হইয়া রসস্ফূর্ত্তির কারণ হয়। ‘ব্রাহ্মণ তোমার পুত্র হইয়াছে’ এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণের যে আনন্দ হইয়াছে তাহা অনুমানে বুঝা যায়। ‘পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে’ স্থূল দেবদত্ত রাত্রে ভোজন করে না এইস্থলে অর্থাপত্তি কিংবা অনুমানের দ্বারা দেবদত্তের রাত্রিভোজন অনুমিত হয়. কিন্তু ধ্বনিস্থলে এরূপ কোনও অনুমান নাই। কিন্তু সমুদয় বাক্যেরই এমন একটি শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে যাহার দ্বারা রস ব্যঞ্জিত হয়। অভিনব আরও বলেন যে রসই বাস্তবিক কাব্যের আত্মা, বস্তু এবং অলঙ্কারধ্বনি শেষ পর্য্যন্ত রসেই পর্য্যবসিত হয়, এইজন্য তাহাদিগকে বাচ্যার্থ হইতে উৎকৃষ্ট বলা হয় এবং ধ্বনিই কাব্যের আত্মা এই কথা বলা হয়। বাল্মীকি ক্রৌঞ্চবিয়োগে ক্রৌঞ্চীর শোক দেখিয়া করুণরসে আপ্লুত হইয়াছিলেন এবং সেই পরিপূর্ণ করুণ রসের উচ্ছ্বসনপ্রবুক্ত তাঁহার মুখ দিয়া প্রথম কাব্য স্বচ্ছন্দভাবে বাহির হইয়া আসে। বাল্মীকি যে নিজে শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে। তবে তাঁহার শোকস্থায়িভাব তাঁহার মধ্যে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়া শ্লোকাকারে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছিল। স্থায়িভাব উদ্রিক্ত হইয়া হৃদয়কে পরিপূর্ণ না করিলে যথার্থ কাব্যরচনা হয় না। এইজন্য হৃদয়দর্পণকার বলিয়াছেন—“যাবৎ পূর্ণো ন চৈতেন

তাবন্নৈবৈবম্"। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ভট্টনায়ক যে বলিয়াছেন যে শব্দ ও অর্থ উভয়েই অপ্রধান হইয়া যখন কেবল ভাবকত্বব্যাপারই প্রধান হয় তখনই কাব্য-প্রতীতি হয় ইহা ঠিক নহে। গণপতি শাস্ত্রী ব্যক্তিবিবেকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে ভট্টনায়কই হৃদয়দর্পণের প্রণেতা। তাহা যে ভ্রমাত্মক তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায় যে অভিনব হৃদয়দর্পণের মত ভট্টনায়কের বিপরীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং হৃদয়দর্পণকে স্বমতের অনুসারি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই গণপতি যে লিখিয়াছেন যে ব্যক্তিবিবেকের টীকাকার হৃদয়দর্পণকে ধ্বনিধ্বংস-গ্রন্থ বলিয়া লিখিয়াছেন তাহাও অসঙ্গত।

কিন্তু কেবলমাত্র ধ্বনি থাকিলেই কাব্য হয় না। মনোহারী শব্দ ও অর্থ ও তাহাদের বিন্যাসের চাতুর্য্য ও অলঙ্কারাদি গুণযুক্ত হইলে যদি তাহা ধ্বনিপ্রবণ হয় তবেই তাহা রসসৃষ্টির অনুকূল হয়। "বিবিধং তত্তদভিব্যঞ্জনীয়রসানুগুণ্যেন বিচিত্রং কৃত্বা বাচ্যে চ রচনায়াং চ প্রপঞ্চেন সচ্চারুশব্দার্থালঙ্কারগুণযুক্তম্। তেন সর্ব্বত্রাপি ন ধ্বননব্যাপারসদ্ভাবেঽপি তথা ব্যবহারঃ। আত্মসদ্ভাবেঽপি ক্বচিদেব জীবব্যবহারঃ ইত্যুক্তং প্রাগেব। তেন এতৎ নিরবকাশম্। যদুক্তং হৃদয়দর্পণে সর্ব্বত্র তর্হি কাব্যব্যবহারঃ স্যাদিতি।" অভিনব বলেন যে, কোনও রসাস্বাদের সময়ে বিভাবানুভাবের উপযোগী চিত্তবৃত্তির যে আস্বাদন (emotional side) তাহাকেই রস বলে। চিত্তবৃত্তির এই আস্বাদের মূলে স্থায়িভাবের একান্ত উপযোগিতা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এজন্যই স্থায়িভাবই রসতা প্রাপ্ত হয় একথা বলা যায়। 'ঔচিত্যাৎ স্থায়িনো রসতাপত্তিরিত্যুচ্যতে'। প্রাক্তন এবং ইদানীন্তন ভাবে যাহা কিছু অনুভূত হইয়াছে তাহার আভ্যন্তরীণ সত্তা আমরা অনুমান করিতে পারি। বিভাবানুভাবের দ্বারা উপস্থাপিত চিত্তবৃত্তি যখন সেই সেই

পূর্ব্বতন অনুভূতির সংস্কারের সামঞ্জস্যে হৃদয়ের মধ্যে আত্মপরিচয় লাভ করে তখন তাহা আস্বাদনযোগ্য হয়। "প্রাক্ স্বসংবিদিতং পরত্রানুমিতং চ চিত্তবৃত্তিজাতং সংস্কারক্রমেণ হৃদয়সংবাদম্ আদধানং চর্ব্বনায়ামুপযুজ্যতে।" কোনও ব্যভিচারী ভাবও যদি আস্বাদিত হয় এবং সেই ব্যভিচারী ভাবের আস্বাদ যদি সেইখানেই পর্য্যবসিত বা সেইখানেই বিশ্রাম লাভ করে এবং তাহা যদি স্থায়িভাবের আস্বাদ পর্য্যন্ত না পৌছায় এবং সেইজন্য রস বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য না হয় তাহা হইলেও তাহা রসাস্বাদের অনুপ্রাণক হয় বলিয়া রসাস্বাদতুল্য বলিয়া অভিহিত হয়। "ভাবগ্রহণং ব্যভিচারিণোঽপি চর্ব্ব্যমাণস্য তাবন্মাত্রবিশ্রান্তাবপি স্থায়িচর্ব্বণাপর্য্যবমানোচিতরসপ্রতিষ্ঠাম্ অনবাপ্য অনুপ্রাণকত্বং ভবতি।" অতএব দেখা যাইতেছে যে কেবল যে স্থায়িভাব উদ্রিক্ত হইয়া রসানুভব হয় তাহা নহে, দূরবর্ত্তিভাবে ও রসানুগুণক হইলেও কাব্যত্ব স্বীকার করা যায়। এইজন্য যেখানে কেবলমাত্র অলঙ্কারধ্বনি বা বস্তুধ্বনি আছে সেখানে কোনও স্থায়িভাব উদ্রিক্ত না হইলেও তাদৃশ বস্তুধ্বনি বা অলঙ্কারধ্বনির চমৎকারিত্ব থাকিলে কিংবা কোনও ব্যভিচারী ভাব স্বতন্ত্রভাবে ফুটিয়া উঠিলে তাহার রসপর্য্যবসানতা স্বীকার করা যায়। এইসব স্থলে জগন্নাথ বলিয়াছেন, এরূপ দূরবর্ত্তিভাবে রসকে টানিবার কোনও প্রয়োজন নাই, চমৎকৃতি বা রামণীয়কত্ব থাকিলেও কাব্যত্ব হয়। তিনি বলেন যে দূরবর্ত্তিভাবে রসকে টানিতে গেলে 'নরো ধাবতি' ইহারও রসত্ব স্বীকার করিতে হয়, কারণ দৌড়ানো একটি অনুভাব। যখন দৌড়াইতেছে তখন নিশ্চয়ই তাহার কোনও ভয় হইয়াছে এইরূপ টানাটানি করিয়া সেখানেও রসস্বীকার করা যায়। অতএব শেষপর্য্যন্ত রসকেই প্রধান করার কোনও সার্থকতা নাই।

অপরিমিত শব্দ অপরিমিত অর্থ থাকিলেও কতকগুলি বিশেষ শব্দ ও বিশেষ অর্থই ব্যঞ্জনার উপযোগী। মহাকবিদের প্রয়োগ হইতে জানা শব্দেরও নূতন পরিচয় লাভ করা যায়। মহাকবিদের নিকট শব্দতত্ত্ব বা অর্থতত্ত্ব এমনভাবে প্রতিভাত হয় যে সেই প্রতিভানবলে তাঁহারা নূতন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হন। অভিনব প্রতিভার লক্ষণ দিয়াছেন "প্রতিভা অপূর্ব্ববস্তুনির্ম্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা" (creative intelligence)। যদিও ব্যঞ্জনাই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য তথাপি বাচ্য অর্থকে অবলম্বন করিয়াই ব্যঞ্জনা পরিস্ফূর্ত্ত হয়। আলোক পাইতে হইলে যেমন দীপশিখার জন্য যত্ন করিতে হয় তেমনি ব্যঙ্গ্য অর্থকে প্রকাশ করিবার জন্য তদুচিত বাচ্যার্থকে আহরণ করিতে হয়। পদের অর্থের দ্বারা যেমন বাক্যের অর্থ প্রকাশ পায় তেমনি বাক্যার্থের দ্বারা ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশ পায়। পদ যেমন আপন শক্তিবশতঃ বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়াও সেই সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে বাক্যার্থকে প্রকাশ করে, পদের অর্থ যেমন বাক্যার্থের মধ্যে আপনাকে অবিভক্তরূপে প্রকাশ করে, অর্থাৎ বাক্যার্থ-প্রতীতির সময়ে পদের অর্থ বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন বাক্যার্থের বোধ হয় এবং উভয়ের মধ্যে কোনও কালভেদ প্রতীত হয় না, তেমনি বাক্যার্থ বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই সহৃদয় ব্যক্তিরা ব্যঙ্গ্য অর্থ বুঝিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে অভিনব বলেন যে স্ফোটবাদীরা যেমন পদ ও পদার্থের, বাক্য ও বাক্যার্থের, পদার্থও বাক্যার্থের মধ্যে কোনও কালভেদ নাই, পদার্থই অখণ্ড বাক্যার্থরূপে কোনও ক্রমকে অপেক্ষা না করিয়া কোনও কালভেদকে অপেক্ষা না করিয়া যুগপৎ অখণ্ডরূপে বাক্যার্থরূপে প্রকাশ পায় এইমত বলেন—এখানে কিন্তু সেরূপ নহে। সহৃদয় ব্যক্তির চিত্ত বাক্যার্থে অতৃপ্ত হইয়া যখন অন্য কিছুর অনুসন্ধান করে তখনই ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীত

হয়। বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীতির মধ্যে যে কালভেদ কল্পনা করা যায় না তাহা নহে, কিন্তু তাহা লক্ষ্য করা যায় না (অসংলক্ষ্যক্রমঃ) এবং ব্যঙ্গার্থ প্রতীতিকালেও স্বতন্ত্রভাবে বাক্যার্থ প্রতীত হয়—"অনেন বিদ্যমান এব ক্রমেণ সংবেদ্যতে ইত্যুক্তম্। তেন যৎ স্ফোটাভিপ্রায়েণ অসন্নেব ক্রম ইতি ব্যাচক্ষ্যতে তৎ প্রত্যুত বিরুদ্ধমেব। বাচ্যেঽর্থে বিমুখো বিশ্রান্তিনিবন্ধনং পরিতোষমলভমান আত্মা হৃদয়ং যেষাম্ ইতি বাচ্যার্থবিমুখাত্মনাম্ ইত্যনেন সচেতসামিত্যস্য এবার্থো বিভক্তঃ।" এই প্রসঙ্গে ধ্বনির লক্ষণ দিতে গিয়া ধ্বনিকার বলিয়াছেন—

"যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জ্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥"

যেখানে শব্দ এবং অর্থ আপনাদিগকে গৌণ করিয়া কোনও অর্থ বিশেষকে অভিব্যক্ত করে তাদৃশ কাব্য বিশেষকেই ধ্বনি কহে। কেহ কেহ যে বলিয়াছেন যে যেহেতু প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা এই অভিনব ধ্বনি ব্যাপারটি অপ্রসিদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছেন, সেইজন্য ধ্বনিকে কাব্যলক্ষণ বলা যায় না, তাহা ঠিক নহে। কারণ তাঁহাদের নিকট ইহা অপ্রসিদ্ধ ছিল বলিয়াই যে ইহার অস্তিত্ব নাই তাহা নহে। কারণ তাঁহারা না জানিলেও কাব্যপরীক্ষা করিলে যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি ইহাকেই যথার্থ কাব্যের পরিচায়ক ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিবেন। ধ্বনি না থাকিলে কোনও রচনাকে কেবলমাত্র লেখা বলা যাইতে পারে, কাব্য বলা চলে না। ইহাও বলা চলে না যে ধ্বনি যখন একটি কমনীয়তা বিশেষমাত্র তখন তাহাকে ত অলঙ্কারের মধ্যেই গণনা করা যাইতে পারে। কারণ ধ্বনিব্যাপার বাচ্যবাচককে অতিক্রম করিয়া অন্য আর একটি বস্তু বা রসকে অভিব্যক্ত করে। যাহা কিছু বাচ্য বা বাচকের শোভা বর্দ্ধন করে তাহা ধ্বনির অঙ্গীভূত সন্দেহ নাই; কিন্তু

তাই বলিয়া তাহার সহিত ধ্বনির অভিন্নতা স্বীকার করা যায় না। যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থেরই উৎকর্ষ সাধন করে, সেখানে যথার্থই ধ্বনি হয় না। সমাসোক্তি অলঙ্কারের একটি উদাহরণ লইয়া আনন্দবর্দ্ধন তাহার তাৎপর্য্য দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্লেষযুক্ত বিশেষণের বলে যেখানে কোনও বিশেষ্য অপ্রস্তাবিত অর্থের সূচনা করিয়া প্রস্তাবিত বাচ্যার্থের শোভা বর্দ্ধন করে তাহাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার কহে;

যথা—

"উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোঽপি রাগাদ্ গলিতংন লক্ষিতম্॥"

সন্ধ্যাকালের ঈষৎ রক্ত চন্দ্র প্রোদ্ভিন্ন তারকাবলির সহিত সন্ধ্যাকে এমন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল যে পূর্ব্বদিকে সন্ধ্যার অরুণিমায় অন্ধকার খসিয়া পড়িলে তাহা যে রাত্রির প্রারম্ভকাল তাহা বুঝা যাইতেছিল না। এখানে উপোঢ়রাগ প্রভৃতি শব্দের অন্য অর্থও আছে। উপোঢ়রাগ শব্দের অর্থে যাহার প্রেমসঞ্চার হইয়াছে, বিলোলতারক শব্দের অর্থে প্রেমে যাহার চক্ষুতারকা চঞ্চল হইয়াছে, নিশামুখ অর্থে নিশারূপ কামিনীর মুখ, তিমিরাংশুক অর্থে কামিনীর বস্ত্র, পুরস্ শব্দের অর্থ পূর্ব্বদিক্ অথবা পূর্ব্বেই, রাগাৎ একঅর্থে লালরঙ্গের জন্য, অন্য অর্থ অনুরাগ বশতঃ। এখানে শ্লেষযুক্ত অর্থাৎ দ্ব্যর্থক বিশেষণের দ্বারায় চাঁদ এবং রাত্রি এই উভয়ের ভিতরে নায়ক-নায়িকা-ভাব অভিব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু এই ব্যঙ্গ্যার্থ স্বতন্ত্র হইয়া ফুটিয়া ওঠে নাই, বাচ্যার্থেরই শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। চাঁদ এবং রজনীই এইখানে প্রস্তাবিত বাচ্যার্থ। নায়ক-নায়িকা-ভাবের দ্বারাই বাচ্যার্থ সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে, ব্যাঙ্গার্থ প্রধান হয় নাই বলিয়া এখানে ধ্বনি স্বীকার করা যায় না। এখানে ধ্বনি প্রধান হয় নাই বলিয়া ইহাকে গুণীভূতব্যঙ্গ

বলা যায়। শব্দার্থ গৌণ হইলেই ধ্বনি হয়। মহিমভট্ট এখানে বলেন যে, বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়াই যদি ধ্বনি হয় তবে সেই বাচ্যার্থকে গৌণ করিতে হইবে, ইহা বলা যায় না। উপায়কে গৌণ করিলে উপেয়কে পাওয়া যায় না। কলসীকে তুচ্ছ করিলে জল আনা সম্ভব হয় না। "যো হি যদর্থমুপাদীয়তে নাসৌ তমেব উপসর্জ্জনী-করোতি ইতি যুক্তং বক্তুম্। যথা উদকাদ্যুপাদানার্থমুপাত্তো ঘটাদি-স্তদেবোদকাদি"। ধ্বনিকারের ধ্বনির একটি উদাহরণ লইয়া মহিম-ভট্ট তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। উদাহরণটি এই—

"সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্"॥

অভিনব বলেন যে সুবর্ণপুষ্প অসম্ভব এই জন্য যথাশ্রুত বাচ্যার্থ এখানে উদ্দিষ্ট নহে। এই জন্য এখানে সুবর্ণ পুষ্প অর্থে সমৃদ্ধি বুঝিতে হইবে। এখানে লক্ষণামূলক ধ্বনি হইয়াছে। মহিমভট্ট এখানে বলেন যে, এখানে যে সাধনের দ্বারা যে সাধ্য লব্ধব্য বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে তাহাই ফুটে নাই। শূর বা কৃতবিদ্য লোকের পক্ষে সুবর্ণ পুষ্প-চয়ন সম্ভব নহে।

আনন্দবর্দ্ধন বলেন যে, ব্যঙ্গ্য কোনও অর্থ থাকিলে তাহা হইতে যদি বাচ্য অর্থ অধিক চমৎকারী হয়, তাহা হইলেই তাহাকে ধ্বনিকাব্য বলা যায় না। এইজন্যই আক্ষেপ অলঙ্কারে ব্যঙ্গ্যবিশেষ বাচ্যার্থের চারুত্ব সাধন করে বলিয়া তাহাকে ধ্বনিকাব্য বলা যায় না। আক্ষেপের উদাহরণ যথা—

"অহং ত্বাং যদি নেক্ষেয়ং ক্ষণমপ্যুৎসুকা ততঃ।
যদেবাস্তু ততোঽনেন কিমুক্তেনাপ্রিয়েণ তে॥"

নায়িকা নায়ককে বলিতেছেন,—আমি যদি তোমাকে একটু কালও না দেখি তাহা হইলে এতই উৎকণ্ঠিত হই, থাক্—থাক্—এই পর্য্যন্তই থাক্, আর তোমার অপ্রিয় কথা বলিয়া লাভ কি ? এখানে আক্ষিপ্ত অর্থ এই যে তোমাকে একটুকাল না দেখিলেই আমি মরিয়া যাইতে পারি। 'মরিয়া যাইতে পারি' এই আক্ষিপ্ত অর্থটি—'থাক্ থাক্ বলিয়া লাভ কি' এই বাচ্যার্থকে চমৎকার করিয়াছে। যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ হইতে বাচ্যার্থ অধিক সুন্দর সেখানে তাহাকে ধ্বনিকাব্য বলা যায় না।

"অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্তৎপুরঃসরঃ।
অহো দৈবগতিঃ কীদৃক্ তথাপি ন সমাগমঃ।"

এখানে দিবস ও সন্ধ্যার নায়ক-নায়িকা আরোপ অপেক্ষা সন্ধ্যা ও দিবসের যে মিলন হয় না এই বাচ্যার্থই অধিক সুন্দর। যে অর্থটি অধিক চমৎকারী হয় তাহাই প্রধান। এইরূপ দীপক এবং অপহ্নুতি প্রভৃতিতে উপমা ব্যঙ্গ্য হইলেও প্রধানভাবে বিবক্ষিত নয় বলিয়া তাহাকে ধ্বনিপ্রধান বলা যায় না।

"মণিঃ শাণোল্লীঢ়ঃ সমরবিজয়ী হেতিদলিতঃ
কলাশেষশ্চন্দ্রঃসুরতমৃদিতা বালবনিতাঃ।
মদক্ষীণো নাগঃ শরদি সরিদাশ্যানপুলিনা,
তনিম্না শোভন্তে গলিতবিভবাশ্চার্থিষু জনা ঃ।"

অপহ্নুতি অলঙ্কারে

"নেয়ং বিরৌতি ভৃঙ্গালী মদেন মুখরা মুহুঃ।
অয়মাকৃষ্যমাণস্য কন্দর্পধনুষো ধ্বনি ঃ।"

এখানে ভৃঙ্গালির গুঞ্জনের সহিত কন্দর্পের ধনুকের ধ্বনির তুলনা অপেক্ষা নিষেধমুখে বর্ণনারই অধিক চারুত্ব। এখানে মহিমভট্ট বলেন

যে, স্বার্থ উপসর্জ্জনীভূত হইয়া যাহা প্রতীত হয় তাহাই যদি ধ্বনি হয়, তবে দীপক অপহ্নুতি প্রভৃতি অলঙ্কারস্থলে প্রতীয়মান উপমাদির অধিকতর চারুত্ব কেমন করিয়া অঙ্গীকার করা যায়? দীপক অপহ্নুতি প্রভৃতির মনোহারিত্ব কেবলমাত্র বাক্যভঙ্গীর উপরই নির্ভর করে। যাহা কেবলমাত্র বাক্যভঙ্গীর উপরই নির্ভর করে, তাহা অপেক্ষা ব্যঞ্জিত উপমাদির চারুত্ব কেন কম হইবে? "উপমানুপমেয়ভাবাদ্যভিধান-পরতয়ৈব দীপকাদ্যলঙ্কারভঙ্গিভণিতিসমাশ্রয়ণতঃ প্রতীয়মানস্যৈব চালঙ্কারাদেশ্চারুত্বাতিশয়যোগাৎ তাবন্মাত্রনিবন্ধনত্বাচ্চ তদ্‌ধ্বনিব্যবহার-স্যেতি কথং তৎপ্রতিষেধসিদ্ধিঃ"? বাক্যভঙ্গী বহিরঙ্গ বস্তু। এই বহিরঙ্গ বস্তু অপেক্ষা উপমা কেন ন্যূনবল হইবে? মহিমভট্ট বলেন যে, অর্থপ্রতীতি বাধিত হয় বলিয়াই নূতন অর্থের অনুসন্ধান বশতঃ লাক্ষণিক অর্থ বা তথাকথিত ব্যঞ্জিত অর্থের প্রতীতি হয় এবং তাহার ফলেই মুখ্য অর্থটি গৌণ হইয়া যায়। কিন্তু প্রধানভাবে কোন রচনা-কৌশলের দ্বারা মুখ্য অর্থটি যে আপনা আপনি গৌণ হইয়া যাইবে তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। কাজেই ধ্বনিকার যে লক্ষণ করিয়াছেন যে, যেখানে কোন শব্দ তাহার আপন মুখ্য অর্থকে গৌণ ভাবে প্রকাশ করে সেইখানেই ব্যঙ্গ্য হয়—এই লক্ষণ অসঙ্গত। পুনশ্চ শব্দের অর্থই গৌণ হয়, কাজেই লক্ষণ-বাক্যে শব্দগ্রহণও ব্যর্থ। শব্দ মাত্রই তাহার আপন অভিধা-লভ্য অর্থকে প্রকাশ করিয়া নিশ্চেষ্ট হয়। অন্য কোন অর্থ বুঝাইবার জন্য তাহার স্বতন্ত্র কোনও ব্যাপার নাই। এই জন্যই শব্দ মুখ্য অর্থ বুঝাইয়া অন্য কোন গৌণ অর্থ আপনা আপনি বুঝাইতে পারে না। "ন চাস্য স্বার্থাভিধানমাত্রপর্যবসিতসামর্থ্যস্য ব্যাপারান্তর-মুপপদ্যতে, যেনায়মর্থান্তরমবগময়েৎ, তদপেক্ষং চোপসর্জ্জনীকৃতার্থত্ব-মিয়াৎ।" অভিধাবৃত্তির দ্বারা শব্দের মুখ্য অর্থরূপে যাহা পাওয়া যায়

তদতিরিক্ত আর যে কোন অর্থই পাওয়া যাক না কেন, তাহাই অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। শব্দ বা পদের ব্যুৎপত্তি যাহাই থাকুক না কেন, ব্যুৎপত্তি-নিবন্ধন শব্দের ব্যবহার হয় না। কিন্তু যে শব্দের যেরূপ অর্থে প্রয়োগ, সেই প্রয়োগনিবন্ধনই তাহার ব্যবহার হয়। গম্ ধাতু হইতে গো শব্দ হইয়াছে বলিয়া যাহা চলে তাহাকেই গরু বলে না। শব্দমাত্রই কোনও বস্তুবিশেষকে বুঝাইয়া থাকে এবং কোনও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইলে তাহা বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই ব্যবহৃত হইতে পারে। কোনও শব্দের মধ্যে যে ধাত্বর্থ থাকে তাহা বহিরঙ্গ। তাহার অন্তরঙ্গ অর্থ কোনও বস্তু-বিশেষ।

"যঃ কশ্চিদর্থঃ শব্দানাং ব্যুৎপত্তৌ স্যান্নিবন্ধনম্।
প্রবৃত্তৌ তু ক্রিয়ৈবৈকা সত্তা সাদনলক্ষণা॥
এবঞ্চ বিপচ্য ঘটো ভবতীতি ক্তোঽস্য পূর্বকালত্বম্।
ঘটনাপেক্ষং জ্ঞেয়ং ভবনাপেক্ষন্তু নাসমন্বয়তঃ॥
তস্মান্নামপদেভ্যো যঃ কশ্চিদর্থঃ প্রতীয়তে।
ন স সত্তামনাসাদ্য শব্দবাচ্যত্বমর্হতি॥"

অর্থ দুই প্রকার, বাচ্য এবং অনুমেয়। যাহা কেবলমাত্র শব্দব্যাপারের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই বাচ্য বা মুখ্য অর্থ বলে, আর সেই বাচ্য অর্থ হইতে আর যে অর্থই পাওয়া যায় তাহাই অনুমেয়। এই অনুমেয়ার্থ তিন প্রকার—বস্তু, অলঙ্কার ও রসাদি। বস্তু এবং অলঙ্কার কোনও সময়ে বাচ্যার্থও হইতে পারে; কিন্তু রসাদি সর্ব্বদাই অনুমেয়। কোনও পদের মুখ্য অর্থ কখনও অনুমেয় নহে, তাহা বাচ্য। বাক্যের অর্থের মধ্যে নানা অংশ আছে। এই অংশগুলির পরস্পর বিভিন্ন প্রকারের সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধগুলি যদি এমন হয় যে তাহা কোনও সিদ্ধবস্তু বা fact বুঝায় তবে তাহাকে সিদ্ধ বাক্যার্থ বলে। যেমন,—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।"
কিন্তু কোনও রূপ কারণপ্রয়োগের দ্বারা যদি কোনও বক্তব্য বিষয় স্থাপন করা হয়, তাহাকে সাধ্য সাধনরূপ বাক্যার্থ বলে। এই কারণ-প্রয়োগ লৌকিক, শাস্ত্রগত বা আধ্যাত্মিকবিষয়ক হইতে পারে। লোক-প্রসিদ্ধ কারণ প্রয়োগের একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"কয়াসি কামিন্ সরসাপরাধঃ পাদানতঃ কোপনয়াবধূতঃ।
যস্যাঃ করিষ্যামি দৃঢ়ানুতাপং প্রবালশয্যাশরণং শরীরম্॥"

এখানে সরসাপরাধ বলিয়াই নায়ক পদানত হইয়াছিলেন, এবং নায়িকাও কোপনস্বভাবা বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এই বর্ণনা একান্তই লৌকিক। শাস্ত্রসিদ্ধ কারণ যেমন—

"অযাচিতারং নহি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক"।

অর্থ এই, শিব কন্যাকে যাজ্ঞা করেন নাই বলিয়া হিমালয় তাঁহার নিকট কন্যাদানের প্রস্তাব করিতে পারেন ; কিন্তু শাস্ত্রে আছে, অন্য সকল বস্তুই বিনা যাজ্ঞায় দেওয়া যায়, কিন্তু অন্ন, বিদ্যা এবং কন্যা বিনা যাজ্ঞায় দেওয়া যায় না। ইহার আরও বহুপ্রকার ভেদ মহিম ভট্ট দেখাইয়াছেন। আনন্দ বর্দ্ধন—

"সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্" ॥

এই শ্লোকটিকে ধ্বনির উদাহরণরূপে বলিয়াছেন ; কিন্তু মহিমভট্ট বলেন যে, বীর প্রভৃতির পক্ষে ধনলাভ অত্যন্ত সুলভ, এ অর্থটি অনুমানের দ্বারা বুঝা যায়।

"এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী" ॥

এই শ্লোকটি হইতে বিবাহের কথা শুনিয়া পার্ব্বতীর লজ্জা হইয়াছিল ইহা অনুমান করা যায়। ধ্বনিকার প্রভৃতি ইহাকে ব্যঞ্জনার উদাহরণ বলিয়া গণনা করিবেন। যে সমস্ত স্থলে বস্তুধ্বনি হয় বা অলঙ্কারধ্বনি হয় বলিয়া আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মহিমভট্ট বলেন যে সেই সমস্ত স্থলেই বাক্যার্থের দ্বারা যে তাদৃশ বস্তু বা অলঙ্কার অনুমিত হইতেছে, এই সাধ্যসাধন-ভাব যে বিভিন্নকালে ঘটিতেছে তাহা লক্ষ্য করা যায়। কেবল রসাদির অনুমানস্থলে সাধন-সাধ্যের পৌর্ব্বাপর্য্য লক্ষ্য করা যায় না। এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য লক্ষ্য করা যায় না বলিয়া এবং বাক্যার্থের সঙ্গে সঙ্গেই তথা-কথিত ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয় বলিয়া তাদৃশ তথাকথিত ব্যঙ্গ্যার্থকে আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি ধ্বনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যথা চ বাক্যার্থবিষয়ে সাধ্যসাধনভাবে সাধ্যসাধনপ্রতীত্যোঃ সুলক্ষ্যঃ ক্রমভাবঃ তথা বস্তুমাত্রাদাবনুমেয়বিষয়েঽপ্যবগন্তব্যঃ কেবলং রসাদিষ্বনুমেয়েষ্বয়ম অসংলক্ষ্যক্রমো গম্যগমকভাব ইতি সহভাবভ্রান্তিমাত্রকৃত স্তত্রান্যেষাং ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবাভ্যুপগমঃ, তন্নিবন্ধনশ্চ ধ্বনিব্যপদেশঃ"। বাচ্যার্থে তাদৃশ চমৎকারিত্ব হয় না বলিয়া বিধি-নিষেধমুখে কিংবা অনুমানাদি উপায়ে একটি নূতন অর্থ প্রকাশ করিয়া কবিরা কাব্যের চমৎকারিত্ব সাধন করেন। তথা-কথিত বস্তুধ্বনি বা অলঙ্কারধ্বনি স্থলে যে বাচ্যার্থের দ্বারা তাদৃশ বস্তু বা অলঙ্কার অনুমান করা যায় তাহাতে কাহারও ভ্রম হইবার কথা নাই। কাজেই সে স্থলে কোনও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাব মানা যায় না। কিন্তু রসানুমিতিস্থলে বিভাবাদি বাক্যার্থ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই রসাদির প্রতীতি জন্মে বলিয়া সেখানে ব্যঞ্জনা হয়, এইরূপ প্রতীতি কাহারও কাহারও হইতে পারে। কিন্তু আনন্দবর্দ্ধনপ্রভৃতিও স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতীতির সময়েও বাচ্যার্থ তিরোহিত হয় না,

এবং বাচ্যার্থের সহিত অবিনাভাব সম্বন্ধে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীত হয়। প্রদীপের দ্বারা যখন ঘট প্রকাশিত হয় তখনও প্রদীপের আলো সমানই থাকে।

ইহার উত্তরে মহিমভট্ট বলেন যে ধ্বনিবাদীরা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ বিভিন্নকালে প্রতীত হয়। কেবলমাত্র বাচ্যার্থ-বোধের পর এত শীঘ্র ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীত হয় যে, মনে হয় যেন তাহারা এককালেই প্রতীত হইল। ধ্বনি-বাদীরাই বলিয়াছেন, "নহি বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিণ এব রসা ইতি কস্যচিদবগমঃ। অতএব বিভাবাদি-প্রতীত্য-বিনাভাবিনী রসাদীনাং প্রতীতিরিতি তৎপ্রতীত্যোঃ কার্য্যকারণভাবেনাবস্থানাৎ ক্রমঃ অবশ্যম্ভাবী। স তু লাঘবাৎ ন লক্ষ্যতে ইতি অলক্ষ্যক্রমা এব সন্তো ব্যঙ্গ্যা রসাদয়ঃ।" যদি বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থের ভিতরে অবিনাভাবিত্বই থাকে, তবে তাহাকে অনুমান বলিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? অবিনাভাবিত্বই অনুমানের লক্ষণ। "অবিনাভাবাবসায়পূর্ব্বিকা হি অন্যতঃ অন্যস্য প্রতীতি-রনুমানমিতি অনুমানলক্ষণম্।"

বিভাবাদির দ্বারা যেখানে রসভাবাদির প্রতীতি হয় সেখানে হৃদয়চমৎকারকারী আনন্দস্বাদ উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। ইহাই তাহার স্বভাব। লৌকিক হেতু হইতে উৎপন্ন হইলে বিভিন্ন রসের তাদৃশ আনন্দাস্বাদ হইতে পারে না। লৌকিকহেতু এবং বিভাবাদিহেতু বিভিন্নস্বভাবের। লৌকিকহেতুই কবি, নটপ্রভৃতির দ্বারা বর্ণনাচাতুর্য্যে হৃদয়ে উত্থাপিত হইলে রসকে প্রকাশিত করে। লৌকিকহেতু অকৃত্রিম, বিভাবাদিহেতু কৃত্রিম। কৃত্রিম বিভাবাদির দ্বারা অসত্যভূত রত্যাদি ভাবের প্রতীতি হয়। প্রত্যক্ষ এবং সত্যভূত বস্তুর অনুভবে মনে যে ভাব হয়, এই অসত্যভূত রত্যাদিভাবের আস্বাদ তাহা হইতে অনেক চমৎকারকারী—

"কবিশক্ত্যর্পিতা ভাবাস্তন্ময়ীভাবযুক্তিতঃ।
তথাস্ফুরন্ত্যমী কাব্যাৎ ন তথাধ্যক্ষতঃ কিল"।

প্রত্যক্ষগোচর যে সমস্ত ভাব তাহা হইতে অনুমানগোচর রত্যাদি ভাবের আস্বাদ যে অধিকতর মনোহারী এ সম্বন্ধে তর্ক করা চলে না। কারণ বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন স্বভাব, তাহা তর্কের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না।

"সোঽপি চ তেষাং ন তথা স্বদতে যথা তৈরেব অনুমেয়তাং নীত ইতি স্বভাব এবায়ং ন পর্য্যনুযোক্তব্যঃ।"

ধ্বনিকারপ্রভৃতিরা রসকে অভিব্যক্তি-স্বরূপ বলিয়াছেন। সম্বন্ধ-স্মরণ ব্যতিরেকে সৎ বা অসৎ যাহা কিছু প্রকাশকের সহিত যুগপৎ প্রকাশিত হয়, তাহাকেই অভিব্যক্ত বলে। "সতোঽসত এব বা অর্থস্য প্রকাশমানস্য সম্বন্ধস্মরণানবেক্ষিণা প্রকাশকেন সহৈব প্রকাশ-বিষয়তাপত্তিরভিব্যক্তিরিতি তল্লক্ষণমাচক্ষতে।" ধ্বনিকার নিজেই বলেন, "স্বরূপং প্রকাশয়ন্নেব পদার্থাবভাসকো ব্যঞ্জক ইত্যুচ্যতে যথা প্রদীপো ঘটাদেঃ"। তাৎপর্য্য এই—যাহা পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছে এবং সংস্কাররূপে অন্তরে অন্য আকারে রহিয়াছে তাহা যদি কোনও অবিনাভাবী অর্থান্তরের দ্বারা বা প্রতিপাদক শব্দের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয় তাহা হইলে রসাস্বাদ হয়। এখানে যে বস্তু ছিল তাহা কোনও প্রতিবন্ধকের জন্য প্রকাশ হইতে পারিতেছিল না, কোনও প্রকাশক আপনাকে একান্ত গৌণ করিয়া প্রতিবন্ধক দূর করিয়া তাহাকে আপনার সহিত প্রকাশ করে, প্রদীপ যেমন ঘটকে প্রকাশ করে সেইরূপ। "তস্যৈব আবির্ভূতস্য কুতশ্চিৎ প্রতিবন্ধাৎ অপ্রকাশমানস্য প্রকাশকেন উপসর্জ্জনীকৃতাত্মনা সহৈব প্রকাশঃ"। এই অনুসারে ধ্বনিকে যে অভি-ব্যক্ত বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গত নহে। কারণ সৎ বস্তুই অভিব্যক্ত

হইতে পারে। প্রতীয়মান রসাদি যে অননুভূত অবস্থায় ছিল তাহা কি করিয়া বলা যায়? ধ্বনিবাদীরা বলেন যে, বাচ্যার্থ হইতে রসাদি অর্থ প্রতীত হয়। কোনও অর্থ হইতে যদি অন্য আর একটি অর্থ প্রকাশিত হয় তবে তাহাকে অনুমানই বলিতে হয়। বাচ্য অর্থ হইতে অর্থান্তরের প্রতীতি অবিনাভাব সম্বন্ধ ব্যতিরেকে হইতে পারে না। ধূমাগ্নি প্রতীতি স্থলে যেরূপ কালভেদ দেখা যায় এখানেও বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে সেইরূপ কালভেদ স্বীকার করা হয়—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বস্তু ও অলঙ্কার সম্বন্ধে এই কালভেদ অনুভব করা যায়। রসপ্রতীতির সময় শীঘ্রতা-প্রযুক্ত তাহা অনুভব করা যায় না। ধ্বনিবাদীরাও স্বীকার করিবেন যে, বিভাবাদি কৃত্রিম কারণের দ্বারা রত্যাদি স্থায়িভাব কবিদের প্রযত্নে প্রতীতিপথে আনীত হইয়া হৃদয়-সংবাদবশতঃ আস্বাদিত হইয়া থাকে। রসাদি যদি কার্য্য হয় তবে বিভাবাদি কারণের সহিত এক সময়ে তাহাদের ঘটনা হইতে পারে না। কারণ ও কার্য্যের একসময়ে থাকা অসম্ভব। অতএব যদি বাচ্যার্থ হইতে প্রতীয়মান অর্থটি অবগত হওয়া যায়, তবে সে অর্থই হোক, অলঙ্কারই হোক, রসই হোক তাহাকে অনুমানগম্যই বলিতে হয়।

ধ্বনিবাদীরা শব্দের ব্যঞ্জকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ প্রতীয়মান অর্থটি বাচ্যার্থ হইতেই পাওয়া যায়, শব্দের সেখানে কোনও উপযোগিতা নাই। পুনশ্চ যদি ধ্বনি না হইলে কাব্য না হয় এবং যদি ধ্বনি হইলেই কাব্য হয়, তবে কাব্যের মধ্যে কোনও উৎকৃষ্টতা থাকে না। রস থাকিলেই তাহাকে কাব্য বলা যায়, কিন্তু রসের বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত কাব্যের বৈশিষ্ট্য হয় এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ রসের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিবার কোনও স্বতন্ত্র মাপকাঠি নাই। আর যদি ধ্বনি

হইলেই কাব্য হয় তবে অলঙ্কারধ্বনি বা বস্তুধ্বনি হইতে রসধ্বনিকে কেন শ্রেষ্ঠ বলিব ?

কারণ ধ্বনিবাদীরা কেবলমাত্র প্রতীয়মান অর্থটি ধ্বনিত হয় ইহা ছাড়া কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের কোনও সহায়তা করেন নাই। সমস্ত দিক্ পর্য্যালোচনা করিলে ধ্বনিবাদীরা যাহাকে ধ্বনি বলেন তাহা একটি ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ বা অনুমানগম্য অর্থ ছাড়া আর কিছুই নহে। কোনও শব্দের কোনও বিশেষ ব্যঞ্জনাখ্য বৃত্তি দ্বারা তাদৃশ রসাদির প্রতীতি হইতে পারে না। শব্দ কখনও তাহার মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না, যদি অন্য অর্থ আরোপ করিতে হয় তবে তাহা সাদৃশ্যাদিগুণের দ্বারাই সম্ভব হয়। শব্দের মুখ্য অর্থের সহিত বহু দূরবর্ত্তিভাবে তথাকথিত ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি হয়। তথাকথিত ব্যঙ্গ্য অর্থকে কোনপ্রকারেই শব্দের বৃত্তিলভ্য অর্থ বা শব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এইজন্যই প্রতীয়মান অর্থটিকে অনুমান গম্য অর্থ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে শব্দের মুখ্যার্থই দীর্ঘীকৃত হইয়া ব্যাঙ্গ্যার্থ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া তাহাকে প্রতিপাদন করে, কোনও নিপুণ ধানুষ্ক যেমন ধনুকে যোজনা করিয়া বাণ পরিত্যাগ করিলে শত্রুর উরস্ত্রাণ ভেদ করিয়া তাহার বক্ষঃ ভেদ করে এবং প্রাণহরণ করে। অথচ এই বিভিন্ন কার্য্যসাধনে তাহাকে বিভিন্ন ব্যাপার আশ্রয় করিতে হয় না; সেইরূপ ব্যবহার-প্রযুক্ত শব্দ তাহার স্বার্থকে বুঝাইয়া সেই প্রবৃত্তির দ্বারাই ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি উৎপাদন করে। ব্যঙ্গ্য অর্থকে বুঝিবার জন্য তাহাকে ব্যাপারান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। মহিম ভট্ট বলেন যে, শব্দের সাক্ষাৎ শক্তি দ্বারা প্রতীয়মান অর্থের বোধ হইতে পারে না। যদি পরম্পরাক্রমে তাহার বোধ হয় তবে হেতু-ফল-ভাব না মানিয়া

উপায় নাই। মধুমাসে যেমন বৃক্ষ আপনিই পুষ্পিত হয় এবং সেই হিসাবে মধুমাসকে পুষ্পের সাক্ষাৎ কারণ বলা যাইতে পারে, সেই হিসাবে কুম্ভকারকে কুম্ভের কারণ বলা যায় না। কুম্ভকারকে কুম্ভ প্রস্তুত করিতে হইলে পরম্পরাক্রমে অনেক কার্য্য করিতে হয়, সেই সমস্ত হেতু-পরম্পরা না থাকিলে কুম্ভ-নির্ম্মাণ হইতে পারে না। এইজন্য যেহেতু প্রতীয়মান অর্থটি বিভাবাদি অর্থ-পরম্পরার ব্যাপারের ফলে উদ্ভাসিত হয়, সেইজন্য ইহাকে শব্দের ব্যাপার বলা যায় না। "অর্থস্যৈব ব্যাপারেঽভ্যুপগন্তুং যুক্তো ন শব্দস্য। নহি যৎ পুত্রস্য ব্যাপারঃ স পিতুরেব ইতি মুখ্যতয়া শক্যতে বক্তুম্। তয়োরন্যোন্যব্যাপার-সাঙ্কর্য্যদোষপ্রসঙ্গাৎ"। শরের ব্যাপারের সহিত শব্দের ব্যাপারের কোনও তুলনা হয় না। তীর যেমন ছেদনাদি ক্রিয়াকে তার একটি ব্যাপারের দ্বারাই সম্পন্ন করিয়া থাকে, শব্দ তাহা পারে না। সঙ্কেতকে লইয়াই শব্দের ব্যাপার, যেখানে সঙ্কেত নাই সেখানে শব্দের ব্যাপারই নাই। অভিধেয় অর্থই শব্দের সঙ্কেত; সেইজন্য শব্দের ব্যাপারের দ্বারা কেবল মাত্র মুখ্য অর্থেরই সঙ্কেত থাকে। ব্যাপার না থাকিলেও যদি অনুমেয় অর্থের প্রতীতি হয় তবে যে কোন শব্দ হইতে যে কোন অর্থের প্রতীতি হইতে পারে। মহিমভট্ট কুন্তকের বক্রোক্তিরও তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বক্রোক্তি বলিয়া কোনও ব্যাপারের কথা আমরা জানি না। বিভাবাদি সংগ্রন্থনই কবির ব্যাপার। মহিমভট্ট বলেন যে কুন্তক যাহা বক্রোক্তি বলিয়াছেন, তাহাও অনুমান ছাড়া আর কিছুই নহে।

মহিমভট্টের বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, যদিও তিনি অবিনাভাব-সম্বন্ধ স্মরণকে অনুমানের প্রতি প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতির সময়ে যে তাদৃশ কোনও

ব্যাপ্তির স্মরণ হয় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। অবিনাভাবিত্ব থাকিলেই বা অবিনাভূতরূপে প্রকাশিত হইলেই যে তাহা অনুমান হয় তাহা বলা যায় না। পুষ্পরূপের প্রকাশেই পুষ্পের প্রকাশ। এখানে পুষ্পরূপের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অবিনাভূতরূপে যে পুষ্পের জ্ঞান হয়, ইহাকে অনুমান বলা চলে না। বিভাবাদি ব্যাপারের দ্বারা যদি অন্তর্গত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহা আস্বাদিত হয়, তবে তাদৃশ রসাস্বাদকে অনুমানগম্য অর্থ বলা যায় না।

আনন্দবর্দ্ধন এমন কথা বলেন না যে, অর্থান্তর-প্রতীতি হইলে তাহাতে উত্তম ধ্বনি হইবে। তাঁহার বক্তব্য এই যে, যদি প্রতীত অর্থ বাচ্যার্থ হইতে প্রধান হয় অর্থাৎ অকথিত মনোহর হয় তবেই তাহা ধ্বনি হইবে। এইজন্য বিশেষোক্তি অলঙ্কারস্থলে প্রতীত অর্থটিকে ধ্বনি বলা যায় না। যথা—

"কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্ যো জনে জনে।
নমোঽস্ত্ববার্য্যবীর্য্যায় তস্মৈ কুসুমধন্বনে॥"

এখানে ধ্বনিত তনুহীন বীর্য্যের অচিন্ত্যতা অপেক্ষা বাচ্যার্থ অধিক সুন্দর। যদি কোনও অলঙ্কারের ব্যঙ্গ্যার্থ অধিকতর চারু হয় তবে সেইখানেই ধ্বনি স্বীকার করা যাইতে পারে। এইজন্য যদিও কোনও কোনও অলঙ্কারে ধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি অলঙ্কার হইতে ধ্বনি ব্যাপক। এইজন্য অলঙ্কারের মধ্যে ধ্বনি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে একথা বলা চলে না। অনেকে বলেন যে, ভামহ যে অলঙ্কার ধরিয়াছেন তাহার মধ্যে ধ্বনি অন্তর্ভুক্ত, তাহা ঠিক নহে। ভামহ পর্য্যায়োক্ত প্রভৃতি যে সমস্ত অলঙ্কারের উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার কোথাও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য দেখা যায় না। এইজন্য সেগুলিকে ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সে সমস্ত স্থলে বাচ্যার্থই প্রধান হইয়াছে এবং তাহাতেই

তাহার ধ্বনিত্বের হানি হইয়াছে। এইরূপ অপহ্নুতি ও দীপকস্থলেও বাচ্যার্থের প্রাধান্য-প্রযুক্ত প্রতীয়মান অর্থের ধ্বনিত্ব স্বীকার করা যায় না। সঙ্কর অলঙ্কারস্থলেও এইরূপ বলিতে হয়। সঙ্কর অলঙ্কারস্থলে অলঙ্কারবিন্যাসের এই বৈচিত্র্য আছে যে একটি অলঙ্কারের মধ্যে আর একটি অলঙ্কারের ছায়া পাওয়া যায়। অভিনবের একটি শ্লোক দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে। "শশিবদনা সিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্" এস্থলে শশী ইহার বদন অথবা শশীর ন্যায় বদন এই দুই অর্থে রূপক ও উপমা উভয়েরই প্রাপ্তি হয়। কাজেই ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি বাচ্য, কোন্‌টি ব্যঙ্গ্য—ইহার নির্ণয় করা যায় না। যদি কোনও স্থলে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রধান হয়, তবে সেস্থলে ধ্বনি স্বীকার করা যায়, কিন্তু কেবল মাত্র তাহাই যে ধ্বনি ইহা স্বীকার করা যায় না। অপ্রস্তুতপ্রশংসাস্থলে বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মান অর্থ তুল্য বলশালী। যেমন—

"অহো সংসারনৈর্ঘৃণ্যমহো দৌরাত্ম্যমাপদাম্।
অহো নিসর্গজিহ্মস্য দুরন্তা গতয়ো বিধেঃ।"

এখানে প্রস্তাবিত আপদের দৌরাত্ম্য প্রভৃতির দ্বারা অপ্রস্তাবিত দৈব ব্যাপারেরই নিরঙ্কুশতা সূচিত হইয়াছে। বিশেষের দ্বারা সাধারণকে সূচিত করা হইয়াছে এবং উভয়ই তুল্যবলশালী। সমাসোক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত অলঙ্কার স্থলে ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রাধান্য নাই সেখানে অলঙ্কারই বাচ্য। ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতিমাত্রেই ধ্বনি হয় না, তাহার প্রাধান্য থাকা চাই। এইজন্য যেখানে বাচ্যার্থ প্রধান হয় সেখানে অলঙ্কারিতা স্বীকার করা যায় না। তাই লোচনকার লিখিয়াছেন—"ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে তু ন কচিৎ অলঙ্কারতা ইতি নিরূপিতম্।" অলঙ্কার, গুণ এবং রীতি—ইহারা কাব্যের অঙ্গস্বরূপ বা অবয়ব-স্বরূপ।

অবয়ব ও অবয়বী এক নহে, অবয়ব-সমুদয় ও অবয়বী নহে। ধ্বনি কাব্যের অঙ্গী।

ধ্বনি-শব্দ যে কেবল ধ্বনিকারই আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে। ইহার পূর্ব্বেও অন্যান্য স্থলে ধ্বনিশব্দের ব্যবহার দেখা যায়। শ্রোত্রপটহে ক্রমধারায় আগত শব্দপরম্পরার শেষ অংশ যখন শ্রুত হয় তখন বলা হয় যে শব্দ শোনা গেল। শব্দটি কর্ণে প্রবেশের পর ঘণ্টা বাজানো শেষ হইলে যেমন তাহার একটি রেশ শোনা যায়, সেইরূপ একটি রেশ থাকে তাহাকে ধ্বনি বলে। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন যে, সংযোগ-বিয়োগাদি কারণের দ্বারা শব্দ হইতে উৎপন্ন শব্দকে ধ্বনি বা স্ফোট কহে।

"স সংযোগবিয়োগাভ্যাং করণৈরুপজন্যতে।
স স্ফোটঃ শব্দজঃ শব্দো ধ্বনিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥"

অভিনব বলেন যে ব্যঙ্গ্য অর্থটিও ঘণ্টানাদের রেশের ন্যায় উপলক্ষিত হইয়া থাকে। অব্যক্ত শব্দের বিষয় এইভাবে নির্দ্দেশ করিয়া ব্যক্তশব্দ সম্বন্ধে ভর্তৃহরি বলিয়াছেন যে, বর্ণনাসমষ্টির শেষ অংশটুকু পর্য্যন্ত গৃহীত হইলে, তাহারা যে স্ফোটার্থকে অভিব্যঞ্জিত করে, তাহাকে ধ্বনি বলা হয়। এতৎসাদৃশ্যে ব্যঞ্জক শব্দার্থকেও ধ্বনি বলা হয়। এখানে বক্তব্য এই যে, যদিও এস্থলে অভিনব স্ফোটের সহিত ধ্বনির সাজাত্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি অন্যত্র তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ধ্বনি স্ফোট-জাতীয় নহে, কারণ স্ফোটে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকের মধ্যে কোনও ক্রম বা কালভেদ নাই বা উপায়-উপেয় ভাব নাই। কিন্তু ধ্বনিস্থলে বাচ্য-ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে কালভেদ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বর্ত্তমানস্থলে ভর্তৃহরি যে বাক্যটি তুলিয়াছেন তাহা হইতেও স্ফোট যে ঘণ্টানাদের অনুরণনের ন্যায় বা রেশের ন্যায়

—তাহা বুঝায় কি না সন্দেহের বিষয়। মুদ্রিত গ্রন্থে—"ধ্বনিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ" পাঠ নাই—"ধ্বনয়োঽন্যৈরুদাহৃতাঃ" এই পাঠ আছে। পুণ্যরাজের টীকাতেও এই পাঠ গৃহীত হইয়াছে। পুণ্যরাজ তাঁহার টীকাতে লিখিয়াছেন যে ক্ষীণ প্রদীপের দ্বারা বস্তুর রূপ যেমন ক্রমশঃ স্পষ্ট হয় সেইরূপ বর্ণস্মৃতিকে যাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত করিয়া তোলে তাহাকে ধ্বনি কহে। আর একটি বৈকল্পিক অর্থ দিতে গিয়া পুণ্যরাজ বলিয়াছেন যে, তাল্বাদির সংযোগ ও বিয়োগের ফলসম্ভূত নাদের দ্বারা শব্দ অভিব্যক্ত হয়। নাদই ধ্বনি, ধ্বনি বা নাদ ক্রমশঃ উপচিত হইলে, তাহা দ্বারা বর্ণের অভিব্যক্তি হয়—এই অর্থের সহিত অভিনবের প্রদত্ত অর্থের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় না। তবে ধ্বনি বা নাদের দ্বারা স্ফোটের যেরূপ অভিব্যক্তি হয়, বাচ্যার্থের দ্বারা তেমনি প্রতীয়মান অর্থ অভিব্যক্ত হয়। এইটুকু মাত্র উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য।

আনন্দবর্দ্ধন ধ্বনিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—একটিকে বলিয়াছেন অবিবক্ষিতবাচ্য, অপরটিকে বলিয়াছেন বিবক্ষিতান্য-পরবাচ্য। অবিবক্ষিতবাচ্য অর্থ এই—যেখানে বাচ্যার্থ একেবারেই উদ্দিষ্ট নহে কিংবা যেখানে বাচ্যার্থ হইতে একেবারে তাহার বিপরীত অর্থের অবগতি হয়। মম্মট এই দুপ্রকার ভেদ লক্ষ্য করিয়া অবিবক্ষিত-বাচ্য-ধ্বনির দুইটি বিভাগ করিয়াছেন। একটিকে বলিয়াছেন অর্থান্তর সংক্রমিত, অপরটিকে বলিয়াছেন অত্যন্ততিরস্কৃত। প্রথমটির উদাহরণ দিতে গিয়া মম্মট বলিয়াছেন—

"ত্বামস্মি বচ্মি বিদুষাং সমবায়োঽত্র তিষ্ঠতি।
আত্মীয়াং মতিমাস্থায় স্থিতিমত্র বিধেহি তৎ॥"

এখানে 'বচ্মি' অর্থ 'বলিতেছি' না, উপদেশ করিতেছি। 'বচ্মি' শব্দের বাচ্যার্থটি একেবারে বদলাইয়া গেল। অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য

উপাদান-লক্ষণাস্থলেই ঘটিতে পারে। উদাহরণে মম্মট বলি-তেছেন—

"উপকৃতং বহু তত্র কিমুচ্যতে, সুজনতা প্রথিতা ভবতা চিরং।
বিদধদীদৃশমেব সদা সখে সুখিতমাসৃস্ব ততঃ শরদাং শতম্।"

কোনও অপকারী ব্যক্তির প্রতি কেহ বলিতেছে যে, আপনি বহু উপকার করিয়াছেন ও বহু সৌজন্য দেখাইয়াছেন—এইরূপ সৌজন্য দেখাইয়া আপনি একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকুন। বক্তার উদ্দেশ্য এই যে আপনি চিরকাল বহু অপকার করিয়াছেন ও বহু অসৌজন্য দেখাইয়াছেন—সম্ভব হইলে আপনার আজই মৃত্যু হউক। এখানে বাচ্যার্থের বিপরীত অর্থ বুঝাইতেছে।

সেইপ্রকার ধ্বনিকেই বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য কহে, যেখানে বাচ্য অর্থটি বাচ্য হইয়াই থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য আর একটি অর্থ ব্যঞ্জিত হয়। ইহাও আবার দুই রকম—লক্ষ্যক্রম ও অলক্ষ্যক্রম। যেখানে বিভিন্নভাবে ব্যঙ্গ্যার্থকে পাওয়া যায়—উভয়ের মধ্যে কালের পৌর্ব্বাপর্য্য লক্ষিত হয় (লক্ষ্যক্রম) এবং যেখানে বাচ্যার্থের সহিত একপ্রকার যুগপৎ ভাবে ব্যঙ্গ্যার্থটি প্রকাশিত হয় (অলক্ষ্যক্রম)। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত ভাবে বলা হইবে।

অনেকে বলেন যে ভক্তি বা লক্ষণা এবং ধ্বনি একই বস্তু এবং এইজন্য স্বতন্ত্র ধ্বনি মানিবার প্রয়োজন নাই। মহিমভট্টও কতকটা এই মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধ্বনিকার এবং আনন্দবর্দ্ধন উভয়েই বলেন যে, যখন বাচ্য ও বাচকের দ্বারা বাচ্য-ব্যতিরিক্ত কোনও অর্থ তাৎপর্য্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং সেই অর্থটিই প্রধান হয় তখন তাহাকেই ধ্বনি বলে। অভিনব বলেন যে শব্দ, অর্থ ব্যাপার, ব্যঞ্জনা ও সমুদয় যেদিক দিয়াই দেখা যাক্ না কেন লক্ষণা ও ধ্বনি সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র। যেখানে ধ্বনি হয় না সেখানেও লক্ষণা দেখা যায় এবং লক্ষণা ব্যতিরেকেও ধ্বনি দেখা যায়। যেখানে লক্ষণার দ্বারা যে প্রয়োজন সূচিত হইতে পারে তাহার কোনও চারুতা নাই, সেখানে তাদৃশ প্রয়োজনকে স্বতন্ত্র হিসাবে স্বীকার করা যায় না। অভিনব বলেন যে কোনও নিগূঢ় তাৎপর্য্য না থাকিলে প্রয়োজনের কোনও চারুতা থাকে না এবং তাহাকে ধ্বনি বলিয়া স্বীকার করা যায় না— "বয়স্তু ক্রমঃ প্রসিদ্ধির্যা প্রয়োজনস্য নিগূঢ়তা"। এইরূপ নিগূঢ় কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও লাক্ষণিক শব্দ প্রয়োগের দ্বারা বক্তব্য অর্থকে প্রকাশ করিবার প্রথা কবিদের মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া তাহারা অনেক সময় কেবলমাত্র ভঙ্গিবৈচিত্র্যের জন্য লাক্ষণিক পদ প্রয়োগ করেন। তাদৃশ প্রয়োজনের কোন সৌষ্ঠব হয় না বলিয়া তাহার ধ্বনিত্ব স্বীকার করা যায় না। আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন—"যত্র হি ব্যঞ্জকত্বকৃতং মহৎ সৌষ্ঠবং নাস্তি তত্রাপি উপচরিতশব্দবৃত্ত্যা প্রসিদ্ধ্যনুরোধপ্রবৃত্তব্যবহারাঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ আনন্দবর্দ্ধন বলিতেছেন—"পরিম্লানং পীনজঘনসঙ্গাদুভয়ত-

স্তনোর্মধ্যস্যান্তঃ পরিমলনমপ্রাপ্য হরিতম্।

ইদং ব্যস্তন্যাসং প্রশিথিলভুজাক্ষেপবলনৈঃ

কৃশাঙ্গ্যাঃ সন্তাপং বদতি বিসিনীপত্রশয়নম্।"

মৃণালপত্রশয়ন ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি কোনও বিরহিণীর বিরহতাপের কথা বলিতেছে (বদতি)। 'বলিতেছে' কথার এখানে লক্ষণা করিতে হইবে প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু বলিতেছে শব্দের দ্বারা 'প্রকাশ করিতেছে' এইরূপ বর্ণনা করাতে বিশেষ কোনও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় নাই।

আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি এই মতের বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিরুদ্ধদলের এই

এই একটি অভিযোগ আছে, যে ধ্বনি হইলেই যদি তাহা কাব্য হয় তবে সেই ধ্বনি চারু হইল কি অচারু হইল এই বিচারের কি উপ-যোগিতা আছে? ধ্বনি ছাড়া চারুতার অন্য কোনও লক্ষণ বা মাপ-কাঠি ধ্বনিবাদীরা দেন নাই। যদি ধ্বনি ছাড়া চারুতার অন্য কোনও মাপকাঠি থাকে এবং চারু না হইলে যদি সে ধ্বনি গ্রাহ্য হয়, তবে তাদৃশ চারুতাকেই কাব্যের প্রাণ বলা উচিত। ধ্বনির উপরে এত জোর দেওয়া অনাবশ্যক। ধ্বনিতা যদি চারুতার প্রযোজক হয় বা Condition হয় তাহা হইলেও চারুতাই প্রধান এবং তাহা ধ্বনি-ব্যতিরিক্ত। এইজন্য তাদৃশ চারুতারই লক্ষণ দেওয়া আবশ্যক, ধ্বনির লক্ষণের দ্বারা তাদৃশ চারুতাকে পাওয়া যায় না। ধ্বনি থাকা না থাকার উপর যদি কাব্যত্ব নির্ভর না করে এবং ধ্বনির চারুতা অচারুতার উপর যদি কাব্য নির্ভর করে তবে ধ্বনির চারুতাই কাব্যের লক্ষণ হওয়া উচিত। অথচ কি হইলে ধ্বনি চারু হয় ধ্বনি-বাদীরা তাহার কোনও লক্ষণ দেন নাই—সেই চারুতা কেবলমাত্র সহৃদয়সংবেদ্য ইহাই তাঁহারা বলিয়াছেন। অতএব সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে তাঁহারা কাব্যের যথার্থ লক্ষণ দিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

ধ্বনিকার বলেন যে, অন্য প্রকারে বলিলে যে চারুতাকে প্রকাশ করা যাইত না, যেরূপ বাক্যে তাদৃশ চারুতা প্রকাশ পায় তাহাকেই ধ্বনিবাক্য বলা যায়।—

> ‘উক্ত্যন্তরেণাশক্যং যৎতচ্চারুত্বং প্রকাশয়ন্।
> শব্দো ব্যঞ্জকতাং বিভ্রদ্‌ধ্বন্যুক্তে বিষয়ী ভবেৎ॥’

ধ্বনিকার আরও বলেন যে রূঢ়ি-লক্ষণাস্থলে কোনও প্রয়োজনই লক্ষিত হয় না; কাজেই সেখানে ত ধ্বনি থাকিতেই পারে না। লবণ শব্দ হইতে লাবণ্য শব্দের প্রয়োগ হয়; এই প্রয়োগ লাক্ষণিক

প্রয়োগ। কিন্তু লবণ শব্দের সহিত সহযোগে লাবণ্য শব্দটি লাক্ষণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া তাহার কোনও বিশেষ চারুতা লক্ষিত হয় না। কাজেই যেখানে যেখানে লক্ষণা হয় সেখানে সেখানেই যে ধ্বনি হয় একথা বলা যায় না। মুখ্য অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য আর একটি অর্থকে প্রকাশ করা শব্দের দ্বিতীয় ব্যাপার, ইহাকেই লক্ষণা বলে। কিন্তু যে প্রয়োজনকে উদ্দেশ্য করিয়া এই গৌণ অর্থ প্রকাশ করা হয় সেই প্রয়োজনকে বুঝানো শব্দের তৃতীয় ব্যাপার। এই তৃতীয় ব্যাপার কখনো দ্বিতীয় ব্যাপারের সহিত এক হইতে পারে না। শব্দ তাহার প্রথম ব্যাপারের দ্বারা বাচ্যার্থকে বুঝায়, তাহার দ্বিতীয় ব্যাপারের দ্বারা গৌণার্থকে বুঝায়, গৌণার্থকে বুঝাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রয়োজনস্বরূপ আর একটি তৃতীয় অর্থকে বুঝায়। যখন এই তৃতীয় অর্থকে বুঝায় তখন শব্দের তদনুরূপ আর একটি তৃতীয় ব্যাপারও মানিতে হয়, এই ব্যাপারই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনন ব্যাপার। গঙ্গাতীরে থাকেন না বলিয়া তিনি গঙ্গায় বাস করেন বলিলে, 'গঙ্গায়' এই শব্দের অর্থে আমরা গঙ্গাতীরই বুঝিয়া থাকি। 'গঙ্গায়' শব্দের অর্থ যে গঙ্গাতীর বুঝায় ইহা একটি লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থ। গঙ্গা শব্দের মুখ্য অর্থ গঙ্গানামে প্রসিদ্ধ নদীস্রোত। এই মুখ্য অর্থটি তাহার অভিধেয় বা বাচ্যার্থ। এই রূপ অর্থকে বুঝাইবার শক্তিকে অভিধাব্যাপার বলা হয়। 'গঙ্গায়' কথাটি যখন বাক্যার্থের অনুপাতে প্রযুক্ত গঙ্গাতীর এই অর্থকে বুঝায়, তখন গঙ্গার তীর এই অর্থটিকে 'গঙ্গায়' এই শব্দের লাক্ষণিক অর্থ বলে। এবং এই অর্থটিকে বুঝাইবার শক্তিকে 'গঙ্গায়' এই শব্দের লক্ষণাশক্তি বা লাক্ষণিক ব্যাপার বলা যায়। কিন্তু গঙ্গাতীরে না বলিয়া 'গঙ্গায়' এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া কেহ যখন গঙ্গাতীরকে

বুঝাইতে চাহে, তখন তাহার মনে কোনও বিশেষ প্রয়োজন বা অভিপ্রায় থাকে বলিয়াই সে তাহা করে। গঙ্গাতীরে বাস করে না বলিয়া গঙ্গায় বাস করে বলিলে গঙ্গার নৈকট্যজনিত সুখ সুবিধার উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে কেহ পায় ইহাই বুঝায়, অতএব গঙ্গাশব্দের দ্বারা তাহার তীরকে বুঝাইবার জন্য সে লক্ষণিক অর্থ আশ্রয় করে। লাক্ষণিকভাবে শব্দটি ব্যবহার করাতেই এই প্রয়োজনটি বুঝা যায়। এই প্রয়োজনটি বুঝাইবার উদ্দেশ্য না থাকিলে বক্তা গঙ্গাতীরে বাস করে এইরূপই প্রয়োগ করিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে গঙ্গা এই শব্দটী কেবলমাত্র তীর বুঝায় না, গঙ্গাগত শৈত্যপাবনত্বাদির অনুভবকেও বুঝায়। অথচ এই অর্থটি লাক্ষণিক অর্থ নহে। তথাপি গঙ্গায় এই শব্দটি যখন ঐ প্রয়োজনকে বুঝায় তখন তাহার তদনুরূপ শক্তি ও ব্যাপারও স্বীকার করিতে হয়। এই ব্যাপারকেই ব্যঞ্জনা ব্যাপার বা ধ্বনন ব্যাপার কহে। লক্ষণা হইতে হইলে মুখ্যার্থ বাধিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ধ্বননব্যাপার মুখ্যার্থবাধের অপেক্ষা রাখে না। বিভাবাদির উপস্থিতির জন্য যখন রসচর্ব্বণা ঘটে তখন মুখ্যার্থ বাধিত হয় না। কেহ কেহ বলেন যে ধূমাদির দ্বারা যেমন অগ্নির স্মরণ হয় তেমন বিভাবাদির প্রতীতির পরেই রত্যাদি চিত্তবৃত্তির প্রতিপত্তি ঘটিয়া থাকে। অতএব রত্যাদি প্রতিপত্তি কোনও শব্দ ব্যাপারের অপেক্ষা রাখে না। ইহার উত্তরে অভিনব বলেন যে, মীমাংসকেরা এই মত পোষণ করিবার সময় মনে রাখেন না যে, অন্য কাহারও চিত্তে রস হইয়াছে ইহা জানার নাম রস প্রতিপত্তি নহে। কাহারও চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধে অনুমান করাকে রসানুভব বলে না। রসাস্বাদ একটি স্বতন্ত্র বস্তু ইহা স্বানুভববেদ্য। রসের অনুভব অর্থ রসাত্মক চিত্তবৃত্তিতে তন্ময় হওয়া। এইজন্য ইহা প্রত্যক্ষ

অনুমান স্মরণ প্রভৃতির দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না। এইজন্য রসানুভব স্থলে 'জ্ঞাপন' বা 'জানা' শব্দ ব্যবহার করা যায় না। It is not an awareness but an emotional enlightenment. সাধারণ কার্য্যকারণের ন্যায় ইহা কোনও কারণসামগ্রী হইতে উৎপন্ন নহে এবং কোনও প্রমাণব্যাপারের দ্বারা ইহা জ্ঞাপিতও হয় না। অথচ ইহাকে অপ্রমাণও বলা যায় না কারণ স্বানুভবের দ্বারাই ইহার সত্তা প্রমাণীকৃত। ললিত পরুষ অনুপ্রাসাদির দ্বারা রস-ব্যঞ্জনার সাহায্য হয়। কিন্তু তাদৃশ অনুপ্রাসাদির লক্ষণার প্রতি কোনও উপযোগিতা নাই। সুবর্ণপুষ্প ইত্যাদি শ্লোকের উদাহরণে দেখা যায় যে অনেক সময় ব্যঙ্গার্থ লক্ষ্যার্থকে অপেক্ষা না করিয়া আপনিই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অতএব লক্ষণাব্যাপার ধ্বনিব্যাপার হইতে একেবারে স্বতন্ত্র।

পূর্ব্বেই ধ্বনির দুইটি ভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি অসংলক্ষ্যক্রম ও সংলক্ষ্যক্রম। রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, রসশান্তি, ভাবশান্তি প্রভৃতি অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গের উদাহরণ। যখন কোনও ব্যভিচারী ভাব উদ্রিক্ত হইয়া বিশেষ কোনও চমৎকারিত্ব প্রকাশ করে, তখন তাহাকে ভাবধ্বনি কহে। এইজন্যই বিতর্কাদি ব্যভিচারী ভাব অনেক সময় প্রধান ভাবে ব্যঞ্জিত হইয়া ভাবধ্বনি এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কোন সময় বা ব্যভিচারী ভাবটি প্রবল না হইয়া বিশেষ চমৎকারিত্ব প্রকাশ করে।

"একস্মিন্ শয়নে বিপক্ষরমণীনামগ্রহে মুগ্ধয়া
সদ্যোমানপরিগ্রহগ্লপিতয়া চাটূনি কুর্ব্বন্নপি।
আবেগাদবধীরিতপ্রিয়তমস্তূষ্ণীং স্থিতস্তৎক্ষণং
মা ভূৎ সুপ্ত ইব ইত্যমন্দবলিতগ্রীবং পুনর্বীক্ষিতঃ॥"

এখানে নায়িকার কোপ হইতে কোপশান্তিটি অধিক সুন্দর হইয়াছে। অনেক সময় বিভিন্ন ব্যভিচারী ভাব একত্রিত হওয়ায় চমৎকারাতিশয্য ঘটিয়া থাকে, তাহাকে ভাবশবলতা বলে। যেমন—

"ক্বাকার্য্যং শশলক্ষণং ক্ব চ কুলং ভূয়োঽপি দৃশ্যেত সা
দোষাণাং প্রশমায় মে শ্রুতমহো কোপেঽপি কান্তং মুখম্।
কিং বক্ষ্যন্ত্যপকল্মষাঃ কৃতধিয়ঃ স্বপ্নেঽপি সা দুর্লভা
চেতঃ স্বাস্থ্যমপেহি ক্ব খলু যুবা ধন্যোঽধরং ধাস্যতি।"

বাচ্যার্থের সঙ্গে সঙ্গে রসভাবাদি প্রধান ভাবে প্রতীত হয়। যেখানে রসাদি প্রধান ভাবে প্রতীত না হইয়া অপ্রধান ভাবে প্রতীত হয়, সেখানে আর তাহাকে ধ্বনি বলা যায় না, তাহা অলঙ্কার স্বরূপ পরিগণিত হয়। অনেক স্থলে কোনও রস অপর রসের কিংবা বাচ্যার্থের অঙ্গ হইয়া প্রকাশ পায়। যেমন মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বে চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ে রণভূমিতে পতিত ভূরিশ্রবার ছিন্ন হস্ত লইয়া তাঁহার বধূর প্রলাপোক্তি—

"অয়ং স রশনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমর্দ্দনঃ।
নাভ্যূরুজঘনস্পর্শী নীবীবিস্রংসনঃ করঃ॥"

এখানে শৃঙ্গার রসটি করুণ রসের অঙ্গ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, এইজন্য এখানে প্রকাশিত শৃঙ্গারকে ধ্বনি বলা যায় না। ইহাকে রসবদ অলঙ্কার বলা হইয়াছে। করুণ রসাবেশে শৃঙ্গার অপুষ্ট হইয়াছে এবং করুণ রসেরই ধ্বনি হইয়াছে। করুণরসাবেশে কবি ভোজরাজকে স্তুতি করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"অত্যুচ্চাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি গিরয়ঃ স্ফারাস্তথাম্ভোধয়ঃ
তানেতানপি বিভ্রতী কিমপি ন ক্লান্তাঽসি তুভ্যং নমঃ।

আশ্চর্য্যেণ মুহুর্মুহুঃ স্তুতিমিতি প্রস্তৌমি যাবদ্ ভুবঃ
তাবদ্ বিভ্রদিমাং স্মৃতস্তব ভুজো বাচস্ততো মুদ্রিতাঃ ॥"

এখানে ভূবিষয়ক রতিভাব রাজবিষয়ক রতিভাবের অঙ্গ হইয়াছে, এজন্য ভূবিষয়ক রতি এখানে ধ্বনি নয়—ইহাকে প্রেয়ঃ অলঙ্কার বলে। আবার কোন রাজাকে স্তুতি করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

"বন্দীকৃত্য নৃপ! দ্বিষাং মৃগদৃশস্তাঃ পশ্যতাং প্রেয়সাং
শ্লিষ্যন্তি প্রণমন্তি হ্লান্তি পরিতশ্চুম্বন্তি তে সৈনিকাঃ।
অস্মাকং সুকৃতৈর্দৃশো র্নিপতিতোহস্যৌচিত্যবারাং নিধে!
বিধ্বস্তা বিপদোহখিলাস্তদিতি তৈঃ প্রত্যর্থিভিঃ স্তূয়সে ॥"

এখানে প্রথমার্দ্ধে পরস্ত্রী বিষয়ক সৈনিকদের রতি হওয়াতে এবং শত্রুগণের রাজবিষয়ক রতি হওয়াতে ভাবাভাস কবির রাজবিষয়ক রতিভাবের অঙ্গ হইয়াছে। এখানে ঊর্জ্জস্বি অলঙ্কার হইয়াছে। আবার কোনও কবি কোনও রাজার স্তুতি করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

'অবিরলকরবালকম্পনৈঃ ভ্রুকুটীতর্জ্জনগর্জ্জনৈর্মুহুঃ
দদৃশে তব বৈরিণাং মদঃ গতঃ ক্বাপি তবেক্ষণেক্ষণাৎ।'

এখানে তাৎপর্য্য এই যে অরিদের মদগর্ব্ব তোমার দর্শন মাত্রেই কোথায় লুপ্ত হইল। এখানে অরিগত মদভাব যে প্রশান্ত হইয়া গিয়াছিল ইহা কবির রাজ বিষয়ক ভাবের অঙ্গ হইল—এখানে ভাবের ভাবপ্রশম অঙ্গ হইয়াছে। ইহাকে সমাহিত অলঙ্কার বলে। যেখানে রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাবপ্রশম প্রভৃতি অঙ্গ হয়, সেখানে রসবৎ, প্রেয়ঃ, ঊর্জ্জস্বি প্রভৃতি অলঙ্কার হয়, কিন্তু সেই অংশে ধ্বনি হয় না। যে অংশে রসভাবাদির উপযুক্ত কবিতায় ধ্বনি হইয়াছে সেই অংশে ইহা ধ্বনি। এই রসবৎ প্রেয়ঃ ঊর্জ্জস্বি প্রভৃতি অলঙ্কার ভামহ হইতে প্রায় সমস্ত আলঙ্কারিকেরা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা রসধ্বনি

প্রভৃতির সহিত পরিচিত ছিলেন না বলিয়া এই সমস্ত অলঙ্কারের যে লক্ষণ দিয়াছেন তাহা এই লক্ষণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রেয়ের উদাহরণ দিতে গিয়া ভামহ বলিয়াছেন—

প্রেয়ো গৃহাগতঃ কৃষ্ণমবাদীৎ বিদুরো যথা—
অদ্য যা মম গোবিন্দ জাতা ত্বয়ি গৃহাগতে।
কালেনৈষা ভবেৎ প্রীতি স্তবৈবাগমনাৎ পুনঃ ॥

বিদুর যে শ্রীকৃষ্ণের আগমনে হৃষ্ট হইয়াছেন, এই হর্ষ প্রকাশই প্রেয়ঃ অলঙ্কার হইয়াছে। শৃঙ্গারাদি আটটি রসের যে কোন রস বাক্যে প্রকাশ পাইলে তাহাকে রসবৎ অলঙ্কার বলা হইয়াছে।

'রসবদ্দর্শিতঃ স্পষ্টঃ শৃঙ্গারাদিরসং যথা।'

ভট্টনায়ক যাহাকে রসের ভোগীকরণ বলিয়াছেন তাহাকেই অভিনব প্রভৃতিরা ধ্বনন বলিয়াছেন। ভোগীকরণব্যাপারশ্চ কাব্যাত্মকরসবিষয়ো ধ্বননাত্মৈব। কিন্তু ভট্টনায়কের ভাবকত্ব সম্বন্ধে অভিনব বলেন যে, কেবল মাত্র কাব্যশব্দ হইতে রসাদির ভাবনা হইতে পারে না; কারণ অর্থ না হইলে রসাদির বোধ হইতে পারে না। কেবলমাত্র অর্থ হইতেও তাহা হয় না। কারণ একই অর্থ কোনও শব্দ বিন্যাসে কাব্য হইয়া দাঁড়ায়, অথচ অন্য শব্দবিন্যাসে কাব্য হয় না। অতএব শব্দ এবং অর্থ যখন গুণ, অলঙ্কার ঔচিত্যাদি যুক্ত হয় তখনই কাব্যরসকে ব্যঞ্জিত করিতে পারে। এইজন্য রসভাবনার প্রতি ব্যঞ্জনা বা ধ্বননই কারণ। ইহা ছাড়া স্বতন্ত্র ভাবকত্ব বলিয়া কোনও ব্যাপার নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই রসাদি যখন গৌণ হয় তখন তাহা ধ্বনিকাব্য না হইয়া অলঙ্কার মাত্র হইয়া থাকে। উপমাদি অলঙ্কার যদিও বাচ্যার্থকে অলঙ্কৃত করে, তথাপি সেই অলঙ্করণ বা শোভাসম্পাদন ব্যাপারের মূল তাৎপর্য্য এই যে, তাহাদের দ্বারা

ব্যঙ্গার্থের অভিব্যঞ্জন করিবার সুবিধা ঘটে। মুখ্য ভাবে বাক্যার্থের শোভা সম্পাদন করিয়া যথার্থভাবে তাহারা ধ্বনিরই শোভা সম্পাদন করে। কেহ কেহ বলেন যে, কোনও অচেতন বস্তুকে চেতনবৎ বর্ণনা করিলে সেখানেও রসবদ্ অলঙ্কার হয়। কিন্তু আনন্দবর্দ্ধন বা অভিনব তাহা স্বীকার করেন না। অভিনব প্রভৃতির মতে রস যেখানে ধ্বনিরূপে প্রকাশ পায় না সেই রসবদ্ অলঙ্কার হয়। অচেতনকে চেতনবদ্ ব্যবহার করিলে সেখানেও রসধ্বনির কোনও বাধা নাই।

'তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণীরসনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।
যথা বিদ্ধং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো
নদীরূপেণেয়ং ধ্রুবমসহমানা পরিণতা॥'

তাৎপর্য্য এই যে নায়কের বিরহে পশ্চাত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সেই তাপোপশান্তির জন্য নায়িকা যেন নদীরূপ ধারণ করিয়াছে। অচেতনকে চেতনবদ্ ব্যবহার করিলে যদি রসবদ্ অলঙ্কার হয় তবে উপমাদির স্থান থাকে না। কারণ উপমামাত্রেই প্রায় অচেতনকে চেতনবদ্ ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত মাধুর্য্যাদি গুণ প্রকাশ পায় তাহাকে গুণ কহে। শৃঙ্গার-রস সমস্ত রস অপেক্ষা মধুর, সেইজন্য শব্দ ও অর্থের মাধুর্য্যগুণ থাকা প্রয়োজন। মাধুর্য্যাদিকে স্বতন্ত্র-রীতিরূপে স্থান দিবার কোনও হেতু নাই। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার এবং করুণরসেও শব্দার্থের মাধুর্য্য হৃদয়কে আকর্ষণ করে। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে বা করুণরসে যেরূপ হৃদয় আর্দ্র হয় সেরূপ আর কিছুতে নহে। তাই ধ্বনিকার বলিয়াছেন—

'শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভাখ্যে করুণে চ প্রকর্ষবৎ।
মাধুর্য্যমাদ্র্ৰ্তাং যাতি যতস্তত্রাধিকং মনঃ ॥'

সেইরূপ রৌদ্রাদিরসে ওজোব্যঞ্জক ও দীর্ঘসমাসাদির প্রয়োগ আবশ্যক। কাব্যের প্রসাদগুণ সকল রসেরই অনুকূল। এই তিনটিকেই স্বতন্ত্র গুণ বলা হইয়াছে। শ্রুতিদুষ্টাদি যে সমস্ত দোষের কথা আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন, তাহা শৃঙ্গারধ্বনিকে দূষিত করে বলিয়াই তাহাকে দোষ বলা হইয়াছে। স্থলবিশেষে এই সমস্ত দোষ দোষ বলিয়া গণিত হয় না। রৌদ্ররসে শ্রুতিদুষ্ট দোষ গুণও হইয়া থাকে, শৃঙ্গারাদি রসে বিভাবানুভাবব্যভিচারিভেদে এবং অলঙ্কারাদি ভেদে অনন্ত ভেদ হইতে পারে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝানো যায় না। যেখানে কবিচিত্ত রসে পূর্ণ হইয়া থাকে সেখানে অলঙ্কারগুলি বিনা যত্নে, বিনা চেষ্টায় যেন আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বাচ্যার্থ-ভূত হইয়াও রসচর্ব্বণার সাহায্য করে। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে চিত্ত যখন রসাপ্লুত হয় তখন শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারগুলি সেই রসস্রোতে আপনিই যেন ভাসিয়া আসে ও সেই রসাস্বাদের অনুকূলতা করে। তাই আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন—নিষ্পত্তৌ আশ্চর্য্যভূতোঽপি যস্য অলঙ্কারস্য রসক্ষিপ্ততয়া এব বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ স অস্মিন্ অলক্ষ্য ক্রমে ব্যঙ্গ্যে ধ্বনৌ অলঙ্কারো মতঃ।" তিনি আরও বলেন যে, যে কবি রসবন্ধকে আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহার হৃদয়ের বাসনাগুলি স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হইয়া রসাস্বাদের অঙ্কুর উৎপন্ন করিতে গিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে রসাস্বাদের অঙ্গরূপে অলঙ্কারাদিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। রসাস্বাদের বা রসোদ্বোধের স্বচ্ছন্দক্রিয়াশক্তি দ্বারা যেখানে অলঙ্কার-গুলি উদ্বুদ্ধ হইয়া না উঠে এবং যেখানে অলঙ্কারগুলিকে ফুটাইবার জন্য স্বতন্ত্র বুদ্ধিচেষ্টার প্রয়োজন হয় সেখানে তাদৃশ অলঙ্কার রসের

অঙ্গভূত হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। সেইজন্য অনেকসময়ে যেখানে প্রচুরভাবে যমক অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটে সেইখানে রস প্রধান না হইয়া যমক অলঙ্কারই প্রধান হইয়া উঠে; কারণ যমক অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে হইলে শব্দ খুঁজিতে হয় এবং কেবলমাত্র স্বচ্ছন্দরসের প্রস্ফুরণে তাহা সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রতিভাশালী কবির চিত্ত রসাপ্লুত হইলে অন্য অলঙ্কারগুলি কবির বুদ্ধিপূর্ব্বক চেষ্টার অপেক্ষা না করিয়াই এমনভাবে আবির্ভূত হয় যে বুদ্ধির দ্বারা চেষ্টা করিলে কবি তাহা কখনও করিতে পারিতেন না। তাই আনন্দবর্দ্ধন বলেন—'অলঙ্কারান্তরাণি হি নিরূপ্যমাণদুর্ঘটনান্যপি রসসমাহিতচেতসা প্রতিভানবতঃ কবেঃ অহংপূর্ব্বিকয়া পরাপতন্তি।' ইহার টীকায় অভিনব বলিয়াছেন—'নিরূপ্যমাণানি সন্তি দুর্ঘটনানি। বুদ্ধিপূর্ব্বং চিকীর্ষিতমপি কর্ত্তুমশক্যানি। তথা নিরূপ্যমাণত্বে দুর্ঘটনানি। কথমেবং রচিতানীত্যেবং বিস্ময়াবহানি।' অর্থাৎ কবির নিজেরই মনে হয় যে কেমন করিয়া তিনি ইহা রচনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাদম্বরী কাব্যে কাদম্বরীদর্শনের বর্ণনা ও সেতুবন্ধকাব্যে মায়ারামাদির মস্তক দেখিয়া সীতাদেবীর শোক বর্ণনা। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, বাচ্যার্থের চারুতার দ্বারাই রস আক্ষিপ্ত হয়, শব্দের দ্বারাই বাচ্যার্থ প্রকাশ হয় এবং এই বাচ্যার্থ-ই রূপকাদি অলঙ্কার। এইজন্য রূপকাদি অলঙ্কারের দ্বারা রস সহজেই আক্ষিপ্ত হয়। রস অঙ্কুরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আপন প্রকাশের জন্য অনুরূপ বাচ্যার্থকে টানিয়া আনে এবং তাহার ফলে রূপকাদি অলঙ্কার ফুটিয়া উঠে। এইজন্য রূপকাদি অলঙ্কার রসাভিব্যক্তির বহিরঙ্গ বস্তু নহে।

যে কবির রসের দিকেই দৃষ্টি তিনি রসের প্রাধান্যবশতঃ কখনও অলঙ্কারকে প্রধান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন না। যেমন—"চলা-

পাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীম্।" ইত্যাদি শ্লোকে ভ্রমর স্বভাবোক্তিরূপ অলঙ্কারে রসের দ্বারা আপ্লুত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আবার অনেকস্থলে রস থাকিলেও তাহা প্রধান না হইয়া অলঙ্কারই প্রধান হইবে। যেমন—

"চক্রাভিঘাতপ্রসভাজ্ঞয়ৈব চকার যো রাহুবধূজনস্য।
আলিঙ্গনোদ্দামবিলাসবন্ধ্যং রতোৎসবং চুম্বনমাত্রশেষম্॥"

এখানে রসাদি তাৎপর্য্য থাকিলেও পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য অলঙ্কার সন্নিবেশের সময় রসানুসরণে ধাবিত হইয়া তাহাকেই অঙ্গী করিয়া যতটুকু অলঙ্কার আসে তাহাতেই কবির সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যত্ন করিয়া অলঙ্কারানুসরণ করিতে গেলে অলঙ্কারই মুখ্য হয় এবং রস গৌণ হয়।

এখানে আর একটি প্রশ্ন এই ওঠে যে শব্দশক্তিমূলক ধ্বনি ও শ্লেষা-লঙ্কারের পার্থক্য কি? শব্দশক্তি দ্বারা যেখানে একটি নূতন অর্থ পাওয়া যায় এবং তাহাকে যদি ধ্বনি বলা যায় তবে শ্লেষ কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে আনন্দবর্দ্ধন বলেন যে, যেখানে শব্দশক্তির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অলঙ্কারটি বাচ্যার্থ বলিয়া প্রতীত হয় সেইখানেই শ্লেষ হয়। কিন্তু যেখানে শব্দশক্তির সামর্থ্যে আক্ষিপ্ত হইয়া বাচ্যকে অতিক্রম করিয়া একটি ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশিত হয় এবং তাহাই কোন অলঙ্কারকে প্রকাশ করে তখন তাহাকেই ধ্বনি বলা যায়। ভট্ট, উদ্ভট প্রভৃতিরা দেখাইয়াছেন যে অন্য অলঙ্কারের ভান হইলেও তাহা শ্লেষ-মূলক হইলে তাহাকে শ্লেষের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেখানে সাক্ষাৎ শব্দশক্তির দ্বারাই অলঙ্কারটির ভান হয় সেখানেই তাহা শ্লেষমূলক যথা— 'তস্যা বিনাপি হারেণ নিসর্গাদেব হারিণৌ
জনয়ামাসতুঃ কস্য বিস্ময়ং ন পয়োধরৌ।'

এখানে শৃঙ্গার-ব্যভিচারী বিস্ময়াখ্যভাব এবং সাক্ষাৎভাবে শ্লেষানুপ্রাণিত হইয়া বিরোধ অলঙ্কার প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে ধ্বনি হয় নাই। শ্লেষের দ্বারায় ধ্বনির উদাহরণস্বরূপ শ্লোকের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

"শ্লাঘ্যাশেষতনুং সুদর্শনকরঃ সর্ব্বাঙ্গলীলাজিত—
ত্রৈলোক্যাং চরণারবিন্দললিতেনাক্রান্তলোকো হরিঃ।
বিভ্রাণাং মুখমিন্দুরূপমখিলং চন্দ্রাত্মচক্ষুর্দধৎ
স্থানে যাং স্বতনোরপশ্যদধিকাং সা রুক্মিণী বোঽবতাৎ॥"

এখানে নারায়ণ রুক্মিণীকে নিজের শরীরের অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছিলেন এই ব্যতিরেক অলঙ্কারটি শ্লেষাশ্রিত হইলেও বাচ্যার্থরূপে প্রতীত হইতেছে এবং হরির রুক্মিণীবিষয়ক রতিকে বাধা দিতেছে না। অভিনব বলেন যে, যেখানে প্রকরণাদি দ্বারা একটি অর্থই বাচ্য বলিয়া প্রতীত হয় এবং দ্বিতীয় অর্থটি বাচ্যার্থ বলিয়া প্রতীত হয় না সেখানেই ধ্বনির বিষয়। সেইজন্যই বলা হইয়াছে যেখানে শব্দশক্তির দ্বারা আর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত হয় কিন্তু অভিহিত হয় না, সেইখানে সেই দ্বিতীয় অর্থটি ধ্বনি বলিয়া গণিত হইতে পারে। আর যেখানে দুইটি অর্থই বাচ্যের মধ্যে পড়ে সেখানে আর তাহাকে ধ্বনি বলা যায় না। যেমন যদি বলা যায়—"অত্রান্তরে কুসুমসময়যুগমুপসংহরন্নজ়ৃম্ভতগ্রীষ্মাভিধান-ফুল্লমল্লিকাধবলাট্টহাসো মহাকালঃ" এখানে বাচ্যার্থটি ঋতুবর্ণনাতেই প্রযুক্ত অতএব অন্য একটি যে অর্থ প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে শব্দার্থমূলক ধ্বনি বলা হয়।

যেখানে শব্দব্যাপারকে অপেক্ষা না করিয়া একটি অর্থের দ্বারা আর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত হইয়া আসে তাহাকে অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি বলে। যেমন—

"এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী।"

এইখানে লীলাপত্র গণনারূপ অর্থটি স্বয়ং গৌণ হইয়া পার্ব্বতীগত লজ্জাভাবকে প্রকাশিত করিতেছে। এই ব্যঞ্জনাটি লক্ষ্য-ক্রমব্যঞ্জনারই উদাহরণ। কারণ এখানে লীলাকমল পত্রের গণনার কি তাৎপর্য্য হইতে পারে ইহার অনুসন্ধানযুক্তই লজ্জার ভাবটি ধ্বনি হয়। যেখানে বিভাবানুভাবের দ্বারা সাক্ষাৎ রস ভাবাদির প্রতীতি ঘটে সেইখানেই তাহা অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গের উদাহরণ। যেমন—

"হরস্ত কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥"

এইখানে উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই ঔৎসুক্য, আবেগ, হর্ষ প্রভৃতি ভাব ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু লীলাকমলপত্র গণনার সময় ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, কেন পার্ব্বতী অধোমুখী হইয়া পত্র গণনা করিয়াছিলেন; লজ্জা ছাড়া অন্য কারণও হইতে পারে, এইজন্য নানামুখে চিন্তার পর লজ্জায় আসিয়া পৌছান যায়,—সেজন্য ইহাকে লক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ বলে। রস ছাড়া অন্য বস্তুও শব্দশক্তির দ্বারা বা অর্থশক্তির দ্বারা ধ্বনিত হইতে পারে। অর্থশক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ আনন্দবর্দ্ধন বলিতেছেন—

"অম্বা শেতেঽত্র বৃদ্ধা পরিণতবয়সামগ্রণীরত্র তাতো
নিঃশেষাগারকর্ম্মশ্রমশিথিলতনুঃ কুম্ভদাসী তথাঽত্র।
অস্মিন্ পাপাহমেকা কতিপয়দিবসপ্রোষিতপ্রাণনাথা
পান্থায়েত্থং তরুণ্যা কথিতমবসরব্যাহৃতিব্যাজপূর্ব্বম্।"

অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি দুই প্রকার। কবি প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ কিংবা কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ, অর্থাৎ যেখানে কবির কল্পনা

চমৎকারিত্বের দ্বারা ধ্বনিটি সূচিত হয় কিংবা যেখানে কবিবর্ণিত কোনও নায়কাদির দ্বারা ধ্বনিটি সিদ্ধ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। বাচ্য অলঙ্কার ভিন্ন যেখানে ধ্বনির দ্বারা উপমাদি প্রকাশিত হয়, তাহাকে অলঙ্কারধ্বনি বলা যায়। উদ্ভট প্রভৃতিরা এইরূপে বহু প্রতীয়মান অলঙ্কারাদির উদাহরণ দিয়াছেন। কিন্তু কোনও অলঙ্কার এইভাবে প্রতীতিগম্য হইলেও যদি তাহা বাচ্যার্থ অপেক্ষা চারুতর না হয় তবে তাহাকে ধ্বনি বলা যায় না। এইজন্য দীপক প্রভৃতি অলঙ্কারে উপমার প্রতীতি থাকিলেও তাহাকে ধ্বনি বলা যায় না। উপমার ধ্বনির উদাহরণ দিতে গিয়া আনন্দবর্দ্ধন বলিতেছেন—

'বীরাণাং রমতে কুঙ্কুমারুণে ন তথা প্রিয়াস্তনোৎসঙ্গে
দৃষ্টী রিপুগজকুম্ভস্থলে যথা বহলসিন্দূরে।'

অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে করিকুম্ভের প্রতি বীরদের যেরূপ আকর্ষণ প্রিয়ার স্তনের উপর তাদৃশ নহে—এখানে বীরত্বটাই প্রকাশ করিতে গিয়া গজকুম্ভের সহিত প্রিয়াস্তনের উপমা ধ্বনিত হইয়াছে। প্রিয়া অপেক্ষা যুদ্ধের দিকেই যে বীরের আকর্ষণ বেশী এই ব্যতিরেক অলঙ্কারটিই এখানে বাচ্য।

অর্থ ব্যঙ্গ্য কিন্তু শব্দ ব্যঞ্জক। অভিনব বলেন যে পদ, বাক্য, বর্ণ, পদভাগ, পদসংঘটনা, মহাবাক্য প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ ধ্বনির ব্যঞ্জক হইতে পারে। পদ, পদাংশ প্রভৃতি দ্বারা যে অবিবক্ষিত বাচ্য ও অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য এই দুই প্রকার ধ্বনি দ্যোতিত হইতে পারে মম্মট প্রভৃতি আলঙ্কারিকেরা তাহার অনেক উদাহণ দিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধনও তাহার যথেষ্ট উদাহরণ দিয়াছেন। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে তাহার আলোচনা সম্ভব হইল না। প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, ধ্বনি যদি কাব্য হয় তবে তাহা কেমন করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে।

শব্দ সঞ্চয়ন শব্দ সন্নিবেশ কোন বিশিষ্ট জাতীয় অর্থকে বুঝাইলে তাহাকে কাব্য কহে। পদের দ্বারা তাদৃশ কাব্যার্থ প্রকাশিত হয়; কিন্তু পদের দ্বারা ধ্বনি কি করিয়া হইতে পারে তাহার উত্তরে আনন্দবর্দ্ধন বলেন যে, এই ধ্বনি পদের বাচকতাকে অবলম্বন না করিয়া হইতে পারে না। পদসমষ্টির দ্বারা কাব্যের শরীর গঠিত হয়। যখন দেখা যায় যে ধ্বনিত অর্থের চারুতা কোন পদবিশেষের প্রয়োগের উপর নির্ভর করে, তখন সেই পদই সেই ধ্বনির ব্যঞ্জক ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গস্থলে অর্থেরই ব্যঞ্জকতা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সেসব স্থলেও বর্ণের রসানুকূল দ্যোতকতা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। শ, ষ, রেফ সংযুক্ত বর্ণ ও চকারাদি বর্ণ শৃঙ্গার রসের প্রতিকূল অথচ রৌদ্র ও বীভৎস রসে তাহারা ঐ দুই রসকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। আবার পদ সঙ্ঘটনা বা পদবিন্যাস পদ্ধতিও কোন সময় রসের অনুকূল বা প্রতিকূল হইয়া থাকে। পদ-বিন্যাস বলিতে সমাসহীনতা কিংবা দীর্ঘ সমাস কিংবা মধ্যম জাতীয় সমাস এই তিন রকম বিন্যাসপদ্ধতি বোঝা যায়। শব্দসঙ্ঘটনা এবং গুণ সম্বন্ধে আলঙ্কারিকদের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন এই আছে যে, শব্দ সঙ্ঘটনা এবং গুণ যদি পৃথক হয় তবে কে কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। গুণকে আশ্রয় করিয়া শব্দসঙ্ঘটনা থাকে, কি শব্দসঙ্ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণ থাকে? যদি শব্দসঙ্ঘটনা এবং গুণ এক হয়, কিংবা শব্দসঙ্ঘটনাকে আশ্রয় করিয়াই গুণ থাকে, এই পক্ষ অবলম্বন করা যায় তবে বলিতে হয় যে গুণ তাঁহার স্বস্বভাবকে আশ্রয় করিয়াই থাকে কিংবা তাহার আধেয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু আপনাকে আপনি আশ্রয় করিয়া থাকা যেমনি অসম্ভব তেমনি আধেয়কে আশ্রয় করিয়া আধারে

থাকাও সুকঠিন। বৃক্ষত্বকে আশ্রয় করিয়া শিংশপাত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু শিংসপাত্বকে আশ্রয় করিয়া বৃক্ষত্ব থাকিতে পারে না, কারণ বৃক্ষত্ব ব্যাপক এব শিংশপাত্ব ব্যাপ্য। গুণ যদি কোনও শব্দসজ্ঘটনার ব্যাপার হয় তবে তাহা অন্য শব্দসজ্ঘটনার ধর্ম্ম হইতে পারে না। এইজন্য গুণ এবং শব্দসজ্ঘটনা এক হইতে পারে না এবং শব্দসজ্ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণ থাকে তাহাও হইতে পারে না। অথচ উদ্ভট প্রভৃতিরা এই মতের পোষণ করিয়াছেন। যদি বলা যায় গুণ এবং শব্দসজ্ঘটনা পৃথক্ তবে বলিতে হয় যে গুণকে আশ্রয় করিয়া শব্দসজ্ঘটনা থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এরূপ বিচারের কাব্যে কি উপযোগিতা আছে। ইহার উত্তরে আনন্দবর্দ্ধন বলেন যে, গুণ এবং শব্দসজ্ঘটন যদি একই বস্তু হয় তবে একই রসে যখন বিভিন্ন প্রকার শব্দসঙ্ঘটনা চলে তখন একই রস দ্যোতিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার গুণও চলিতে পারে। অর্থাৎ একই শৃঙ্গার রসে দীর্ঘ সমাস, মধ্য সমাস বা অসমস্ত বাক্য এই তিনরূপ শব্দ সজ্ঘটনাই চলিতে পারে। গুণ যদি শব্দসজ্ঘটনার ধর্ম্ম হয় তবে মাধুর্য্য, প্রসাদ ও ওজঃ এই তিন প্রকার গুণই শৃঙ্গার রসে চলিতে পারে, এইকথা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আমরা জানি যে মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণ কেবলমাত্র করুণ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারেই চলে, রৌদ্র ও ওজোগুণ অদ্ভুতরসে চলে। তাহা ছাড়া আমরা ইহাও জানি যে মাধুর্য্য ও প্রসাদ গুণ, রস ও ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস প্রভৃতি স্থলে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু শব্দ সজ্ঘটনা সম্বন্ধে সেরূপ কোনও নিয়ম করা চলে না। শৃঙ্গার রসে যে দীর্ঘ সমাস চলে তাহার উদাহরণ দিতে গিয়া আনন্দবর্দ্ধন বলিতেছেন—

অনবরতনয়নজললবনিপতনপরিমুষিতপত্রলেখান্তম্।
করতলনিষন্নমবলে বদনমিদং কং ন তাপয়তি॥

আবার রৌদ্ররসে অসমস্ত পদ চলিতে পারে ; যেমন—

'যো যঃ শস্ত্রং বিভর্ত্তি স্বভুজগুরুমদাৎ পাণ্ডবীনাং চমূনাম্' ইত্যাদি। অতএব পদসঙ্ঘটনাকে গুণ বলা যায় না এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াই যে গুণ আছে তাহাও বলা যায় না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, যদি পদসঙ্ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণ না থাকে তবে তাহা কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইহার উত্তরে আনন্দবর্দ্ধন বলেন যে কাব্যের মধ্যে যে অঙ্গী রস বা ধ্বনি আছে, গুণ তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সৌন্দর্য্যাদি গুণ যেমন দেহের ধর্ম্ম নহে অথচ তাহা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়াই দেহের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়, গুণও তেমনি অঙ্গী রসকে আশ্রয় করিয়া শব্দসঙ্ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। মৃতশরীরে যেমন অলঙ্কারাদির অলঙ্কারিত্ব নাই, শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও তাহা যেমন পরম্পরাক্রমে যথার্থভাবে আত্মারই শোভাতিশয় প্রকাশ করে, সেইরূপ কাব্যেও অলঙ্কার বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়া থাকিলেও রসেরই শোভাবর্দ্ধন করে। যেখানে রস না থাকে সেখানে উপমাদি অলঙ্কারের অলঙ্কারিত্ব নাই। তাই আনন্দবর্দ্ধন লিখিয়াছেন—

'তমর্থমবলম্বন্তে যেঽঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলঙ্কারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ॥'

রসনিষ্পত্তি কোন বিশেষ পদসঙ্ঘটনার উপর নির্ভর করে না। রৌদ্ররস প্রকাশ করিতে গিয়া কেহ যদি দীর্ঘ সমাস ব্যবহার না করিয়াও তাহা উদ্ভাসিত করিতে পারেন, তবে তাহাতে কোনও দোষ হয় না। এইজন্যই গুণ ও শব্দসঙ্ঘটনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। যদি গুণ শব্দসঙ্ঘটনাত্মক না হয় এবং তদাশ্রিত না হয়, তবে তাহার কি স্বরূপ? ইহার উত্তরে আনন্দবর্দ্ধন বলেন যে,

যাদৃশ বক্তার পক্ষে যাদৃশ বক্তব্য বিষয় তাহার অনুরূপ বা তাহার অবস্থার অনুরূপ তাহাই গুণদ্যোতক। 'তস্মাদ্ গুণব্যতিরিক্তত্বে গুণরূপত্বে চ সঙ্ঘটনায়া অন্যঃ কশ্চিৎ নিয়মহেতুর্বক্তব্য ইত্যুচ্যতে। তন্নিয়মে হেতু রৌচিত্যং বক্তৃবাচ্যয়োঃ'। বক্তার বক্তব্য বিষয়টি রসাদির বা তদাভাসাদির অঙ্গ হইলেই তাহা কাব্য হয়। কবি বা কবিনিবদ্ধ বক্তা যখন রসভাব-সমন্বিত হন, তখন তাহার সেই রসানুপ্রাণনাই কাব্যরচনার মধ্যে রসানুকূল শব্দঘটনা সম্পন্ন করিয়া থাকে। রস যখন প্রধান হইয়া ওঠে, তখন তাহার অনুপ্রাণনার বলেই তদ্বিরোধী শব্দসঙ্ঘটনা পরিত্যক্ত হয়। এইজন্যই করুণ রসে ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে দীর্ঘসমাসের সঙ্ঘটনা দেখা যায় না। কোন সময়ে বা দীর্ঘসমাস প্রয়োগেও শৃঙ্গার-রসাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। কবির অন্তর্গত রসবোধ সেই রসপ্রকাশের অনুকূলভাবে শব্দের সঙ্ঘটন ও বিন্যাস করিয়া থাকে। এইজন্য কোনও বহিরঙ্গ লক্ষণ দিয়া রসপ্রকাশের নিয়ম করা যায় না। যাহা দ্বারা রসপ্রতীতির বিলম্ব হইবে বা রসপ্রতীতি ব্যাহত হইবে, কবির রসানুপ্রেরণাই সেইরূপ শব্দ বিন্যাস বা শব্দসঙ্ঘটনাকে পরিত্যাগ করিবে। সাধারণতঃ প্রসাদ গুণকে অবলম্বন করিয়া সকল রসই প্রকাশ পাইতে পারে, এইজন্য প্রসাদগুণকে অবলম্বন করিয়া নানা রসের কাব্য ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। এই জন্য শব্দসঙ্ঘটনা এবং গুণ এক হউক বা না হউক, সকল সময়ই পদসঙ্ঘটনার রসাভিব্যঞ্জকত্ব আছে। শব্দসঙ্ঘটনার যে গুণের দ্বারা তাহা রসাভিব্যঞ্জক হইয়া থাকে, তাহাই গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু শব্দসঙ্ঘটনা যে কেবল রসাভিব্যঞ্জকতার উপর নির্ভর করে তাহা নহে, বর্ণনীয় বিষয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়াই কাব্যের নানাপ্রকার বিভাগ করা হয়। কোন সময় একটি শ্লোকেই একটি ভাব প্রকাশ করা হয়। কোন সময় দুইটি শ্লোকেই একটি ভাব প্রকাশ করা হয়

(সন্দানিতক), কোন সময় তিনটি শ্লোকে (বিশেষক) বা চারিটি শ্লোকে (কলাপক) বা পাঁচটি শ্লোকে (কুলক) প্রকাশ করা হয়। কোন সময়ে বা একটি ভাবের প্রকাশ হইলেও ভাবান্তরের দ্বারা তাহার পুষ্টি সাধন করা হয়—ইহাকে পর্য্যায়বন্ধ বলে। এইরূপ পরিকথা, খণ্ডকথা, সকলকথা প্রভৃতি বহুপ্রকার কাব্যপ্রয়োগের বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈচিত্র্য অনুসারে শব্দসঙ্ঘটনারও বৈচিত্র্য দেখা যায়। এইরূপ গদ্য স্থলে বা পদ্যাদি ছন্দঃ স্থলে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ কবিগত রসানুপ্রেরণা। সর্ব্বপ্রকার বাক্যরচনার মধ্যে যাহা কিছু যে ভাবে অনুচিত বা অননুরূপ বা অসমঞ্জস তাহাই রসভঙ্গের কারণ হয়। এই জন্যই ঔচিত্যরক্ষাকেই রসাভিব্যক্তির পরম রহস্য বা পরম গুহ্যতত্ত্ব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এইজন্যই বোধ হয় ক্ষেমেন্দ্র বলিয়াছিলেন যে ঔচিত্যই রসের প্রাণ। সে জন্য আনন্দবর্দ্ধন বলেন—

"অনৌচিত্যাদৃতে নান্যৎ রসভঙ্গস্য কারণম্।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পুরা॥"

চরিত্র-সঙ্ঘটন বিষয়েও উচিত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইলে সেখানে রসপ্রতীতি ব্যাহত হয়। যে জাতীয় চরিত্র কবি অঙ্কন করিতে চান সমগ্র ব্যবহারের মধ্য দিয়া সুসমঞ্জসভাবে তাহাই তাঁহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কোনও উত্তম চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া তাহাতে নীচজনোচিত ব্যবহার আরোপ করিলে, সমস্ত রসমাধুর্য্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ঔচিত্য-বিরোধী দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া ধ্বনিকার বলিয়াছেন—কোন রসবর্ণনা করিতে করিতে তাহার বিরোধী রসের বর্ণনা করা, বিস্তৃতভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা করিয়া পুনরায় তাহার আলোচনা করা, যেখানে অবসর নহে এমন সময় হঠাৎ কোনও রসবর্ণনা করা, যেখানে বর্ণনা করা উচিত সেখানে হঠাৎ বন্ধ করা, পুষ্ট রসকে পুনরায়

পোষণ করিবার চেষ্টা করা কিংবা অনুচিত ব্যবহার বর্ণনা করা—এই-গুলি সমস্তই রসের পরিপন্থী এবং সেইজন্য অনুচিত।

কোন নাটকে বা কাব্যে যদিও নানা রসের সমাবেশ থাকে, তথাপি বিচক্ষণ কবিরা সর্ব্বদাই তাহার মধ্যে একটি রসকে প্রধান করিয়া তোলেন। বিভিন্ন বিরুদ্ধ রসের সমাবেশ করিলে যদি তাহার প্রত্যেকটিকে পূর্ণভাবে পুষ্ট করিয়া না তোলা হয় এবং তাহাদের মধ্যে একটি রসকে সমগ্র কাব্যের মধ্যে প্রধান করা হয়, তাহা হইলে বিরোধি-রস-সমাবেশ সত্ত্বেও ঐ সমস্ত বিভিন্ন রসের সহিত মূল রসের কখনও বিরোধ ঘটে না। কোন্ রসের সহিত কোন্ রসের বিরোধ হয়, তাহা কবি সহজেই প্রতিভাবলে বুঝিতে পারেন। অনেক সময় বিভিন্ন আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া, অনেক সময় বা একটি আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া অনুগত অবিরোধী রসের মধ্য দিয়া বিরোধী রসের সমাবেশ করিয়া কবি রস-বিরোধ পরিহার করিয়া থাকেন। সকল রসের মধ্যে শৃঙ্গার রসই সর্ব্বাপেক্ষা সুকুমার। যদিও রসবিরোধ সর্ব্বত্রই পরিহার্য্য, তথাপি শৃঙ্গার রসে ইহার উগ্রতা সর্ব্বাপেক্ষা স্ফুট হয় বলিয়া শৃঙ্গার-রস প্রতি-পাদন করিবার সময় কবিকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হয়। শৃঙ্গার-রস অত্যন্ত কোমল বলিয়া ইহা অনেক সময় ইহার বিরোধী রসের অঙ্গভূত হইয়া থাকিতে পারে। শৃঙ্গার কি ভাবে শান্তরসের অঙ্গ হইতে পারে, তাহার উদাহরণ আনন্দবর্দ্ধন দিয়াছেন—

'সত্যং মনোরমা রামাঃ সত্যং রম্যা বিভূতয়ঃ।
কিন্তু মত্তাঙ্গনাপাঙ্গ-ভঙ্গলোলং হি জীবিতম্॥'

এখানে শান্তরসের বিরোধী শৃঙ্গার রস তাহার অঙ্গ হইলেও বিরোধী হয় নাই।

বৃত্তি বা রীতির কথা বলিতে গিয়া আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন যে

রসের অনুকূল ঔচিত্যযুক্ত শব্দ ও অর্থের ব্যবহারকে বৃত্তি কহে। কাব্য ও নাটকে রসাদি তাৎপর্য্যের অনুকূল ভাবে শব্দার্থের ব্যবহার হইলে তাহা অত্যন্ত কমনীয় হয়। রসভাবাদি কাব্য নাটকের প্রাণভূত, তাহার আখ্যান-ভাগ তাহার শরীরভূত। কেহ কেহ বলেন যে কাব্য নাটকীয় ঘটনা ধর্ম্মী, রসাদি তাহার ধর্ম্ম। রসাদির সহিত কাব্যনাটকীয় ঘটনার গুণগুণি-সম্বন্ধ কিন্তু প্রাণ ও শরীরের সম্বন্ধ নহে। তাঁহারা আরও বলেন যে আত্মা বা প্রাণ যেরূপ শরীর হইতে ভিন্ন, রস সেইরূপ বাচ্যার্থ হইতে ভিন্ন নহে। রসাদি গুণের সহিতই বাচ্যার্থ বা কাব্যনাটকীয় ঘটনাদি প্রকাশ পায়। এইজন্য রসকে কাব্যনাটকীয় ঘটনার গুণ বলা যাইতে পারে। গুণগুণীর যেমন অভেদে প্রতিপত্তি ঘটে—রসাদি এবং কাব্যনাটকাদিরও তাহাই ঘটে। রসাদি কাব্যনাটকীয় ঘটনা হইতে একেবারে পৃথক্ নহে। ইহার উত্তরে আনন্দবর্দ্ধন বলেন যে রসাদি যদি কাব্যনাটকীয় ঘটনার গুণ হইত, তাহা হইলে বাচ্যার্থের সঙ্গে সঙ্গেই রসাদির প্রতীতি হইত। দেহের ধর্ম্ম এইজন্য যখনই আমরা দেখিয়া থাকি, তাহার বর্ণও তখনই দেখিয়া থাকি। অভিনবগুপ্ত এখানে বলেনযে, রসাদি দুই প্রকারে বাচ্যের ধর্ম্ম হইতে পারে, এক রূপাদি গুণের ন্যায়, অপর মণিরত্নাদির বিভিন্ন জাতির ন্যায়, যেমন কোনও রত্ন দেখিয়া জহুরী তাহাকে নীলা বলিয়া, প্রবাল বলিয়া চিনিয়া থাকে। এই উভয়ের পার্থক্য এই যে একটিতে ধর্ম্মধর্ম্মি-সম্বন্ধ ও আর একটিতে তাদাত্ম্য (identity)। রসের সহিত বাচ্যার্থের যদি ধর্ম্মধর্ম্মি-সম্বন্ধ থাকিত তবে বাচ্যার্থ বুঝিলেই সকল লোকের রসবোধ হইত। কিন্তু সকল লোকের রসবোধ হয় না, বিশেষ সহৃদয় ব্যক্তিরই রসবোধ হইয়া থাকে। যদি উভয়ের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ থাকিত তাহা হইলে বাচ্যার্থই রস বলিয়া গণ্য হইত। বিভাবাদিকেই কেহ

রস বলিয়া মনে করেন। বিভাবাদির সহিত রসের অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে বা কারণ-কার্য্য-সম্বন্ধ আছে, কিন্তু ঐক্য নাই। বিভাবাদি প্রকাশ পাওয়ার পর রসের প্রকাশ ঘটে—এই ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্য ধরা কঠিন। সেইজন্য রসাদির প্রকাশকে অসংলক্ষ্য ক্রম বলা হয়।

কেহ কেহ বলেন যে শব্দই প্রকরণাদি বশতঃ একই সময়ে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি উৎপাদন করে। বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে যে কোনও ক্রম আছে, তাহা মানিবার আবশ্যক করে না। তাঁহারা বলেন যে শব্দ যে বাচ্যার্থকে বুঝায় বলিয়াই ব্যঙ্গ্যার্থকে বুঝায়—একথা মানিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। কারণ গীতাদি শব্দের শ্রবণমাত্রই রসাদির অভিব্যক্তি হয় এবং তাহা গীত শব্দার্থের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। ইহার উত্তরে আনন্দবর্দ্ধন বলেন যে, প্রকরণ বশতঃ শব্দ যে বিশিষ্ট অর্থকে ব্যঞ্জনা করে—এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। কিন্তু এই ব্যঞ্জকতা শব্দের স্বরূপ হইতেই হয়, কোন সময় বা বাচক-শক্তি-নিবন্ধন হইয়া থাকে। গীতাদি হইতে অর্থবোধ ছাড়া যে রসপ্রতীতি হয়, তাহা স্বরূপতঃ শব্দ ও স্বরাদি জন্য। কিন্তু যেখানে বাচ্যার্থ বোধের পর রসপ্রতীতি হয়, সেখানে বাচ্যার্থপ্রতীতি ও রসপ্রতীতির মধ্যে বাচ্যার্থ মানিতে হয়। যদি বাচ্যার্থপ্রতীতি ছাড়া রসপ্রতীতি সম্ভব হইত, তাহা হইলে কাব্য শুনিবামাত্র সকলেরই রসবোধ হইতে পারিত। যদি বাচ্যার্থের সঙ্গে সঙ্গেই রসপ্রতীতি হইত, তবে বাচ্যার্থ যে রসপ্রতীতির প্রতি কোনও আনুকূল্য করে, ইহা বলা যাইত না। যাঁহারা বলেন যে গীত-শব্দাদি স্বরাদি সহকৃত ভাবে শ্রুত হইলেই রসবোধ হয়, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হয় যে আগে গীত শব্দাদি শ্রুত হয় ও পরে রসবোধ হয়। কাজেই সেখানে শব্দ ও রসের পৌর্ব্বাপর্য্য বিভাগ মানিতে হয়। ইহা সত্ত্বেও সাধারণতঃ শব্দসঙ্ঘটনের

সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্যার্থের অবিরোধী ভাবে রসাদির প্রতীতি হয়। তথাপি ইহাদের প্রতীতি সমকালীন এ কথা বলা যায় না। শব্দ-সঙ্ঘটনাদি ও বাচ্যার্থের বোধের পর এত দ্রুতগতিতে রসবোধ হয় যে মনে হয় যে তাহাদের মধ্যে কোনও পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। অনেক সময় অভ্যাস বশতঃ ধূমদর্শনমাত্রেই বহ্নির জ্ঞান হয় অথচ ব্যাপ্তিস্মৃতি সম্বন্ধে আমরা সজাগ হই না। কোনও কোনও স্থলে বা এই ক্রম স্পষ্টই প্রতীত হয়। ইহার উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

এইখানে আর একটি প্রশ্ন এই উঠিতে পারে যে বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়া আর একটি অর্থ ধ্বনি-কাব্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহা হইলে এই দ্বিতীয় অর্থটিকেও ত বাচ্যার্থ বলা চলিতে পারে। ইহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ কেন বলা হয়? ইহার উত্তরে আনন্দবর্দ্ধন বলেন যে শব্দ যে ব্যাপারের দ্বারা বাচ্যার্থকে বুঝায় সেই ব্যাপারের দ্বারাই ব্যঙ্গ্যার্থকে বুঝাইতে পারে না। বাচ্যার্থটি সাক্ষাৎ শব্দের সহিত সম্বদ্ধ। কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থটি বাচ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাচ্যার্থ যে ব্যাপারের দ্বারা বুঝা যায় ব্যঙ্গ্যার্থ সে ব্যাপারের দ্বারা বুঝা যায় না। ব্যঙ্গ্যার্থের স্বরূপ বাচ্যার্থ হইতে বিভিন্ন, বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের বিষয়ও ভিন্ন। কাজেই ব্যঙ্গ্যার্থও বাচ্যার্থ এক—ইহা কিছুতেই বলা চলে না। পদার্থ ও বাক্যার্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে সেরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। বাক্যার্থের বোধের সঙ্গে পদার্থের বিভক্ত স্বভাব দূরীভূত হয় এবং পদার্থ একটি অখণ্ড বাক্যার্থের মধ্যে অবিভক্তরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। পদার্থের বিভক্ততাবোধ থাকিলে অখণ্ড বাক্যার্থের প্রতীতি হইতে পারে না। কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীতির সময় বাচ্যার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রদীপের দ্বারা ঘট প্রকাশিত হইলে, প্রদীপের আলোকরূপ অবিকৃত

থাকে। বাচ্যার্থের দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশিত হইলেও বাঙ্গ্যার্থ সেইরূপ অবিকৃত থাকে। এবং কোনো সময় বাচ্যার্থটি প্রধান হয় এবং কোনো সময় ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান হয়। ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান হইলে তাহাকে ধ্বনি বলে। অতএব বাচকত্ব ও ব্যঞ্জকত্ব দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। লক্ষণাস্থলে লক্ষিত গৌণ অর্থটি বাচ্যার্থের স্থান অধিকার করে। বাচ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থ উভয়ে এক সময়ে উপস্থিত থাকে না। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলিলে গঙ্গাশব্দ যখন গঙ্গাতটকে বোঝায় তখন আর তাহা গঙ্গাস্রোতকে বুঝায় না; কিন্তু 'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী' ইত্যাদি ব্যঙ্গ্যস্থলে লীলা-কমলপত্রাদি গণনার সঙ্গে সঙ্গেই পার্ব্বতীগত লজ্জাদির প্রতীতি হয়। বাচ্যার্থকে গৌণ করিয়া ব্যঙ্গ্যার্থ আত্মপ্রকাশ করে না।

যেখানে কোনও বাচ্যার্থ স্বয়ং তিরস্কৃত বা বাধিত হইয়া অন্য অর্থকে লক্ষিত করে তাহাকে লক্ষণা কহে। এরূপ হইলে লক্ষণার দ্বারা প্রকাশিত অর্থটি শব্দেরই ব্যাপার। ব্যঞ্জনা স্থলে প্রকরণাদি বশতঃ শব্দই বাচ্যার্থকে বাধিত না করিয়া বস্তু, অলঙ্কার বা রসকে ধ্বনিত করে। লক্ষণাস্থলে যেমন মুখ্য অর্থটি বাধিত হইয়া একটি গৌণ অর্থ প্রকাশ হয়, ধ্বনিস্থলে রসাদির প্রতীতি সেরূপ কোনও গৌণ প্রতীতি নহে। এই জন্যই লক্ষণা হইতে ধ্বনি একান্ত ভিন্ন। ধ্বনিত অর্থটি বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ উভয়কেই অবলম্বন করিয়া হইতে পারে। গীত ধ্বনি প্রভৃতি স্থলে স্বরাদি প্রযুক্ত লক্ষ্যার্থ বা বাচ্যার্থ কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া রসাদির ব্যঞ্জনা হইতে পারে। এজন্য কেহ কেহ বলেন যে ব্যঙ্গ্যার্থটি মুখ্যতঃ শব্দব্যাপারের দ্বারাই হইয়া থাকিতে পারে। যেখানে সম্ভব হয় সেখানে বাচ্যার্থটি তাহার সহকারী হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে একথা সত্য যে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনিতে শব্দের লাক্ষণিকত্ব বা গৌণত্ব নাই। কারণ সেখানে বাচ্যার্থ-প্রতীতিকে

অবলম্বন করিয়াই ধ্বনিটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনিতে ধ্বনি ও লক্ষণার কোনও প্রভেদ নাই। কারণ অবিবক্ষিত বাচ্যস্থলে বাচ্যার্থের প্রতীতি হয় না বা বাচ্যার্থ অপ্রধান থাকে, যেমন 'অগ্নির্মানবকঃ' বা 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'। ইহার উত্তরে আনন্দবর্দ্ধন বলেন যে অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি যদিও লক্ষণার ন্যায় প্রতীত হয়, তথাপি ইহা লক্ষণা হইতে ভিন্ন। কারণ লক্ষণাস্থলে সর্ব্বত্র ব্যঞ্জনা হয় না কারণ অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির সহিত চারুতাপ্রযোজক ব্যঞ্জনা সর্ব্বদাই থাকে। অবিবক্ষিতবাচ্যস্থলে যে লাক্ষণিকত্ব দেখা যায়, তাহাতে বাচ্য ধর্ম্মের সহিত ব্যঙ্গ্য ধর্ম্মকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়। 'অগ্নির্মানবকঃ' এস্থলে অগ্নির তৈক্ষ্ণ্য ধর্ম্মরূপ বাচ্যার্থের সহিত বালকের তীক্ষ্ণধীত্বরূপ ব্যঙ্গ্যার্থকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু লক্ষণাস্থলে সর্ব্বত্র এরূপ হয় না। যখন বলা হয় 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি'—এখানে মঞ্চ শব্দে মঞ্চস্থিত ব্যক্তি বুঝায়। ইহাতে কোনও চারুত্ব নাই। যেখানে লক্ষণাতে কোনও চারুত্ব প্রকাশ পায় যেখানে ব্যঙ্গ্যধর্ম্মের অনুপ্রবেশবশতঃই লক্ষণা করা হয়। যেখানে অসম্ভবতাপ্রযুক্ত লক্ষণা করা হয় যেমন—'সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ,' সেখানে ব্যঙ্গ্যধর্ম্মের চারুত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই লক্ষণা করা হয়। এইজন্য অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি ও লক্ষণা এক নহে। অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির মধ্যে কতক অংশে লক্ষণা থাকিলেও তাহাতে যে বিশেষ চারুত্বের অংশ আছে তাহাই দ্যোতিত করিবার জন্য লক্ষণার আশ্রয় করা হয়, কিন্তু তাহাতে বাঞ্জিত চারুতাংশকে অস্বীকার করা যায় না। বাচ্যার্থের সহিত ব্যঙ্গ্যার্থের পার্থক্য এই যে বাচ্যার্থটি নিত্যই শব্দের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ব্যঙ্গ্যার্থটি কেবলমাত্র কোনও কারণবশতঃ বা উপাধিবশতঃ উত্থাপিত হয়। কোনও বিশেষ প্রকরণ, বক্তা বা বোদ্ধব্য ব্যক্তির স্বরূপ জানা

না থাকিলে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয় না। কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকরণবোধের উপর নির্ভর করিলেও তাহা শব্দেরই ধর্ম্ম। অথচ তাহা বাচ্যার্থ নহে, কারণ বাচ্যার্থের সহিত শব্দের যেরূপ নিয়ত সম্বন্ধ আছে, ব্যঙ্গ্যার্থের তাহা নাই। কিন্তু শব্দের ধর্ম্ম হইলেও এই ব্যঙ্গ্যার্থ উপাধির সহিত মিলিত হইলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ব্যঙ্গ্যার্থের বলেই বক্তার অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে শব্দই গমক, লিঙ্গ অথবা হেতু এবং ব্যঙ্গ্যার্থ লিঙ্গী অথবা সাধ্য। লিঙ্গ লিঙ্গীর যেরূপ অবিনাভাবসম্বন্ধ, শব্দও ব্যঙ্গ্যার্থের সেইরূপ সম্বন্ধ। অতএব যখন বক্তার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যঞ্জক শব্দের প্রয়োগ করা হয় এবং যখন শব্দ হইতেই বক্তার অভিপ্রায় অনুমান করা যায়, তখন ব্যঞ্জকত্ব ব্যাপার অনুমান ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার উত্তরে আনন্দবর্দ্ধন বলেন যে ইহাকে যদি কেহ অনুমান বলিতে চায়, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কেবলমাত্র উদ্দেশ্য এই যে শব্দের লাক্ষণিকত্ব ও বাচকত্ব ছাড়া অপর একটি ব্যাপার আছে। সে ব্যাপারটি অনুমান হয় হউক, অনুমান হইলেও তাহা অভিধা ও লক্ষণা হইতে ভিন্ন ও তাহা শব্দের ব্যাপার হইতে বিভিন্ন—"অতশ্চৈতদবশ্যমেব বোদ্ধব্যম্। যস্মাদ্বক্ত্রভিপ্রায়াপেক্ষয়া ব্যঞ্জকত্বমিদানীমেব ত্বয়া প্রতিপাদিতম্। বক্ত্রভিপ্রায়শ্চানুমেয়রূপ এব। নন্বেবমপি যদি নাম স্যাত্তৎকিং নশ্ছিন্নম্? বাচকত্বগুণবৃত্তিব্যতিরিক্তো ব্যঞ্জকলক্ষণঃ শব্দব্যাপারোঽস্তীত্যস্মাভিরভ্যুপগতম্। তস্য চৈবমপি ন কাচিৎ ক্ষতিঃ। তদ্ধি ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বমস্তু অন্যদ্বা। সর্ব্বথাপ্রসিদ্ধশাব্দপ্রকারবিলক্ষণত্বং শব্দব্যাপারবিষয়ত্বং চ তস্যাস্তীতি নাস্ত্যেবাবয়োর্ব্বিবাদঃ।" (ধ্বন্যালোক.২০১ পৃঃ)

কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ব্যঞ্জকতাকে অনুমান বলা চলে না। শব্দের দুই প্রকার বিষয়। শব্দের দ্বারা কিছু প্রতিপাদন করা যায়,

কিংবা কিছু অনুমান করা যায়। বক্তার অভিপ্রায়ই অনুমানের বিষয়। বক্তার অভিপ্রায় বা ইচ্ছা দুই প্রকার। প্রথম শব্দকে প্রকাশ করা, দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা অর্থকে প্রকাশ করা। প্রথমটি সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ। দ্বিতীয়টিতে শব্দবিশেষকে গ্রহণ করিয়া সেই শব্দের ব্যবহারের সহিত যেরূপ অভিপ্রায় বা অর্থ প্রকাশ পায়, শব্দপ্রয়োগের দ্বারা তাদৃশ অর্থ বা অভিপ্রায়কে লোকের গোচরীভূত করিবার চেষ্টা। এই দুইটিই অনুমানের বিষয়। শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ দুই প্রকার—বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য। বক্তা যদি কোন সময় কোন শব্দের দ্বারা কোনও অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সেই অর্থ সেই শব্দের সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত হয়,তবে সেই অর্থকে বাচ্যার্থ বলে। কিন্তু কোন সময় কোন বিশিষ্ট অর্থ যখন তাদৃশভাবে শব্দের সহিত অন্বিত না থাকে তখন কোনও বিশেষ প্রয়োজনের জন্য তাহাকে অন্যরূপে প্রকাশ করা হয়। এই দুই অর্থের কোনটিকেই অনুমান-বিষয়ক বলা চলে না। এই প্রকার প্রকাশস্থলে এইটুকুমাত্র অনুমান করা যায় যে ঐ জাতীয় অর্থপ্রকাশ করা বক্তার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু অর্থটি অনুমানের দ্বারা বুঝানো যায় না। যদি ঐরূপ অর্থ অনুমানের দ্বারা বুঝানো যাইত তবে ব্যঙ্গ্যার্থের স্বরূপ লইয়া তর্ক উঠিত না। ধূমাদি লিঙ্গের দ্বারা বহ্নির অনুমানস্থলে কোনও তর্ক উঠে না। ব্যঙ্গ্যার্থটি বাচ্যার্থের সামর্থ্যের দ্বারাই আক্ষিপ্ত হইয়া আসে, সেইজন্য তাদৃশ অর্থ শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। বাচ্যার্থটি সাক্ষাৎভাবে শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ব্যঙ্গ্যার্থটি গৌণভাবে বা পরম্পরাক্রমে সম্বন্ধযুক্ত। এইজন্য শব্দ যখন ব্যঙ্গ্যার্থকে বুঝাইয়া থাকে তখন তাহা তাহার প্রতিপাদন শক্তির দ্বারাই করিয়া থাকে। ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশিত হইলে তাদৃশ অর্থপ্রকাশই যে বক্তার অভিপ্রায় ছিল এইটুকু মাত্র অনুমানের দ্বারা বুঝি। আলোকের দ্বারা যেমন বস্তু অভিব্যক্ত হয়,

তেমনি শব্দের দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থও অভিব্যক্ত হয়। একথা বলা চলে না যে ব্যঙ্গ্যার্থ যখন বুঝা যায়, তখন তাহার সত্যত্ব অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করা যায়, অতএব ব্যঙ্গ্যার্থও অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করা যায়, কারণ তাহা হইলে বাচ্যার্থও অনুমানের দ্বারা বুঝা যায় বলিতে হয়। কারণ বাচ্যার্থের সত্যতাও অনুমানের দ্বারা নির্ণীত হয়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় সত্যত্ব বাক্যর্থও নয়, ব্যঙ্গ্যার্থও নয়, ইহা একটি অতিরিক্ত বিষয় এবং উহা অনুমানের দ্বারা নিশ্চিত হয়। কাব্য বিষয়ে ব্যঙ্গ্যপ্রতীত অর্থের সত্যাসত্য-নিরূপণের কোনও অবসর নাই, অতএব সেখানে অনুমানেরও কোনও অবসর নাই। অতএব ব্যাঙ্গ্য-প্রতীতি যে সাধ্যপ্রতীতি তাহা বলা যায় না। অনুমানের দ্বারা কেবল-মাত্র অভিপ্রায়ই বুঝা যায়, এজন্য অভিপ্রায়বোধকে ধ্বনি বলা যায় না।

মহিমভট্ট বলেন যে আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি কাব্যের দোষ ও গুণ যে অনৌচিত্যৌচিত্যের উপর নির্ভর করে, ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঔচিত্য দুইপ্রকার শব্দবিষয়ক ও অর্থবিষয়ক। বিভাবানু-ভাব প্রভৃতি যদি যথাযোগ্য রসের অনুকূল না হয়, তবে সেই অনৌচিত্য অন্তরঙ্গ। শব্দাদি-বিন্যাসের অপটুতা-প্রযুক্ত যে রসোদ্বোধের ব্যাঘাত জন্মে তাহা বহিরঙ্গ অনৌচিত্য। যেখানে সাক্ষাৎ রসাদি প্রতীতির বিঘ্ন হয়, সেখানেই অন্তরঙ্গ অনৌচিত্য বলা হয়, যেখানে গৌণভাবে বা পরম্পরাক্রমে ব্যাঘাত হয় তাহা বহিরঙ্গ অনৌচিত্য। বস্তুতঃ বিবক্ষিত রসাদির বিঘ্নবিধায়িত্ব দোষের সাধারণ লক্ষণ। বহিরঙ্গ দোষের উদাহরণ স্বরূপ বিধেয়াবিমর্শ, প্রক্রমভেদ, ক্রমভেদ, পৌনরুক্ত্য, বাচ্যাবচন প্রভৃতি। মহিমভট্ট আরও বলেন যে অনৌচিত্য যে কাব্যের দোষ ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি যে অনৌচিত্যমাত্রই রসপ্রতীতির ব্যাঘাতজন্য বা বিলম্বজন্য বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছেন ইহা অসঙ্গত। কারণ কতকগুলি দোষ শব্দ-ব্যাপারজন্য, কতকগুলি অর্থব্যাপারজন্য। যাহা প্রধানভাবে বর্ণিত হয় তাহাই শব্দব্যাপারজন্য, যাহা অপ্রধানভাবে বর্ণিত হয় তাহাই অর্থব্যাপারজন্য। এই পার্থক্য অস্বীকার করিলে সমস্ত দোষগুণ অলঙ্কারকে অর্থব্যাপার জন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বাচ্যার্থের প্রতীতি সাক্ষাৎ শব্দব্যাপারজন্য, সেইজন্য তাহাই প্রধান। প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি পরম্পরা-জন্য এইজন্য তাহা অপ্রধান। ধূমের দ্বারা যেমন অগ্নির প্রতীতি জন্মে তেমনি বাচ্যার্থের দ্বারা যখন তথাকথিত ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি জন্মে, অনুমানের দিক্ দিয়া তাহার প্রাধান্য থাকিলেও প্রতীতির দিক্ দিয়া তাহা গৌণ। 'লীলাকমল পত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী'—এই শ্লোকে পার্ব্বতী যে পিতার পার্শ্বে অধোমুখী হইয়া লীলাকমলপত্র গণনা করিয়াছিলেন—ইহা হইতে আমরা অনুমান করি যে তিনি বিবাহের কথায় লজ্জা পাইয়াছিলেন। এখানে বাচ্যার্থ দ্বারা লজ্জার যে অনুমান করা হইল—এই ব্যাপারে অবশ্য অনুমেয় লজ্জাই প্রধান। কিন্তু শ্লোকার্থের অবগতির সময় লীলাকমলপত্র গণনা বা অধোমুখী হওয়াই ছিল প্রধান অর্থ। সাক্ষাৎ শব্দের ব্যাপারের দ্বারা তাহাই জানা গিয়াছিল। তাহার পর অনুমানের দ্বারা যে সমস্ত অর্থ আমরা বুঝিতে পারি—যেমন বিবাহের কথায় পার্ব্বতীর লজ্জা হইয়াছিল এবং সেই লজ্জার দ্বারা তাঁহার বিবাহে সম্মতি আছে ইহাও বুঝা যায়, এই সমস্ত অর্থই গৌণ। অতএব অনুমানের দিক্ দিয়া যাহা প্রধান, প্রতীতির দিক দিয়া তাহা গৌণ। যাঁহারা বলেন যে কেবলমাত্র রসপ্রতীতির স্খলনেই দোষের সৃষ্টি হয়, তাঁহারা যে সমস্ত প্রক্রমভঙ্গ দোষ রসপ্রতীতির বিঘ্ন উৎপাদন করে না—সেগুলিকে দোষ বলিয়াই মানিবেন না। কিন্তু মহিমভট্ট বলেন যে সেসমস্ত স্থলে

দোষের সত্তা স্বীকার করিতেই হয়, তবে অনেক গুণালঙ্কারাদির সত্তা-প্রযুক্ত সে দোষ কোনও বিরসতা উৎপাদন করে না। যেমন—

"শুচি ভূষয়তি শ্রুতং বপুঃ প্রশমস্তস্য ভবত্যলঙ্ক্রিয়া।
প্রশমাভরণঃ পরাক্রমঃ স্বনয়াপাদিতসিদ্ধিভূষণঃ" ॥

এখানে 'শুচি ভূষয়তি শ্রুতং বপুঃ' এবং 'প্রশমস্তস্য ভবত্যলঙ্ক্রিয়া' এস্থলে প্রক্রমভেদ হইয়াছে—বলা উচিত ছিল 'বপুষঃ শুচি-ভূষণং-শ্রুতম্'। কাজেই যদিও এই কবিতাটি মনোহারী তথাপি ইহাতে যে দোষ হইয়াছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ শব্দবিন্যাসের বৈপরীত্য-প্রযুক্ত এখানে দোষ হইয়াছে; শব্দবিন্যাসের দোষপ্রযুক্ত পরে অর্থসঙ্গতিরও দোষ হইয়াছে।

আবার অর্থস্বরূপপ্রতীতির দোষ না হইলেও বস্তুবিন্যাসের ক্রমভঙ্গ হইলেও দোষ হইয়া থাকে। যেমন—

'ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো-
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ'।

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে নায়িকার স্বরূপ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে নায়িকার স্পর্শ বর্ণনা করাতে দুইটি বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনা করাতে বস্তুক্রমের ভঙ্গ হইয়াছে। এইজন্য এই শ্লোক রসবহুল হইলেও এখানে বস্তুক্রমভঙ্গ দোষ অস্বীকার করা যায় না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, দোষ মাত্রই যে রসপ্রতীতির বিলম্ব বা ব্যাঘাতজন্য তাহা নহে, শব্দের সামর্থ্য দ্বারা আমরা রস পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারি না। শব্দ তাহার বাচ্যার্থ বুঝাইয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহার পর সেই অর্থের বলে প্রকরণাদির দ্বারা যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহা শব্দের ব্যাপারের দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

মহিমভট্ট তাঁহার ব্যক্তিবিবেকের তৃতীয় বিমর্শে—আনন্দবর্দ্ধন যে

সকল শ্লোকের দ্বারা বাচ্যার্থের সহকৃত হইয়া ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কতকগুলিকে লইয়া বাচ্যার্থের দ্বারা যে ব্যঙ্গ্যার্থ অনুমিত হয়—তাহা দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—"ভম ধম্মিঅ বীসত্থো সো সুণও অজ্জ মারিও দেন।

গোলাণইকচ্ছকুড়ঙ্গবাসিনা দরিঅসীহেন"।

মহিমভট্ট এখানে বলেন যে এই শ্লোকে বাচ্যার্থ ও অনুমেয় অর্থের একত্রে জ্ঞান হয় না। কারণ এখানে বাচ্যার্থ—'ভ্রমণ কর' এবং অনুমেয় অর্থ 'ভ্রমণ করিও না'। এই দুইটি অর্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রতীত হয় না—কারণ দুইটি বিরোধী অর্থ পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী হইতে পারে না। কিন্তু যখন আমরা বাচ্যার্থ চিন্তা করিয়া দেখি, ভাবিয়া দেখি যে 'উদ্ধত সিংহ যখন কুকুরটিকে মারিয়াছে তখন হে ধার্ম্মিক তুমি ভ্রমণ করিতে পার'—তখনই মনে হয় যে যে ব্যক্তি কুকুরের ভয়ে আসিতে পারিত না—সিংহের আবির্ভাবে তাহাকে আসিতে বলা কখনও সম্ভব নয়—এইভাবে বাচ্যার্থ বাধিত হইয়া অনুমেয় অর্থের প্রকাশ হয়। যদি নিয়ত পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিলেই একথা বলিতে হয় যে তাহারা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ এবং একত্রে প্রতীত হয়, তবে শুক্তিরজতাদি স্থলেও তাহা হইতে পারে। শুক্তিকারজত স্থলে যেমন পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিলেও ভ্রমরজত বাধিত হইয়া শুক্তির জ্ঞান হয়, এখানে সেইরূপ ভ্রমণরূপ বাক্যার্থ বাধিত হইয়া ভ্রমণ-নিষেধরূপ অর্থ ফুটিয়াছে। এখানে এই যে ভ্রমণনিষেধরূপ অর্থ তাহা অনুমান ব্যতীত অন্য উপায়ে ঘটে বলা যায় না। সিংহটি থাকে গোদাবরীতীরস্থ গহ্বরে, কুকুরটিও নিকটবর্ত্তী, সিংহটিও মৃদুস্বভাবের নয়। যে ব্যক্তি কুকুর দেখিয়া ভয় পায়, সেব্যক্তি সিংহ হইতে আরও অধিক ভীত হইবে। অতএব যদিও শ্লোকে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতে বলিয়াছে, তথাপি অবস্থা

এরূপ যে নির্ভয়ে ভ্রমণ কিছুতেই সম্ভব নহে। এইভাবে নির্ভয়ে ভ্রমণ বাধিত হওয়াতে অনুমানের দ্বারা ভয়সম্ভাবনাবশতঃ ভ্রমণ-নিষেধই দ্যোতিত হইতেছে। অতএব এখানে অগ্নি আছে ইহা হইতে যেমন অনুমিত হয় যে এখানে শীতস্পর্শ নাই, সেইরূপ এস্থলে যে ভ্রমণ-নিষেধ বোঝায় তাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বলা যায় না। এখানে কোনও সংশয়েরও স্থল নাই। কারণ দৃপ্ত সিংহ যে ধার্ম্মিককে পথে পাইলে ছাড়িয়া দিবে —এরূপ কোনও সম্ভাবনা নাই। মহিমভট্ট আরও বলেন যে আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি যে যে যুক্তির দ্বারা ধ্বনির সত্তা অঙ্গীকার করিয়াছেন, ঠিক সেই সেই যুক্তি দ্বারা ধ্বনিকে অস্বীকার করিয়া অনুমানের দ্বারা তাদৃশ অর্থ অনুমিত হয় একথা বলা যায়। তাই মহিমভট্ট লিখিয়াছেন—

"তদিদং বিস্তরস্তাস্ত তাৎপর্য্যমবধার্য্যতাম্।
যার্থান্তরাভিব্যক্তৌ বস্সামগ্রীষ্টা নিবন্ধনম্॥
সৈবানুমিতিপক্ষে নো গমকত্বেন সম্মতা।
অন্যতোঽন্যস্য হি জ্ঞানমনুমৈকসনাশ্রয়ম্॥
বাচ্যবাচকয়োঃ স্বার্থপ্রাধান্যপ্রতিষেধতঃ।
ধ্বনেঃ শক্ত্যন্তরাভাবাদব্যক্তেশ্চানুপপত্তিতঃ॥"

আমরা দেখিয়াছি যে আনন্দ বর্দ্ধন নিজেও এই অনুমিতি-মত সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। ভরতের টীকাকার শ্রীশঙ্কুকও অনুমিতি মতের পোষকতা করিতেন। অতএব যদিও মহিম ভট্ট এই অনুমিতি মতের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তথাপি এই মত যে আনন্দ বর্দ্ধনাদির অনেক পূর্ব্ব হইতে চলিতেছিল ইহা অস্বীকার করা যায় না। আনন্দবর্দ্ধন নিজেও সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্থলে অনুমিতি যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলেন নাই। পরন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে অনুমিতি হইলেই বা আমাদের ক্ষতি কি? বাচ্যার্থ হইতে আর একটি বিভিন্ন

অর্থ প্রকাশিত হয়—এইটুকু হইলেই আমরা সন্তুষ্ট। কিন্তু তিনি নিজে অনুমিতি-মত মানেন না এবং শব্দেরই ব্যঞ্জনা-ব্যাপার দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীত হয়—ইহার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ধ্বনিকার তৃতীয় উদ্দ্যোতে বলিতেছেন—যে ধ্বনির সম্বন্ধে পূর্ব্বতন লোকের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ ছিল, আমরা সেই ধ্বনিমতকে এখানে ব্যাখ্যা করিলাম।

"বিমতিবিষয়ো য আসীন্মনীষিণাং সততমবিদিতসতত্ত্বঃ।
ধ্বনিসংজ্ঞিতঃ প্রকারঃ কাব্যস্য ব্যঞ্জিতঃ সোঽয়ম্।"

ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য হইলে ধ্বনি হয়, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু বাচ্যার্থ যদি ব্যঙ্গ্যার্থ হইতে অধিকতর চারু হয় তবে তাহাকে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য বলা হয়। যেমন "অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্তৎপুরঃসরঃ",—এখানে দিবস ও সন্ধ্যার নায়ক-নায়িকাস্বরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থই অধিকতর চারু। অনেক সময়ে বাচ্য অলঙ্কারের মধ্যে ব্যঞ্জিত অলঙ্কার যদি অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকে, তবে সেই অলঙ্কারের চারুত্ব বর্দ্ধিত হয়। দীপক, সমাসোক্তি প্রভৃতিস্থলে বাচ্যালঙ্কার প্রধান হইলেও ব্যঞ্জিত উপমাদি তাহার চারুত্ব বর্দ্ধন করে। কোনও বিষয় বর্ণনার সময় তাহার যথাযথ ঔচিত্যবর্দ্ধন করিবার জন্য কবি যে সমস্ত ভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহাকেই অতিশয়োক্তি বলে;—যথা "স্ববিষয়ে যদৌচিত্যং তেন চেদ্ হৃদয়স্থিতেন তামতিশয়োক্তিং কবিঃ করোতি"। ভামহ অতিশয়োক্তি-লক্ষণে বলিয়াছেন—

"সৈষা সর্ব্বত্র বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে।
যত্নোঽস্যাং কবিনা কার্য্যঃ কোঽলঙ্কারোঽনয়া বিনা॥"

ইহার ব্যাখ্যায় আনন্দবর্দ্ধন বলিতেছেন,—অতিশয়োক্তি যে অলঙ্কারকে আশ্রয় করে সেই অলঙ্কারেই যথার্থ চারুতা, অন্য অলঙ্কার

কেবলমাত্র অলঙ্কারই। এই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারই সমস্ত অলঙ্কারের সহিত একীভূতরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, এইজন্য অতিশয়োক্তিকে সর্ব্বালঙ্কাররূপ বলা হইয়াছে। অভিনব ইহার টীকায় বলিতেছেন—অভিধেয়ের যে অলৌকিক বক্রতা তাহাকেই অতিশয়োক্তি বলে। এই বক্রতার দ্বারাই অতি পুরাতন বস্তু নবীনরূপে প্রতিভাত হয়। অভিনব আরও বলেন যে, অতিশয়োক্তিকে যদি সমস্ত অলঙ্কারের সাধারণরূপ বলিয়া বর্ণনা করা যায় তবে অতিশয়োক্তি ছাড়া অন্য অলঙ্কার মানা যায় না। আর তাহাকে যদি কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলা যায় তবে ঔচিত্যবিরহিত অতিশয়োক্তিও কাব্যের প্রাণ হইতে পারে। অতএব এই অতিশয়োক্তিকে অন্য অলঙ্কারের সহিত একরূপ বলিয়া মনে করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক অলঙ্কারের মধ্যে যে চারুত্বের অংশ আছে তাহাকেই অতিশয়োক্তি বলা যায়। ইহা ছাড়া বাচ্যার্থরূপেও অতিশয়োক্তির প্রয়োগ হইতে পারে এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্যরূপে ও ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। বস্তুতঃ সকল অলঙ্কারই বাচ্য, ব্যঙ্গ্য গুণীভূতব্যঙ্গ্যরূপে প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু অতিশয়োক্তির অন্য অলঙ্কার হইতে বিশেষত্ব এই যে, চারুত্বরূপে ইহা সকল অলঙ্কারেরই বিষয় হইতে পারে। সমস্ত অলঙ্কারস্থলেই একথা বলা যায় যে, যেখানে ব্যঙ্গ্যালঙ্কারের সংস্পর্শের জন্য বাচ্য অলঙ্কারটি প্রধান হয়, সেইখানেই গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য হয়। কিন্তু যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ না থাকে সেখানে বাচ্য অলঙ্কার যতই প্রধান হোক্ না কেন, তাহাতে কাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হয় না।

মম্মট ভট্ট তাঁহার কাব্যপ্রকাশে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যের অনেকগুলি বিভাগ করিয়াছেন—যথা অগূঢ়, (বাক্যার্থের অঙ্গ বা উপকারক বাচ্যার্থের অঙ্গ), অস্ফুট, সন্দিগ্ধ, তুল্যপ্রাধান্য, কাকুদ্বারা আক্ষিপ্ত ও

অসুন্দর। ব্যঙ্গ্যার্থটি কিঞ্চিৎ গূঢ় ও কিঞ্চিৎ অগূঢ় হইলেই তাহার চারুতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থটি বাচ্যার্থের মত স্ফুট সেখানে তাহার কোনও চমৎকারিত্ব নাই।

কীচককৃত পরাভব জানাইয়া দ্রৌপদী বৃহন্নলার শরণাগত হইলে অর্জ্জুন একটি শ্লোকের শেষপাদে বলিতেছেন,—"জীবন্ন সম্প্রতি ভবামি কিমাবহামি"। আমি সম্প্রতি একরূপ বাঁচিয়াই নাই, আমি কি করিব? বাঁচিয়া নাই (জীবন্ন ভবামি) ইহার অর্থ ভালোভাবে বাঁচিয়া নাই। এখানে ধ্বনিটি অত্যন্ত স্ফুট হইয়াছে, সেজন্য ইহার চারুতা হয় নাই। কোনও নায়িকার প্রভাতে উঠিতে দেরী হওয়াতে তিনি সখীকে বলিতেছেন যে গৃহদীর্ঘিকাতে ভ্রমরেরা প্রস্ফুটিত পদ্মরেণুতে বিভূষিত হইয়া গান করিতেছে এবং সূর্য্যমণ্ডল উদয়াচলকে চুম্বন করিতেছে। চুম্বন মনুষ্যধর্ম্ম, উদয়াচল ও সূর্য্যের মধ্যে তাহা সম্ভব নহে, এজন্য মুখ্য অর্থ বাধিত হইয়া চুম্বন অর্থে সংযোগমাত্রকে বুঝাইতেছে। এই ব্যঙ্গ্যটি একদিকে যেমন অগূঢ় হইয়া রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি এই ব্যঙ্গ্যার্থ না হইলে বাচ্যার্থ ই বাধিত হইত; এই জন্যই ইহা বাচ্যার্থের অঙ্গভূত হইয়াছে। আবার রাজশেখর বালরামায়ণে সীতার প্রতি রামের উক্তিরূপে লিখিয়াছেন,—

> "অত্রাসীৎ ফণিপাশবন্ধনবিধিঃ শক্ত্যা ভবদ্দেবরে
> গাঢ়ং বক্ষসি তাড়িতে হনুমতা দ্রোণাদ্রিরত্রাহৃতঃ।
> দিব্যৈরিন্দ্রজিদত্র লক্ষ্মণশরৈর্লোকান্তরং প্রাপিতঃ
> কেনাপ্যত্র মৃগাক্ষি! রাক্ষসপতেঃ কৃত্তা চ কণ্ঠাটবী॥"

এখানে রামচন্দ্র বিনয় করিতে গিয়া 'কেনাপি' পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এই 'কেনাপি' শব্দের অর্থ 'ময়া রামচন্দ্রেণ'—ব্যঙ্গ্য অগূঢ় হইয়াছে, সেইজন্য ইহার চারুতা হয় নাই। রসাদি বাচ্যার্থের

অঙ্গ হইলেও তাহাকে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলে; যেমন, 'অয়ং স রশনোৎকর্ষী', এখানে শৃঙ্গাররস করুণের অঙ্গভূত হইয়াছে। এই সমস্ত স্থলে রসবদাদি অলঙ্কারও হইয়া থাকে। আবার ভট্টবাচস্পতির নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে শব্দশক্তিমূলব্যঞ্জনা রামের সহিত উপমানোপমেয়-ভাবে বাচ্যার্থের অঙ্গ হইয়াছে এবং সেইজন্য গুণীভূতব্যঙ্গ্য হইয়াছে।—

"জনস্থানে ভ্রান্তং কনকমৃগতৃষ্ণান্বিতধিয়া
বচো বৈদেহীতি প্রতিপদমুদশ্রু প্রলপিতম্।
কৃতা লঙ্কাভর্ত্তুর্বদনপরিপাটীষু ঘটনা
ময়াপ্তং রামত্বং কুশলবসুতা ন ত্বধিগতা।"

কৃতাপরাধ নায়ক অনুনয় না করিলেও সারল্যপ্রযুক্ত নায়িকা মান ত্যাগ করিলে কোনও সখী তাহাকে বলিতেছেন যে সূর্য্য যখন সমস্ত রাত্রি অন্যত্র যাপন করিয়া আসে তখন প্রভাতে বিরহিণী কমলিনীকে পাদপতনের দ্বারা অনুনয় করিয়া প্রসন্ন করিয়া থাকে। এখানে নায়ক-নায়িকাবৃত্তান্ত ব্যঙ্গ্যার্থ হইলেও তাহা প্রধান না হইয়া বাচ্যার্থেরই মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে; সেইজন্য এখানে বাচ্যার্থাঙ্গভূত গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য হইয়াছে। আবার

"ভ্রমিমরতিমলসহৃদয়তাং প্রলয়ং মূর্চ্ছাং তমঃ শরীরসাদং
মরণঞ্চ জলদভুজগজং প্রসহ্য কুরুতে বিষং বিয়োগিনীনাম্॥"

বিষ শব্দের অর্থ গরল ও জল। এখানে গরল অর্থটি ব্যঙ্গ্যার্থ; এই ব্যঙ্গ্যার্থের দ্বারাই মেঘের সহিত সর্পের উপমাটি স্ফুট হইয়া বাচ্যার্থকে নিষ্পন্ন করিতে পারিয়াছে। বিষ শব্দের গরল অর্থটি ব্যঙ্গ্য না হইলে জলদের সহিত ভুজগের উপমা বুঝা যাইত না। অস্ফুট ব্যঞ্জনার উদাহরণে বলিয়াছেন—

"অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠা দৃষ্টে বিচ্ছেদভীরুতা।
নাদৃষ্টেন ন দৃষ্টেন ভবতা লভ্যতে সুখম্ ॥"

এখানে বক্তব্য ব্যঙ্গ্যার্থ এই যে, তুমি অদৃষ্ট ও থাকিও না, বিয়োগ ভয়ও উৎপন্ন করিও না। কিন্তু এই ব্যঙ্গ্যার্থটি অত্যন্ত অস্ফুট ও ক্লিষ্ট।

সন্দিগ্ধপ্রাধান্য গুণীভূতব্যঙ্গ্যের উদাহরণ—

"হরস্তু কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য্য-
শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥"

এখানে শিব উমামুখের দিকে তাঁহার তিনটি চক্ষু দিয়াই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কেন চাহিয়াছিলেন? ব্যঙ্গ্যার্থ এই যে চুম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়া চাহিয়াছিলেন। এই ব্যঙ্গ্যার্থই প্রধান না তাঁহার ত্রিনেত্র বিস্ফারিত করা রূপ বাচ্যার্থই প্রধান, ইহা সংশয়স্থল এবং ব্যঙ্গ্যার্থকে অধিক চমৎকারী বলা যায় না। তুল্যপ্রাধান্য গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ; যথা, রাবণকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্রী মাল্যবানের নিকট পরশুরামের পত্র হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটি—

"ব্রাহ্মণাতিক্রমত্যাগো ভবতামেব ভূতয়ে।
জামদগ্ন্যস্তথা মিত্রমন্যথা দুর্ম্মনায়তে ॥"

এখানে জামদগ্ন্য অসন্তুষ্ট হইবেন ইহা ব্যাচ্যার্থ, ব্যঙ্গ্যার্থ এই যে জামদগ্ন্য অসন্তুষ্ট হইয়া যেমন ক্ষত্রিয়দিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি রাক্ষসদিগকেও ধ্বংস করিতে পারেন। উভয় অর্থই তুল্য প্রধান। কাকুর দ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থ বেণী-সংহারে; যথা—

"মথ্নামি কৌরবশতং সমরে ন কোপাৎ
দুঃশাসনস্য রুধিরং ন পিবাম্যুরস্তঃ।

সংচূর্ণয়ামি গদয়া ন সুযোধনোরু
সন্ধিং করোতু ভবতাং নৃপতিঃ পণেন ॥”

আমি কি কৌরবদের শত ভ্রাতাকে বধ করিব না? এই কাকুর দ্বারা বধ করিব এই ব্যঙ্গ্যার্থ সূচিত হইয়াছে। অসুন্দর ব্যঞ্জনা যথা—

“বানীর-কুঞ্জোড্ডীন-শকুনীকোলাহলং শৃণ্বন্ত্যাঃ।
গৃহকর্ম্মব্যপৃতায়াঃ বধ্বাঃ সীদন্ত্যঙ্গানি ॥”

কোনও বধূ কোনও উপনায়ককে কোন সময়ে বেতসকুঞ্জে আসিতে বলিয়াছিলেন। সেখানে পাখীর কোলাহল শুনিয়া তাঁহার শরীর অবসন্ন হইল, কারণ গৃহকর্ম্মে ব্যপৃত বলিয়া তিনি মিলিত হইতে পারিবেন না। এই বাচ্যার্থ অপেক্ষা কোন উপনায়ককে আসিতে বধূ বলিয়াছিলেন এই ব্যঙ্গ্যার্থ অধিক সুন্দর হয় নাই। গুণীভূতব্যঙ্গ্যের যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইল, তাহা ছাড়া আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে বাচ্যে কোনও অলঙ্কার থাকে না অথচ ব্যঞ্জনার দ্বারা কোনও অলঙ্কার প্রতীত হয়, সেখানে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য না হইয়া ধ্বনি হইয়া থাকে।

মম্মট ভট্ট ধ্বনিবিভাগ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ধ্বনি প্রধানতঃ তিন প্রকার—শব্দশক্তি-প্রভব ও অর্থশক্তি-প্রভব ও শব্দার্থশক্তি-প্রভব। শব্দশক্তি-প্রভব ব্যঞ্জনা দুই প্রকার। শব্দ হইতে যেখানে অলঙ্কার বা বস্তু ধ্বনিত হয় তাহাই শব্দশক্তি-প্রভব। অর্থশক্তি-প্রভব ব্যঞ্জনা আবার তিন প্রকার—স্বতঃসম্ভবী অর্থাৎ স্বাভাবিক, কবিপ্রতিভাসিদ্ধ এবং কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রতিভাসিদ্ধ। ইহারা আবার প্রত্যেকে দুই প্রকার—বস্তু হইতে যেখানে ধ্বনি হয় এবং অলঙ্কার হইতে যেখানে ধ্বনি হয়। ইহারা আবার দুই প্রকার, বস্তুধ্বনি বা অলঙ্কারধ্বনি। অর্থাৎ ব্যঞ্জক যেখানে বস্তু বা অলঙ্কার এবং ব্যঙ্গ্য যখন বস্তু বা অলঙ্কার।

শব্দার্থ উভয়োদ্ভব ধ্বনি এক প্রকার। তাহা হইলে মোট ১৫ প্রকার ধ্বনি। অবিবক্ষিতবাচ্য ও অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ধ্বনির এই তিন প্রকার ভেদ আছে—সর্ব্বশুদ্ধ ১৮টি ধ্বনি। বাক্য হইতে যে ধ্বনি হয় তাহা শব্দার্থ—উভয়-শক্তিমূলক। কিন্তু পদ বা পদাংশ হইতেও ধ্বনি হইতে পারে। প্রবন্ধ হইতে যে ধ্বনি হয় তাহাকে অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি কহে।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেন যে বোদ্ধব্যক্তির স্বরূপ অনুসারে সংখ্যা, নিমিত্ত, কার্য্য, প্রতীতিকাল, আশ্রয় এবং বিষয়াদির ভেদ অনুসারে ব্যঙ্গ্যের ভেদ হইয়া থাকে। 'ভম ধম্মিঅ' ইত্যাদি স্থলে বিধিরূপ বাচ্যার্থ হইতে নিষেধরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

"নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং নির্মৃষ্টরাগোঽধরো
নেত্রে দূরমনঞ্জনে পুলকিতং তন্বি তবেদং বপুঃ।
মিথ্যাবাদিনি দূতি বান্ধবজনস্যাজ্ঞাতপীড়াগমে
বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ন পুনস্তস্যাধমস্যান্তিকম্॥"

এখানে অধম পদের দ্বারা ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে যে, যে দূতীকে নায়কের অনুনয়ের জন্য পাঠানো হইয়াছিল সে তাহারই সহিত রাত্রি যাপন করিয়া আসিয়াছে। বাচ্যার্থ এইটুকু পাওয়া যায় যে নায়িকা বলিতেছেন যে তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তুমি স্নান করিয়া আসিয়াছ—নায়কের কাছে যাও নাই। এখানে নিষেধরূপ বাচ্যার্থ হইতে বিধিরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশ পাইয়াছে। এই দুই রকমকেই স্বরূপ-ভেদ বলা যায়। আবার 'গতোঽস্তমর্কঃ' বলিলে বোদ্ধর ভেদ অনুসারে বিভিন্ন অর্থ ব্যঞ্জিত হইবে। ইহা শুনিলে কেহ বা মনে করিবেন কান্তানুসরণের সময় হইয়াছে, কেহ বা ভাবিবেন গোশালায় গাভী লইয়া যাইতে হইবে, কেহ বা মনে করিবেন যে উত্তাপ গত হইয়াছে ইত্যাদি। ইহাকে

নিমিত্তভেদ বলা যায়। ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ অপেক্ষা অধিক চমৎকারী এবং বাচ্যার্থের পরে ইহা প্রকাশ পায়।

মম্মটভট্ট বলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে অভিহিতান্বয়বাদী নৈয়ায়িক এবং ভট্ট-মতানুযায়ী কোন কোন মীমাংসকেরা শব্দের ব্যঞ্জনা স্বীকার করিতে চান না। ইঁহারা বলেন যে শব্দের সাধারণ শক্তি জাতিতে। 'গৌঃ' বলিতে গোত্ব বুঝি, কিন্তু বাক্যার্থ বুঝিতে গেলে আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, যোগ্যতা প্রভৃতির দ্বারা পদার্থগুলির পরস্পর সংসর্গ ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে পদার্থের অতিরিক্ত বিশেষ বাক্যার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। এই পদার্থগুলির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য শব্দের তাৎপর্য্য নামক স্বতন্ত্র বৃত্তি স্বীকার করেন। ঘট শব্দের অর্থ ঘট, অম্ প্রত্যয়ের অর্থ কর্ম্মতা, ইহা মানিলেও ঘটগত কর্ম্মতা বা ঘটীয় কর্ম্মতা অর্থাৎ ঐ কর্ম্মতা যে ঘটকেই লক্ষ্য করিতেছে, তাহার বাচক কোনও শব্দ নাই বলিয়া তাৎপর্য্য বৃত্তি স্বীকার করেন এবং তাহার বলেই 'ঘটমানয়' বলিলে কোনও বিশেষ ঘটকর্ম্মক আনয়ন বুঝিয়া থাকেন। এই তাৎপর্য্য-বৃত্তি আকাঙ্ক্ষাদি বশতঃ প্রতীত হয়। গো শব্দ যে সাধারণ ভাবে গোত্ব বুঝাইত এবং অম্ প্রত্যয় যে সাধারণ ভাবে কর্ম্মত্ব বুঝাইত—এই দুই প্রকার সাধারণ ভাবে বুঝাইবার শক্তিকে বিশেষ ঘট ও তদ্‌গত বিশেষ কর্ম্মতাকে বুঝাইবার জন্যই তাৎপর্য্যবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের প্রদীপ টীকায় ইহার ব্যাখ্যায় লেখা আছে—"লাঘবাৎ পদানাং পদার্থমাত্রে শক্তির্নতু অন্বয়াংশেঽপি গৌরবাৎ অন্যলভ্যত্বাচ্চ। তদংশো হি তাৎপর্য্যার্থো বাচ্যাদ্যর্থবিলক্ষণশরীর আকাঙ্ক্ষাদিবশাৎ অপদার্থোঽপি প্রতীয়তে। ন চ অপদার্থপ্রতীতাবতিপ্রসঙ্গঃ। স্বরূপসতঃ শক্যান্বয়ত্বস্য নিয়ামকত্বাৎ ইত্যভিহিতান্বয়বাদিনাং মতম্।" যদি সামান্য ভাবে বা জাতিরূপে

পদার্থ বুঝিয়াও বিশেষরূপ গবাদিতে অন্বয়বোধের জন্য শব্দের তাৎপর্য্যার্থ স্বতন্ত্র শক্তি স্বীকার করিতে হয়, তবে ব্যঙ্গ্যার্থ বুঝিবার জন্য স্বতন্ত্র শক্তি স্বীকার করিব না ইহা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে ?

প্রভাকরমতে শব্দজ্ঞান-প্রক্রিয়া আলোচনা করিতে গিয়া মম্মট বলেন, যখন কোনও বয়স্ক লোক কোনও ব্যক্তিকে বলেন যে গোরুটি আন, ঘোড়াটি লইয়া যাও, তখন তাহাদের সমীপস্থ শিশু দেখে যে গোরুটি আন বলিলে একটি বিশিষ্ট আকারের প্রাণীকে কেহ লইয়া আসে এবং ঘোড়াটি লইয়া যাও বলিলে আর একটি প্রাণীকে অন্যস্থানে লইয়া যায়, তখন সমীপস্থ শিশুর মনে অর্থাপত্তি প্রমাণ বলে সেই বাক্যের অখণ্ড বোধ হয়। অর্থাপত্তি প্রমাণের তাৎপর্য্য এই যে, মনের মধ্যে যখন দুইটি ভাব একান্তভাবে জড়িত থাকে, তখন মনের এমন একটি গতি হয় যে তাহাদের একটিকে দেখিলেই আর একটিরও সম্ভাবনা এমন ভাবে মনে ওঠে যে, প্রথমটি যদি সত্য হয় তবে দ্বিতীয়টিও সত্য না হইয়া পারে না। মনের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে যখন একটি বস্তুর সত্তা দ্বারা আর একটি বস্তুর সত্তা আসিয়া পড়ে তখন মনের সেই বৃত্তিকে অর্থাপত্তি প্রমাণ বলে। স্থূল হওয়ার সহিত আহার করার এমন একটি সম্পর্ক মনের মধ্যে আছে যে কেহ স্থূল হইয়াছে বলিলেই একথা স্বভাবতঃই মনে পড়ে যে সে আহার করে। এইজন্য যদি কেহ বলে যে দেবদত্ত স্থূল হইয়াছে কিন্তু সে দিনে আহার করে না, তখন আমাদের স্বভাবতঃই মনে হয় সে রাত্রিতে আহার করে। কিংবা যদি কেহ বলে যে দেবদত্ত বাঁচিয়া আছে কিন্তু গৃহে নাই, তখনই আমাদের মনে হয় যে সে নিশ্চয়ই বাহিরে আছে। এই প্রক্রিয়া হইতে অনুমানের পার্থক্য এই যে, অনুমানস্থলে একটি বস্তুর সত্তা হইতে অপর বস্তুর সত্তায় উপনীত হইতে হইলে ঐ উভয় বস্তুর মধ্যে যে ব্যাপ্তি

বা universal concomitance আছে তাহা স্মরণ হওয়া আবশ্যক। যখন ব্যাপ্তির স্মরণ ছাড়াই একটি বস্তু হইতে অপর বস্তুর সত্তা আপনা হইতেই মনের মধ্যে আসে তাহাকে অর্থাপত্তি কহে। শিশু যখন দেখে যে গোরু আন বলিলে দেবদত্ত যেরূপ কাজ করে ও যাহা আনে, ঘোড়া লইয়া যাও বলিলে তাহা হইতে অন্যপ্রকার কাজ করে; তখন তাহার মনে গোরু আন এই বাক্যটির অখণ্ড ভাবে গোরু আনা ব্যাপাররূপ অর্থের বোধ হয় এবং ঘোড়া লইয়া যাও এই বাক্যের ও তদনুরূপ একটি অখণ্ড বোধ হয়। গোরু আন এই বাক্যের গোরু শব্দের বা আন শব্দেরও কোন পৃথক্ বোধ হয় না, কিন্তু গোরু আন এই সমুদয় বাক্যে গোরুর আনয়নরূপ একটি অখণ্ড অর্থের বোধ হয়। এই জন্যই প্রাভাকরেরা বলেন যে, কোনও শব্দেরই স্বতন্ত্র এবং পৃথক্ একটি অর্থবোধ হয় না। প্রত্যেক শব্দেরই বোধ হইতে হইলে অন্য শব্দের সহিত সম্বন্ধরূপে বা বাক্যরূপে তাহার বোধ হয়। অভিহিতান্বয়বাদী নৈয়ায়িকেরা ও ভাট্টেরা মনে করেন যে প্রত্যেক শব্দ এবং প্রত্যয়ের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ আছে, তাৎপর্য্যবৃত্তি দ্বারা শব্দের অর্থ ও প্রত্যয়ের অর্থ মিলিত করিয়া ও পরে প্রত্যেক পদার্থের সহিত অন্য পদার্থের মিলন করাইয়া একটি বাক্যার্থের বোধ হয়। প্রত্যেক শব্দের পৃথক্ বাচ্যার্থ আছে ও প্রত্যেক প্রত্যয়ের পৃথক্ বাচ্যার্থ আছে; এই বাচ্যার্থকে অভিহিতার্থ বলা যায়। তাৎপর্য্যবৃত্তির দ্বারা শব্দের অভিহিতার্থ ও প্রত্যয়ের অভিহিতার্থ মিলিত হইয়া পদের অভিহিতার্থ পাওয়া যায়। বিভিন্ন পদের অর্থগুলি অন্বিত বা মিলিত হইয়া একটি বাক্যার্থের সৃষ্টি করে। তাঁহাদের মতে অভিহিতার্থেরই অন্বয় বা সংযোগে বাক্যার্থের নিষ্পত্তি হয় বলিয়া তাঁহাদিগকে অভিহিতান্বয়বাদী বলে। কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদী প্রাভাকরেরা বলেন যে, যেহেতু

ব্যুৎপত্তিকালে বাক্যার্থেরই অখণ্ড বোধ প্রথম হয় ও পরে বিশ্লেষণের দ্বারা প্রত্যেক পদের স্বতন্ত্র অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি, সেইজন্য বিশ্লেষণের দ্বারা প্রত্যেক পদের স্বতন্ত্র অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি; সেইজন্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রত্যেক পদের অর্থই অন্য পদের অর্থের সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ পায়। সংযুক্ত বা অন্বিত না হইয়া কোনও পদেরই অর্থপ্রতীতি হয় না ; এইজন্য তাঁহাদিগকে অন্বিতাভিধানবাদী বলা হয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, গোরু আনো, ঘোড়া আনো, জল আনো প্রভৃতি নানাবিধ বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে কর্ম্মের বিভিন্নতা থাকিলেও আনয়ন ক্রিয়ার একরূপতা অস্বীকার করা যায় না। এই আনয়নক্রিয়ার অর্থবোধ করিতে গেলে অর্থাৎ আনয়ন বলিলে যে অর্থের বোধ হয় তাহা যদি সর্ব্বদা গোরুর সহিত অন্বিত হইয়া প্রকাশ পায় অর্থাৎ আনয়ন বলিতেই যদি আমরা গোরু আনয়ন বুঝি, তবে আনো শব্দের সহিত অশ্বের আনয়ন বুঝাইতে পারে না। এইজন্য অন্বিতাভিধানবাদীকে ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে আনয়ন শব্দের অর্থ কোনও বিশেষ গোরু, ঘোড়া বা জল প্রভৃতির সহিত অন্বিত হইয়া প্রকাশ পায় না। তাহা সাধারণ ভাবে কর্ম্মের সহিত অন্বিত হইয়া প্রকাশ পায়। সাধারণ ভাবে কর্ম্মের সহিত অন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইলেও বিশেষভাবে বিশেষ গোরু, ঘোড়া প্রভৃতির সহিত অন্বিত হইতে হইলে স্বতন্ত্র শক্তি আবশ্যক। এইজন্য এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে যে নৈয়ায়িকদের পক্ষে যেমন সামান্যভাবে গো শব্দ প্রভৃতির দ্বারা গোত্ব প্রভৃতির বোধ হইলেও বিশেষ গবাদির বোধের জন্য তাৎপর্য্য বৃত্তির প্রয়োজন হয়, সেইরূপ অন্বিতাভিধানবাদীর পক্ষে সামান্যভাবে অন্বিত হইয়া পদার্থের বোধ হইলেও বিশেষ ভাবে বিশেষ পদার্থের সহিত অন্বয়ের জন্য তাৎপর্য্যবৃত্তি মানা আবশ্যক।

ইহার উত্তরে অন্বিতাভিধানবাদীরা বলেন যে যখন সামান্তভাবে কোনও শব্দের বোধ হয় তখন সেই সামান্তের মধ্যেই সকল বিশেষ গৃহীত হয়। গোত্বজাতির বোধের মধ্যে যেমন সকল গোরুই পাওয়া যায়, তেমনি সাধারণ ভাবে অপর পদার্থের সহিত অন্বিতরূপে যখন আনয়ন-সামান্তের বোধ হয়, তখন তাহার দ্বারা সকল বস্তুরই আনয়ন হইতে পারে। কর্ম্মসাধারণের সহিত অন্বিত হইয়া যে আনয়নের বোধ হয় তাহার মধ্যেই সমস্ত বিশেষ আনয়নের কর্ম্ম গৃহীত হয়। আনো বলিলেই বুঝা যায়—কিছু আনো; কিছু পদেই সাধারণ কর্ম্ম বুঝি এবং ইহার মধ্যেই গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি যাবতীয় বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম আক্ষেপের দ্বারা বুঝিতে পারি। কারণ সামান্তমাত্রই সমস্ত বিশেষকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এইজন্য সামান্ত ভাবে কর্ম্মের সহিত অন্বিত হইয়া কোন শব্দের অর্থবোধ হইলে স্বতন্ত্র তাৎপর্য্য বৃত্তির আবশ্যক নাই—"যগুপি বাক্যান্তর-প্রযুজ্যমানান্যপি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যয়েন তান্তেব এতানি পদানীতি নিশ্চীয়ন্তে ইতি পদার্থান্তরমাত্রেণ অন্বিতঃ পদার্থঃ সঙ্কেতগোচরঃ, তথাপি সামান্যাবচ্ছাদিতবিশেষরূপ এবাসৌ প্রতিপগ্যতে, ব্যক্তিশক্তানাং পদার্থানাং তথাভূতত্বাৎ ইত্যন্বিতাভিধানবাদিনঃ।" এতাদৃশ অন্বিতাভিধানবাদীদের মতে যে ব্যঙ্গ্যার্থ অভিধাগম্য হইতে পারে না ইহা বুঝাইতে গিয়া মম্মট বলিতেছেন যে, আনয়নক্রিয়া সাধারণভাবে সকল কর্ম্মকে নিজের সহিত অন্বিত করিয়া প্রকাশ পায়, ইহা বলিলে বিভিন্ন কর্ম্মের সহিত যে বিভিন্ন প্রকার আনয়ত্ব আছে তাহা বুঝাইলেও গবাদিরূপ বিশেষ বস্তুর আনয়ন বুঝাইতে পারে না। যদি তাহা বুঝাইতে তবে আনো বলিলেই গোরু আনো ইহা বুঝাইতে পারিতাম। অতএব দেখা যাইতেছে যে যদিও আনো শব্দটি সামান্তবিশেষাত্মকরূপে অন্বিত হইয়া

অর্থপ্রকাশ করে, তথাপি তাহা অতি বিশেষ গবাদিকে বুঝাইতে পারে না। এ অবস্থায় ব্যঞ্জনাগম্য অর্থকে অভিধার দ্বারা বুঝানো একেবারে অসম্ভব, কারণ ব্যঞ্জনার দ্বারা অনেক সময় একেবারে বিভিন্নজাতীয় অর্থের প্রতীতি হয়—ভ্রমণ করো বলিলে করিওনা বুঝায়। যাও নাই বলিলে গিয়াছ বুঝায়। এতাদৃশ দূরবর্ত্তী অর্থকে কখনও বাচ্যার্থের অন্তর্গত বলা যায় না। কি অন্বিতাভিধানবাদে কি অভিহিতান্বয়বাদে—উভয় মতেই সাধারণ পদের অর্থ হইতে কিছুতেই বাক্যের অর্থ পাওয়া যায় না। উভয় মতেই বাক্যার্থটি পদের অর্থ হইতে একেবারে ভিন্ন।

অনেকে বলেন যে শব্দ দ্বারাই যখন ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ হয়, তখন তাহাকে বাচ্যার্থ বলিতে দোষ কি? ইহার উত্তরে মম্মট বলেন যে শব্দ যে ব্যঙ্গ্যার্থকে জানায়, এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু যে রকম ব্যাপারের দ্বারা শব্দ বাচ্যার্থকে জানায়, সেরকম ব্যাপারের দ্বারা তাহা ব্যঙ্গ্যার্থকে জানায় না।

'The *modus operandi* of a word as signifying its implied meaning is entirely different from that of signifying its ordinary usual meaning অর্থাৎ যে উপায় বা যে ব্যাপারের দ্বারা শব্দ হইতে আমরা ব্যঙ্গ্যার্থ পাই, তাহার প্রণালী বাচ্যার্থ বুঝাইবার প্রণালী অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেহ কেহ বলেন যে, তীব্রবেগে কোনও তীর প্রেরিত হইলে তাহা যেমন মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া শত্রুর হৃৎপিণ্ডকে উচ্ছিন্ন করিতে পারে, শব্দও তেমনি একটি অর্থকে বাচ্যার্থের দ্বারা বুঝাইয়া ক্রমশঃ আর একটি ব্যঙ্গ্যার্থকে বুঝাইলে তাহাতে দোষ কি? ইহার উত্তরে মম্মট বলেন যে কোনও শব্দ শুনিবার পর যাহা কিছু ঘটে তাহাকেই বাচ্যার্থ বলে না। যদি বলা

যাইত, তবে কাহাকেও তোমার পুত্র হইয়াছে বলিলে তাহার যে আনন্দ হয়, তাহাকেও বাচ্যার্থ বলিতে হইত।

বাচ্যার্থ সকল সময়েই একরূপ কিন্তু ব্যাঙ্গ্যার্থ প্রকরণাদি নানা কারণে নানারূপ হইতে পারে। অনেক সময় ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত ও দেখা যায়। এ অবস্থায় বাচ্যার্থ হইতে অতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যার্থ না মানিলে কাব্য হইতে যে সমস্ত অর্থ প্রতিপন্ন হয়—যে সমস্ত রসাদির বোধ হয়, তাহার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। মহিম ভট্ট যে বলিয়াছেন, অনুমানের দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীত হয়, তাহাও ঠিক নহে। কারণ 'ভ্রম ধার্ম্মিক' ইত্যাদি স্থলে সিংহ বাহির হইয়াছে এই ভয়-কারণ আছে বলিয়া ধার্ম্মিককে বাহির হইতে নিষেধ করা হইয়াছে—ইহা অনুমানের দ্বারা বুঝা যায় না। কারণ ভয়ের কারণ থাকিলেও গুরু বা প্রভুর আজ্ঞায় কিংবা প্রিয়ার প্রতি ভালবাসায় লোকে ভয়বহুল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আবার এমন লোকও আছে যে কুকুরকে ভয় পায়, সিংহকে ভয় পায় না—এতএব এমন কোন হেতু নাই যাহাতে নিশ্চিতভাবে ইহাকে অনুমান বলা যাইতে পারে। এইজন্যই ব্যঙ্গ্যার্থ বুঝাইবার জন্য শব্দের স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনাশক্তি স্বীকার করিতে হয়।

ধ্বনিকারের গ্রন্থ লিখিত হইবার পর অধিকাংশ আলঙ্কারিকেরাই ব্যঙ্গ্যার্থের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যঞ্জনা নামক শব্দের স্বতন্ত্র ব্যাপার ও স্বীকার করিয়াছেন। শব্দ কি উপায়ে অর্থবোধ করায় এসম্বন্ধে নৈয়ায়িক ও মীমাংসকেরা অনেক গবেষণা করিয়াছেন। সেই সমস্ত গবেষণায় তাঁহারা ব্যঞ্জনারূপ কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি স্বীকার করেন নাই। সেইজন্য এই বিষয়ে আলঙ্কারিকদের সহিত তাঁহাদের তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহারই সামান্য আভাস

দিবার জন্য আনন্দবর্দ্ধন ও মম্মট এ বিষয়ে যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল। আধুনিক কালে ইয়োরোপীয়দের গ্রন্থে এসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা দেখা যায় না। অতি আধুনিক কালে Jesperson, Richards প্রভৃতির গ্রন্থে এসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। শব্দের ব্যাপার কথাটিকে ইংরাজি হিসাবে বুঝিতে গেলে আমরা function বলিতে পারি। আধুনিক ভাবে প্রশ্নটি এই দাঁড়ায় —what is the function of a word or a sentence in literature? আমরা জানি যে শব্দমাত্রেরই একটি primary meaning আছে। ইহাকেই সংস্কৃতে বাচ্যার্থ বলে। ইহা ছাড়া অনেক সময় context হিসাবে primary meaning ছাড়িয়া শব্দ হইতে একটা secondary meaning পাওয়া যায়। ইহাকেই লক্ষ্যার্থ বলে। কিন্তু literatureএর পক্ষে এই দুইটি অর্থই যথেষ্ট নহে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই সাহিত্য শব্দের যে একটি বিশেষ রামণীয়কতা আছে তাহা লক্ষিত হইয়াছিল। Longinus বলিয়াছেন "Beautiful words are the very and peculiar light of the mind". Bradley বলিয়াছেন "Poetry is the spirit. It comes we know not whence. It will not speak at our bidding and will not answer in our language. It is not our servant, it is our master." Ogden বলিয়াছেন—"What is certain is that there is a common and important use of word which is different from scientific or as we shall call it the strict symbolic use of word." শব্দের emotive function সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ঐ গ্রন্থকারই বলেন—যে শব্দের function নানাবিধ। আমরা যখন বলি

Man is a worm—তখন ইহার বাচ্যার্থের কোনও তাৎপর্য্যই নাই। ঐ বাক্যের দ্বারা আমরা কোনও বর্ণনা করি না, কিন্তু মনের একটি ভাবকে উদ্যোতিত করি। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সঙ্গে যদি—The height of the Eiffel Tower is 900 feet এই বাক্যের তুলনা করি তবেই উভয়ের পার্থক্য অনায়াসে অনুভূত হইবে। যখন বলি Man is a worm তখন "we may not be making statements not even false statements; we are most probably using words merely to evoke certain attitudes." শব্দের এই জাতীয় বৃত্তির জন্য বক্তা এবং বোদ্ধব্যের বিশেষ একটি সম্বন্ধ থাকা চাই, যাহার বলে বক্তা তাঁহার বাক্যের দ্বারা বোদ্ধব্যের চিত্তে বিশেষ কোনও ভাব, রসাদি বা বস্তু অভিব্যঞ্জিত করিতে পারেন।

Under the emotive functions I have included both the expression of conditions, attitudes, moods, intuitions etc. in the speaker and their communications and that is their evocations in the listener.' সংস্কৃতে যাহা অভিব্যঞ্জনা বলা যায় evoke শব্দের দ্বারা এখানে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ সম্বন্ধে তুলনা করিতে গিয়া Ogden বলেন যে, Two functions under consideration usually occur together but none the less they are principally distinct. So far as words are used emotively no question as to their truth in the strict sense can directly arise. Very much poetry consists of statements, symbolic arrangements capable of truth or falsity, which are used not for the sake of their truth

or falsity but for the sake of the attitudes which their acceptance will evoke. Provided that the attitude or feeling is evoked the most important function of such language is fulfilled and any symbolic function that the words may have is instrumental only and subsidiary to the evocative functions." অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থকে দ্যোতিত করাই কাব্যের প্রথম প্রয়োজন। বাচ্যার্থ সেখানে আপনাকে গৌণ করিয়া, স্বার্থকে উপসর্জ্জনীভূত করিয়া, দ্বারভূত হইয়া ব্যঙ্গ্যার্থকে দ্যোতিত করে। ব্যঙ্গ্যার্থ সম্বন্ধে সেইজন্য সত্য মিথ্যা কিছুই বলা চলে না। তাহা সত্য মিথ্যা-বিলক্ষণ।

একথা ভট্টনায়ক অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি বারংবার বলিয়াছেন। এই কথাই লক্ষ্য করিয়া Ogden বলেন, "The best test of whether our use of words is essentially symbolic or emotive is the question 'Is this true or false in the ordinary scientific sense'? If this question is relevant then the use is symbolical (অভিধা). If it is clearly irrelevant then we have an emotive utterance." অনেক সময় কোন একটি শব্দের এমন ব্যঞ্জনা শক্তি (emotive efficiency) থাকে যে তাহার প্রতিশব্দের দ্বারা তাহার সে সামর্থ্য বুঝা যায় না। কোনও শব্দের যে কেবলমাত্র স্বাভাবিক ব্যঞ্জনাশক্তি তদর্থবোধক অন্য শব্দাপেক্ষা অধিক তাহা নহে, কিন্তু অন্য শব্দের সান্নিধ্য বশতঃ একটি শব্দের যে ব্যঞ্জনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে চ্যুত হইলে তাহার সে শক্তি থাকে না। এইজন্য Richards তাঁহার Philosophy of Rhetoric নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "A word or

phrase when isolated momentarily from its controlling neighbours is free to develop irrelevant senses which may then beguile half the other words to follow it. And this is at least equally true with the language functions other than sense, with feeling, say." অলঙ্কার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ঐ গ্রন্থে Richards বলিতেছেন যে অলঙ্কারের তাৎপর্য্য ব্যঙ্গ্যার্থের পরিপোষণ। "What splendour is there in the imagery ? These images have no splendour but are severely efficient, a compact means for saying what one has to say.······Loose them even a little from their service, let their splendour act independently and they begin at once to fight against the writer's intention."

আমাদের দেশে ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে—ইয়োরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যে তাহা হয় নাই। তথাপি বর্ত্তমান যুগের কাব্য-সমালোচনায় ব্যঞ্জনাই যে কাব্যের প্রাণ সে সম্বন্ধে অধিকতর দৃষ্টি পড়িয়াছে। Richards তাঁহার Philosophy of Rhetoric এ বলিয়াছেন যে অনেক সময় যে সমস্ত শব্দের আংশিক ভাবে উচ্চারণ-ধ্বনির ও অর্থের মিল আছে যেমন flare, flash, flame ইত্যাদি, সে সব স্থলে ইহাদের যে কোনও একটি শব্দের ব্যবহার হইলেও তাহা তজ্জাতীয় অন্য শব্দের অর্থ বা ছবি তাহার মধ্য দিয়া ব্যঞ্জিত করে। এবং এইজন্যই কোন বিভিন্ন সাহিত্য হইতে কোনও কাব্য অনুবাদ করিলে সে অনুবাদ মূলের মধ্যে বিষয়বস্তুটি যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে সেই প্রকাশকে দ্যোতিত করিতে পারে না। যে

সমস্ত জাতীয় শব্দের উচ্চারণ এবং অর্থসাম্য আছে তাহাদিগকে তিনি Morpheme এই আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে Richards বলিতেছেন—"I conclude then that these expressive or symbolic words get their feeling of being peculiarly fitting from the other words sharing the Morphemes which support them in the background of the mind. In translation, for example, the expressive word in another language will not necessarily sound at all like the original word. Evidently, again a proper appreciation of the expressiveness of a word in a foreign language will be no matter of merely knowing its meaning and relishing its sound. It is a matter of having in the background of the mind the other words of the language which share Morphemes with it. Thus no one can appreciate these expressive features of foreign words justly without a really wide familiarity with the language."

ব্যঞ্জনাস্থলে যেরূপ উদ্রিক্ত বাসনার বলে অলৌকিক চমৎকারিত্বের কথা বলা হইয়াছে, শাব্দী ব্যঞ্জনার উদাহরণ লইয়া এখানে তাহারই সূচনা করা হইয়াছে। আমাদের আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন যে অনেক সময় শব্দসৌষ্ঠবের দ্বারা কোনও শৃঙ্গারাদি রস, বস্তু বা অলঙ্কার ধ্বনিত না হইলেও একটি বিশেষ চমৎকারিত্ব উদ্ভূত হয়। Morpheme এর প্রয়োগের দ্বারা তজ্জাতীয় অন্য শব্দ বাসনাস্বরূপে থাকিয়া যে চমৎকৃতিকে ব্যঞ্জিত করে, তাহা কোনও রস বা বস্তুকে ধ্বনিত করে না।

তথাপি তাহার দ্বারা একটি চমৎকারিত্ব উৎপন্ন হয়। এ সম্বন্ধে কাব্য-প্রকাশের টীকায় উদ্দ্যোতকার লিখিয়াছেন—"অলঙ্কৃত-শব্দব্যঙ্গ্যস্ত আস্বাদস্য বিভাবাদ্যপ্রাপ্তৌ শৃঙ্গারাদিবিশেষানাশ্রয়ত্বেন দ্বয়োরপি আস্বাদোপকারকত্বাৎ কবিসংরম্ভগোচরত্বাচ্চ উপাদেয়তা।" অর্থাৎ রসাদিকে ধ্বনিত করিতে না পারিলেও অলঙ্কৃত শব্দের দ্বারা ব্যঞ্জিত আস্বাদটির কাব্যের পক্ষে বেশ উপযোগিতা আছে।

শব্দার্থী ব্যঞ্জনার উদাহরণ দিতে গিয়া Richards উক্ত গ্রন্থে Shakespeare এর *Antony and Cleopatra* হইতে একটি কাব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

Come, thou mortal wretch,
With thy sharp teeth this knot intrinsicate
Of life at once untie ; poor venomous fool,
Be angry, and despatch.

Richards বলেন যে এখানে mortal শব্দের অর্থ মারক কিন্তু ইহার দ্বারা একটি বিরোধাভাস অলঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। মারক ভুজঙ্গ, অমর আত্মা বা অমর জীবনকে বিঘ্নিত করিবে। knot শব্দের অর্থ গ্রন্থি, এই গ্রন্থি শব্দের দ্বারা হৃদয়গ্রন্থিও বুঝা যায়। যেমন 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ'। গ্রন্থিমোচনের দ্বারা সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। গ্রন্থি সমস্ত প্রসারিত সূত্রের সন্ধিস্থান, সমস্ত অর্থের বীজভূত উৎপত্তি-কেন্দ্র। Richards বলেন যে intrinsicate শব্দের দ্বারা intrinsic ও intrinse এই দুই শব্দের যে বহু অর্থ আছে (যথা পরিচিত, ঘনিষ্ঠ, রহস্য, গোপন, অন্তরঙ্গ, সারভূত, অন্তর্ন্যস্ত) তাহা একত্র পিণ্ডীভূত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। আর একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে fool ও angry শব্দের একত্র প্রয়োগে ইহাই দ্যোতিত হইতেছে

যে মূর্খরাই ক্রোধান্ধ হইয়া বিষ উদ্গিরণ করে। ইহার সহিত wretch শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া এই অর্থকে উজ্জীবিত করিয়াছে। আবার despatch শব্দের দ্বারা একদিকে যেমন বুঝাইতেছে বধ কর, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হনন কার্য্যের ক্ষিপ্রতা ও আবেগ এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকান্তরে প্রেরণের কথাও ধ্বনিত হইতেছে। kill বা destroy শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহা হইত না।

অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া Richards ইহার উভয়ের কাহাকেও গ্রহণ না করিয়া বাক্যস্ফোট পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। "There is a misconception which typically takes the meaning of a sentence to be built up from separate meanings of its words instead of recognising that it is the other way about, and that the meanings of words are derived from the meanings of sentences in which they occur". কিন্তু বাক্যস্ফোট পক্ষ এখানে স্বীকৃত হইলেও মূলতঃ ব্যঞ্জনা পক্ষ স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাক্যস্ফোট পক্ষ এবং ব্যঞ্জনাস্ফোট পক্ষের মধ্যে আংশিক তুল্যতা আছে। বাক্যস্ফোটের প্রতিপাদ্য এই যে সমস্ত বাক্যের দ্বারা যুগপৎ দ্যোতিত হইয়া একটি অর্থ ফুটিয়া উঠে, এই ফুটিয়া উঠাকে স্ফোট কহে। এই মতের তাৎপর্য্য এই যে বাক্যমধ্যস্থ পৃথক পৃথক পদের স্বতন্ত্র অর্থ একত্র হইয়া কোন বাক্যের অর্থ উৎপন্ন করে না, কিন্তু সমুদয় বাক্যের একটি অর্থ যুগপৎ ফুটিয়া উঠে। ব্যঞ্জনা পক্ষেও বাচ্যার্থ ছাড়া ব্যঙ্গ্য অর্থটী সমুদয় বাচ্যার্থ হইতে এবং তৎপ্রতিপাদক শব্দ হইতে যুগপৎ ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যুগপৎ ফুটিয়া উঠিলেও শব্দগত ও অর্থগত পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনির সত্তা অস্বীকার করা হয় না। অথচ এই

ধ্বনিগুলির একীকরণের দ্বারা সমুদয় ব্যঙ্গ্যার্থ যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তাহাও বলা যায় না। পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি ও শব্দ প্রয়োগের চারুতা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া একটী অখণ্ড চমৎকারিতা উৎপন্ন করে। এই যে ধ্বনিগুলির বা চারুশব্দ প্রয়োগের পৃথক্ অভিব্যক্তি তাহার একত্রীকরণে ব্যঙ্গ্যার্থ নিষ্পন্ন হয় না, কিন্তু তাহারা পরস্পরের মধ্যে পরস্পর একটী অভিনব ভাবে এমন করিয়া মিলিত হয় যে পানকরসের ন্যায় অদ্ভুত চমৎকারিত্ব ফুটিয়া উঠে। এই দুই মতই অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ হইতে পৃথক্। ইঁহাদের কেহই ব্যঙ্গ্যার্থ বা স্ফোট মানেন না। অভিহিতান্বয়বাদ-মতে শব্দ ও প্রত্যয়ের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ বাক্য-তাৎপর্য্যবশতঃ একত্র মিলিত হয় এবং একটি পদার্থ অপর পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া একটী সম্মিলিত বাক্যার্থের সৃষ্টি করে। অন্বিতাভিধানবাদীদের মতে প্রত্যেক পদই সাধারণ ভাবে কোন ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া প্রকাশ পায়, এবং ক্রিয়াস্থলে প্রত্যেক ক্রিয়াই কোন ও কর্ত্তা বা কর্ম্মের সহিত অন্বিত হইয়া প্রকাশ পায়। এইরূপ সাধারণ ভাবে অন্বিত হইলেও তাহারা স্মৃতি বা সংস্কারোদ্বোধের বলে কিংবা স্বতন্ত্র শক্তিবলে বিশেষ পদের সহিত বিশেষ পদের অন্বয় বুঝাইতে সমর্থ হয়। 'গাং' বলিলেই কোনও ক্রিয়ান্বিত গোরু বুঝি; 'আনয়' বলিলে কোনও কর্ম্মান্বিত আনয়ন-সাধারণকে বুঝি। তথাপি গোপদের শক্তি গ্রহণের সময় যে বিশেষ প্রাণী পিণ্ডকে দেখিয়াছিলাম ও আনয়ন ক্রিয়ার শক্তি বোধের সময় যে বিশেষ আনয়ন ক্রিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহার সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে এবং সেই ক্রিয়ার স্মৃতিবলে গো-সাধারণ হইতে বিশেষ গো ও আনয়ন-সাধারণ হইতে বিশেষ আনয়নে উপনীত হইয়া আনয়নান্বিত গো ও গবান্বিত আনয়ন এই উভয়কে একত্র করিয়া, বিশেষরূপ গো এবং বিশেষ রূপ আনয়নকে

একত্রিত করিয়া বিশেষ বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারি। অন্বিতাভিধান-বাদীদের মধ্যে সাধারণ হইতে বিশেষে কি প্রকারে আসা যায় সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, তাহার উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। শালিকনাথের বাক্যার্থমাতৃকাবৃত্তিতে এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

Richards ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া Lipps-এর Einfühlung মতের অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে যখনই আমরা কোনও বহির্বস্তু দেখি বা স্বর শ্রবণ করি, তখনই আমাদের মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটি ক্রিয়াত্মক ব্যাপারের উৎপত্তি হয়। কোনও ব্যক্তি যখন উঁচুনীচু স্থান দিয়া আপন মনে ভ্রমণ করে, তখন তাহার অজ্ঞাতে তাহার পা তাহার প্রত্যেকটি বিক্ষেপকে সামঞ্জস্যের সহিত ব্যবস্থাপিত করে। কিন্তু যখন হঠাৎ কোনও খাড়াই জায়গায় বা ঢালু স্থান দিয়া উঠিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহাকে তাহার গতি সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিতে হয়; এবং তখন আশঙ্কা, আত্মরক্ষা প্রভৃতি নানা ভাব উদ্রিক্ত হইয়া তাহার গমন-ব্যাপারকে তাহার নিকট উজ্জীবিত করিয়া তোলে। যখন আমরা ছবিতে একটি গাছ দেখি, তখন তাহাকে আমরা গাছ বলিয়াও বুঝি, গাছ নয় বলিয়াও বুঝি। বৃক্ষের সাদৃশ্য জ্ঞান হয়, অথচ এ বোধও হয় যে যে আবেষ্টনীর মধ্যে বৃক্ষকে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে ইহা সে আবেষ্টনী নয়। পুরাতন জিনিষকে নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে দেখিবার জন্য চিত্তে আন্দোলন উপস্থিত হয়। কোনও অভিনয়ে যখন নরহত্যা দেখি, তখন স্বাভাবিক নরহত্যা অপেক্ষা তাহার বিভিন্নতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নরহত্যা দেখিলে যে সমস্ত বিভিন্ন ভাব আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিত, নাটকীয় বিভাবাদি দ্বারা তাহা উপস্থাপিত হইয়া একটি নূতনত্ব লাভ

করে ; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিত্ত নানা কল্পনায় ও নানা ব্যাপারে সঞ্চরণশীল হইয়া ওঠে। একজন সহৃদয় ব্যক্তি ও প্রাকৃত ব্যক্তির মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, সহৃদয় ব্যক্তির মধ্যে মনের ভাবগুলি অন্তরের চাঞ্চল্য উৎপন্ন করিয়াই নিবৃত্ত হয়, কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তির মধ্যে তাহা বাহ্যিক চাঞ্চল্য উৎপন্ন করে। "But imaginal action and incipient action which does not go so far as actual muscular action are more important than overt action in the well-developed human being. Indeed the difference between the intelligent and the stupid crass person is a difference in the extent to which overt action can be replaced by the incipient or the overt action". (Principles of Criticism). কোনও অভিনয় দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির চিত্তে যেমন অন্তঃস্ফুরণের দ্বারা তাহার রসাস্বাদ ঘটে, প্রাকৃত ব্যক্তিরা সেইরূপ অভিনয় দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে। এই অন্তর্ব্যাপার ও অন্তঃস্ফুরণকে Richards 'attitude' নাম দিয়াছেন। কোনও একটি অভিনয় দেখিবার সময় বা কাব্য পড়িবার সময় যে সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় অন্তঃস্ফুরণ বা অন্তর্ব্যাপার পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে, বিরুদ্ধভাবে বা পরস্পরের প্রতিযোগিতায় প্রকাশ পায়, তাহার উপরই কাব্যরসের আস্বাদ নির্ভর করে। আমাদের আলঙ্কারিকদের ভাষায় ইহাকেই বাসনানুপ্রাণিত ব্যভিচারিভাব বলা যাইতে পারে। "These imaginal and incipient activities or tendencies to actions I shall call attitude. When we realise how many and how different may be the tendencies awakened by the situation, and what scope

there is for conflict, suppression and interplay—all contributing something to our experience—it will not appear surprising that the classification and analysis of attitude is not far advanced. ....This aspect of experiences as filled with incipient promptings, likely stimulated tendencies to acts of one kind or another, faint preliminary preparations for this or that, has been constantly overlooked in criticism. Yet it is in terms of attitude, the resolution, interanimation and balancing of impulses—Aristotle's definition of tragedy is an instance—that all the most valuable effects of poetry must be described". (Ibid.)

Richards বলিয়াছেন যে ভালো সমালোচক হইতে হইলে তিনটি গুণ আবশ্যক। যে সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ সমালোচনা করেন, তাহার দ্বারা উপস্থাপিত ভাব নিরপেক্ষভাবে হৃদ্গত করিবার সামর্থ্য তাঁহার থাকা চাই। হৃদয়ের মধ্যে যে সমস্ত ভাব অভিব্যঞ্জিত হয়, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা সেগুলির পার্থক্য অনুভব করিবার ক্ষমতাও তাঁহার থাকা চাই, এবং যথার্থভাবে উচ্চনীচ, ভালোমন্দ, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টভাবে মূল্য নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতাও তাঁহার থাকা চাই। প্রত্যেক কবির কাব্যে প্রকাশভঙ্গীর একটি স্বতন্ত্রতা ও বিচিত্রতা আছে। কোনও একটি কবির নির্দ্দিষ্ট আদর্শ বা প্রকাশভঙ্গী লইয়া অন্য কবির সম্বন্ধে বিচার করা চলে না। Swinburne যেভাবে শব্দ প্রয়োগ করেন Hardy সেভাবে করেন না। যে জাতীয় মনোভাব উত্তেজিত

করিয়া Pope আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, Shelley সেভাবে করেন না। সেইজন্য Swinburne, Hardy, Pope বা Shelley প্রভৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রত্যেকের প্রকাশভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর বৈষম্য থাকিলেও সাহিত্যের যাহা সাধারণ আবশ্যক তাহা সাধিত হইয়াছে কিনা তাহাই সমালোচকের দেখিবার বিষয়। কবিতা পড়িবার সময় একদিকে যেমন শব্দগুলি চক্ষুতে দেখিতে পাই, অপরদিকে তেমনি সেই শব্দগুলির শব্দাত্মক ধ্বনিমূলক কল্পনা মনের কাণে ভাসিয়া বেড়ায়। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহা উচ্চারণ করিতে গেলে বাগ্‌যন্ত্রের যে ক্রিয়াত্মক অনুভব, তাহার ছায়াও তাহার সহিত মিলিত হয়। শব্দ উচ্চারণের সময় বাগ্‌যন্ত্রের ব্যাপারের কিংবা শব্দশ্রুতির যে অস্ফুট কল্পনা মনের মধ্যে ওঠে তাহার স্পষ্টতা ও গভীরতার তেমন প্রাধান্য নাই, কিন্তু তাহার ফলে চিত্তের মধ্যে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, বাসনারূপে তাহার দ্বারা যে একটি নূতন চৈত্তিক ব্যাপার উদ্ভূত হয় তাহাই প্রধানতঃ কাব্যাস্বাদের প্রয়োজক হয়। বাগ্‌যন্ত্রের ব্যাপারের বা শব্দশ্রুতির কল্পনা ছাড়া আর একজাতীয় কল্পনা আছে যাহাকে চিত্রাত্মক কল্পনা বলা যায়। একটা কাব্যের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় উপস্থিত হয়, পাঠকেরা আপন আপন শক্তি অনুসারে চিত্তের মধ্যে তাহার বিভিন্নপ্রকার ছবি ফুটাইয়া তোলেন। কিন্তু এই ছবিগুলির স্ফুটতার উপরে বা প্রকার-গত বৈচিত্র্যের উপরে কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে না। এই ছবিগুলি কি প্রকারে ভাবোদ্বোধক হইতে পারে সেইখানেই তাহাদের তাৎপর্য্য। এই চিত্রাত্মক কল্পনাগুলিও শব্দশ্রুতির কল্পনা বা বাগ্‌ব্যাপারের কল্পনার সহিত মিলিত হয় এবং আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির দ্যোতক হয়। যে যে বিভিন্ন ভাবে পাঠকেরা

বিভিন্ন বিষয় অনুভব করিয়াছেন, তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই ইহারা আন্তঃপ্রকৃতি-দ্যোতক বা উদ্বোধক হইতে পারে। এই যে বাসনাত্মক অন্তর্ব্যাপারের স্ফ রণ ইহাই কাব্যাস্বাদের আদিম প্রযোজক। রস বল, বস্তু বল, ভাব বল, সমস্তই ইহা হইতে উদ্ভূত হয়।

"Where these impulses run and how they develop depends entirely upon the condition of the mind and this depends upon the impulses which have previously been active in it. It will be seen then that impulses—their directions, their strength, how they modify one another—are the essential and fundamental things in any experience. All else whether intellectual or emotional arises as a consequence of their activity." শব্দটি দেখিবামাত্র তাহার বাচ্যার্থের বোধ হয়। কিন্তু এই বাচ্যার্থের বোধের সঙ্গে সঙ্গে বাগ্‌ব্যাপারের কল্পনা ও শব্দশক্তির কল্পনা আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হয়, এবং তজ্জন্য যে ঈষৎ ভাবোদ্বোধ হয়, তাহার সহিত চিত্রাত্মক কল্পনা ও পূর্ব্বানুভূত সংস্কারের উদ্বোধ হইয়া মনের মধ্যে যে নানা আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহাই কাব্যাস্বাদের প্রয়োজক। Richards রস বা emotion-কে প্রধান স্থান না দিয়া রসানুকূল অন্তঃপ্রবৃত্তির নানা জাগরণকে কাব্যাস্বাদের প্রধান উপাদান মনে করিয়াছেন। কিন্তু রস, ভাব বা emotionকে তাহারই দ্যোতক লিঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে সমসাময়িক ইউরোপীয় সমালোচনা সাহিত্যও বাসনার উদ্বোধের দ্বারায় দ্যোতিত রস বা প্রবৃত্তিকেই কাব্যাস্বাদের সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়াছে, এবং এই সামগ্রী যে

শব্দশক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক ব্যঞ্জনার ফলে উদ্ভূত হয় তাহাও স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা ইহার যেরূপ সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়াছেন, ইউরোপীয় সাহিত্যে তাহা দেখা যায় না। অনেক প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সমালোচকেরা কাব্যাস্বাদকে একান্ত ভাবে অলৌকিক বলিয়াছেন। Duval তাঁহার La Poesie গ্রন্থে বলিয়াছেন যে আমাদের অন্তশ্চিত্তের মধ্যে যে ছন্দ ও সামঞ্জস্যের রহস্য আছে, যে ধ্বনি ও সঙ্গীতের তাল রহিয়াছে, তাহা দ্বারা আমাদের চিত্তের মধ্যে বিশ্বের সহিত মিলনের এমন একটি ঐক্যের সূত্র ধরা পড়ে, যাহার ফলে মানুষের চিত্তদর্পণে সমগ্র বিশ্ব যুগপৎ প্রতিফলিত হইয়া ওঠে। Elle est, dans sa subconscience, initiée aux secrets des nombres, de l'harmonie ; elle vent non suivant un désir que se chants soient rythmes, de superficielte originalire mais de par une intime communion avec les rythmes auxquels obéit, dans son immense epanouissement, l'univers, dont la conscience humaine est un miroir, une pensée, une émanation.

আবার Porena প্রভৃতি অনেকে কাব্যাস্বাদকে লোকোত্তর চমৎকারকারী আহ্লাদ বলিয়া মনে করিয়াছেন। Porena বলিয়াছেন যে, আমাদের ব্যক্তিগত-সম্পর্কবিহীন ভাবে, ঐন্দ্রিয়ক তৃপ্তির একান্ত বহির্ভূত ভাবে যে আমাদের চিত্তে লোকোত্তর আহ্লাদ হয়, তাহাই কাব্যের বা শিল্পের আনন্দ। তিনি বার বার বলিয়াছেন,—il bello intemo, il bello immediato. Santayana ও এই মতের পোষণ করিয়াছেন। ফরাসী কবি ও দার্শনিক Guyau তাঁহার Les

Problemes de l' Esthetique contemporaine গ্রন্থে আনন্দকে এত অধিক স্থান দিয়াছেন যে সকল রকম সুখবোধকেই তিনি সৌন্দর্য্য বোধের ভিতরে ফেলিয়াছেন। Grant Allen বলিয়াছেন যে সাহিত্যের আনন্দ আমাদের নাড়ীমণ্ডলকে উত্তেজিত করিয়া সুখ দেয়, অথচ তাহাতে কোন ক্ষয় হয় না, এইজন্য সাহিত্যিক আনন্দে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সমস্ত লেখকের মধ্যে কেহই সাহিত্যিক আনন্দের কোন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই।

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকদের কাব্যমীমাংসা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে যদিও ভরত এবং ভামহ উভয়েই রসের কাব্যোপযোগিতা স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং যদিও তাঁহারা উভয়েই, বিশেষতঃ ভামহ, কাব্যের চমৎকারিত্ব যে শব্দ, ছন্দ, অনুপ্রাস ঔচিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বহু ব্যাপারের সমাবেশের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়—ইহা বুঝিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা কোনও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া কাব্যতত্ত্বের মূল সূত্র বাহির করিতে চেষ্টা করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে দণ্ডী প্রভৃতি কাব্যের দোষগুণরীতি লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং বহিরঙ্গ ভাবে সাধুকাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপর দিকে ভরতের টীকাকার ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক ও ভট্টনায়ক প্রভৃতি নাট্যে কি করিয়া রস-প্রতীতি হয়, তাহা আলোচনা করিতে গিয়া মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া কবি ও পাঠক এবং দর্শকের কি করিয়া চিত্ত-বিনিময় হইতে পারে—সে সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে অভিনবগুপ্ত রসই কাব্য—এই কথা বলিয়া একটি সাধারণ মূল সূত্রের দ্বারা দোষ, গুণ, রীতি অলঙ্কার প্রভৃতি কাব্যের সমস্ত বিবিধ অঙ্গকে এই রসের সূত্র দিয়াই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন। এদিকে ধ্বনিকার ও আনন্দবর্দ্ধন কাব্যের শব্দ ও অর্থ কি উপায়ে কাব্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করে তাহা আলোচনা করিতে গিয়া ধ্বনিবাদের স্থাপন করেন। এই ধ্বনিবাদের সহিত রসবাদের কোনও বিরোধ ছিল না, সেইজন্যই রসবাদটি ধ্বনিবাদের মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া যায়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে যেখানে রসধ্বনি হয়, রসবাদ অনুসারে তাহারই কাব্যত্ব মানিতে হয়। কিন্তু ধ্বনিবাদ রসবাদকে ছাড়াইয়া গিয়াছে; কারণ, ধ্বনিবাদ অনুসারে বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনিকেও কাব্য বলিতে হয়। ধ্বনিকার অনেকস্থলে গুণীভূত ব্যঙ্গেরও কাব্যে একটি স্বতন্ত্র আসন আছে—একথা স্বীকার করিয়াছেন। পরবর্ত্তী মহিমভট্ট প্রভৃতি কোনও কোনও আলঙ্কারিক ধ্বনিবাদকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি পরবর্ত্তী কালের অধিকাংশ লেখকই ধ্বনিবাদ ও রসবাদ এই উভয়কেই নির্ব্বিরোধে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অভিনবের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে বক্রোক্তিজীবিতকার কুন্তকের যে একটি স্বতন্ত্রতা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভামহ বক্রোক্তি স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু কুন্তক সেই বক্রোক্তিকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে, তাহাতে, ধ্বনিবাদ বা রসবাদ সমস্তই তাহার মধ্যে আসিয়া পড়ে। অথচ ধ্বনিবাদের মধ্যে যে একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার গণ্ডী টানা আছে, তাহার কোনও প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ কাব্যে বাক্যভঙ্গীর মধ্যে যে নানা জাতীয় বিচিত্রতা আছে সেই সমস্তগুলিকে একমাত্র ধ্বনির মধ্যে আহরণ করা যায় কি না—সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। পরবর্ত্তী কালে জগন্নাথ তাঁহার রসগঙ্গাধরে রস বা ধ্বনিকে প্রধান না করিয়া রমণীয়তাকে প্রধান বলিয়াছেন। এই রমণীয়তার মধ্যে রস এবং ধ্বনি উভয়ই পড়ে, কিন্তু রস ও ধ্বনির মধ্যে পড়িতে পারে না এমন যে সকল কাব্য আছে

তাহাকেও গ্রহণ করা যায়। প্রাচীন কালে ও আধুনিক কালে এমন অনেক কাব্য লিখিত হইয়াছে, যাহাকে রস ও ধ্বনির মধ্যে ফেলা যায় না, যেখানে বাচ্যার্থের দ্বারাই একটি চমৎকারিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। রস ও ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধে ইহাই প্রধান অভিযোগ যে সকল প্রকার সাধুকাব্য রস ও ধ্বনির মাপকাঠির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু কুন্তক ও জগন্নাথ সৌন্দর্য্য বলিয়া আর একটি বিশেষ চিত্তভাবকে স্বীকার করায়, সকল প্রকারের কাব্য সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভব হয়।

স্ফোটবাদ

স্ফোট সম্বন্ধে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে পশ্‌পশা প্রকরণে ইঙ্গিত ও 'তপরস্তৎকালস্য' এই সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে উল্লেখ দেখা যায়। ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ে এই সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়াছে। ভর্তৃহরি বলেন যে শব্দ তিন প্রকার বৈখরী, মধ্যমা ও পশ্যন্তী। যে সমস্ত শব্দ কাণে শোনা যায় তাহাকে বৈখরী বলে। অন্তরের মধ্যে ক্রমাবগাহিরূপে বুদ্ধিব্যাপার বা চিত্তব্যাপাররূপে প্রাণবৃত্তির সহিত অনুচ্চারিত ও অশ্রুত জ্ঞান বা বুদ্ধির আকাররূপে উচ্চারিত শব্দের প্রযোজকরূপে যাহা প্রকাশ পায় তাহাকে মধ্যমা বলে। যদিও এই বুদ্ধির ধারার মধ্যে ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্যের আভাস থাকে এবং সেই হিসাবে ইহা ক্রমভাবী শব্দধ্বনিকে উত্থাপিত করিতে পারে, তথাপি বুদ্ধির স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া ইহার মধ্যে যথার্থ ভাবে কোনও ক্রমের পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। ইহার শক্তির দ্বারা ক্রমরূপে প্রকাশিত ও উচ্চারিত শব্দের পৌর্ব্বাপর্য্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। 'মধ্যমা তু অন্তঃসন্নিবেশিনী পরিগৃহীতক্রমেব বুদ্ধিমাত্রোপাদানা সূক্ষ্মা প্রাণবৃত্ত্যনুগতা, প্রতিসংহৃতক্রমা সত্যপ্যভেদে সমাবিষ্ট-ক্রমশক্তিঃ'—(পুণ্যরাজটীকা পৃ-১৪৪-বাক্যপদীয়)। চিত্তের মধ্যে যে অর্থের প্রকাশ হয় তাহা একটি অখণ্ড জ্ঞানাত্মক প্রকাশ, কিন্তু তাহার মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যের ক্রমধারা নাই। কিন্তু তাহা আপনাকে শব্দাকারে প্রকাশ করিবার সময় পৌর্ব্বাপর্য্যের ধারাকে অবলম্বন করিয়া স্বানুরূপ, স্বাভিব্যঞ্জক শব্দধারাকে সৃষ্টি করিতে পারে। এই শক্তি তাহার মধ্যে অন্তর্নিহিত হইয়া আছে। পশ্যন্তী অবস্থা ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। এই অবস্থায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় একীভূত হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার কোনও

পরিচ্ছিন্ন আকার নাই অথচ পরিচ্ছিন্ন অর্থকে সংশ্লিষ্ট বা সংযুক্ত ভাবে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য তাহার মধ্যে আছে। সমস্ত অর্থের প্রকাশ যেন যুগপৎ এই অবস্থার মধ্যে প্রশান্তভাবে রহিয়াছে। "সন্নিবিষ্ট-জ্ঞেয়াকারা প্রতিলীনাকারা নিরাকারা চ পরিচ্ছিন্নার্থপ্রত্যবভাসা সংশ্লিষ্টার্থপ্রত্যবভাসা চাপ্রশান্তসর্ব্বার্থপ্রত্যবভাসা চ।" সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রাক্কালে বীজের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষোৎপাদনের শক্তি যে ভাবে বিবিধ ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিবার জন্য প্রস্তুত থাকে অথচ আপনাকে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করে না; ভীষণ ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির অন্তঃস্তব্ধতার মধ্যে যেভাবে তাহার শক্তিপুঞ্জ আপনাতে লীন হইয়া থাকে, চিত্তেরও তেমনি একটি অবস্থা আছে যে অবস্থায় অর্থাকারের উদ্বোধ হয় নাই, অথচ চিত্তের স্বাভিন্ন স্পন্দনের মধ্যে তাহা বিধৃত হইয়া রহিয়াছে—এই অবস্থাকে বলে পশ্যন্তী। এই পশ্যন্তী অবস্থা লোকব্যবহারের অতীত। এই পশ্যন্তী অবস্থায় যে তত্ত্ব অনুভূত হয় তাহার সহিত জৈবব্যাপার-মূলক প্রাণবৃত্তি জড়িত থাকে না। ইহার শক্তিবলেই প্রাণবায়ু উদ্ভূত হইয়া মধ্যমা স্তরের সৃষ্টি করে, পরে তাহারই পুনর্বিকাশে তাহা শব্দা-কারে ধ্বনিত হয়। এইভাবে শব্দ ধ্বনিত হইলে বৈয়াকরণেরা তাহার বিশ্লেষণ করিয়া নানা বিভাগ করিয়া প্রকৃতি-প্রত্যয়-ভেদে তাহার নানা-বিধ শক্তি কল্পনা করিতেছেন। প্রকৃতিপ্রত্যয়ভেদে শব্দের যে সমস্ত শক্তি কল্পনা করা হইয়াছে বস্তুতঃ তাহার কোনও সত্তা নাই। মহাশক্তি হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া সমস্ত শব্দেরই বিশিষ্ট শক্তি আছে। এই জন্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদির যেমন দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল আছে, শব্দেরও সেইরূপ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল আছে। শব্দাত্মক মন্ত্রাদির উচ্চারণে বিষাপনয়ন প্রভৃতি দৃষ্ট ফল দেখা যায়, তেমনি বেদাত্মক অক্ষররাশির যথাবিধি উচ্চারণে স্বর্গাদি অদৃষ্ট ফলও ঘটিয়া থাকে।

যে শব্দ বাগিন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হইয়া ধ্বনিরূপে প্রকাশ পায়, তাহা অনিত্য, আর যে শব্দ পশ্যন্তীরূপে বা মধ্যমারূপে সকলের অন্তঃসন্নিবেশী হইয়া সকল বিকারের কারণ হইয়া, সর্ব্বকর্ম্মের আশ্রয় হইয়া, সুখ-দুঃখের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান থাকে এবং বোধরূপে নিরন্তর আপনাকে শব্দধারার মধ্যে প্রকাশ করে, সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তি শব্দ নিত্য। বস্তু না থাকিলেও শব্দের দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। শব্দ অন্য সহকারী বস্তু-নিরপেক্ষভাবে অর্থ সৃষ্টি করে। শব্দব্রহ্ম আপনাকে যখন নানা অর্থের মধ্যে বিভক্ত করে তাহাই জগতের সৃষ্টি। কিন্তু এই সৃষ্টিব্যাপারের মূল কারণ হইয়া তিনি আপনার মধ্যে তেমনি অবিকৃতই থাকেন। আমাদের সমস্ত অনুভব সমস্ত অর্থক্রিয়াকারিত্বের মধ্যে শব্দই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। চৈতন্য যে বাগ্‌রূপে আপনাকে বিভাবন করেন, তাহাই চৈতন্যের ক্রিয়া। এই বাগ্‌বিভাবিনী চেতনা না থাকিলে মানুষের দেহ কাষ্ঠের মত হইয়া থাকে। এই যে অন্তর্যামী প্রকাশস্বরূপ চেতনা, তাহাই স্বপ্রকাশের জন্য আপনাকে শব্দধারার মধ্য দিয়া বিভক্ত করেন। এই চেতনা শক্তির মধ্যে সমস্ত শব্দভাবনার বীজ লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহা যখন স্বপ্রেরণায় আপনাকে নানাবিধ অর্থের মধ্য দিয়া উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলে, তখন সেই উদ্‌বুদ্ধ শক্তির বলে অনুরূপ শব্দের বিভাবন হইয়া থাকে এবং এইজন্যই শব্দের শক্তির দ্বারা আমরা অর্থকে উপলব্ধি করিতে পারি। বালক যে বিনা উপদেশে কণ্ঠতাল্বাদির অভিঘাতের দ্বারা শব্দের সৃষ্টি করে, তাহা এই শক্তিরই অনুকূলতায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকা যেমন ঘটাদির সমবায়ি-কারণ, শব্দও তেমনি সমগ্র জগতের উপাদান কারণ। কারণ, আমাদের সমস্ত ব্যবহারই শব্দের উপর নির্ভর করিতেছে। সমস্ত বস্তুই সূক্ষ্মরূপে শব্দকে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছে—এই অধিষ্ঠানভূত শক্তি বাচ্য-বাচকরূপে

আপনাকে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। শব্দ বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া অর্থের উদ্বোধ করে এবং প্রাণে অধিষ্ঠিত হইয়া বাক্য-রূপে আপনাকে প্রকাশ করে। কোনও বস্তুকে যেমন দূর হইতে দেখিলে তাহাকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং তাহার স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, শব্দও তেমনি যতক্ষণ বর্ণপদাদির মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার যথার্থ স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভাগরহিত, অংশরহিত, অখণ্ড বাক্যের অভিব্যক্তিই শব্দের যথার্থ প্রকাশ। কিন্তু প্রথম অবস্থায় যখন ক্রমশঃ ধ্বনিগুলি উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন বর্ণপদাদি বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের গোচরীভূত হয় এবং পৌর্ব্বাপর্য্যে অর্থকে প্রকাশ করে। পরে প্রণি-ধানের দ্বারা অখণ্ডরূপ বাক্যার্থের প্রতীতি হয়। এই যে অখণ্ড অর্থের প্রস্ফুটন এখানেই শব্দের তাৎপর্য্য।

"যথৈব দর্শনৈঃ পূর্ব্বৈ দূরাৎ সন্তমসেঽপি বা।
অন্যথাকৃত্যবিষয়মন্যথৈবাধ্যবস্যতি।
ব্যজ্যমানে তথা বাক্যে বাক্যাভিব্যক্তিহেতুভিঃ।
ভাগাবগ্রহরূপেণ পূর্ব্বং বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥"

নির্ভাগবাক্যাদ্যভিব্যক্তিবিষয়ৈঃ প্রযত্নবিশেষৈর্জায়মানা ধ্বনয়ঃ সত্যপি ভেদে সামান্যশক্তি-সমন্বয়শক্তি-সমন্বয়াদ্ বর্ণপদপ্রত্যবভাসাব-গ্রহরূপাং বুদ্ধিং পূর্ব্বং প্রবর্ত্তয়ন্তীত্যর্থঃ। ততঃ প্রণিধানাদিনা বাস্তবম-খণ্ডমেব বুদ্ধ্যা বিষয়ীকুর্ব্বন্তীতি তাৎপর্য্যম্।" (পৃঃ ৩৫)। সাধারণ লোকে মনে করে যে দুগ্ধ হইতে যেমন দধি হয়, তেমনি ক্রমশঃ একটি শব্দের অর্থের সহিত অপর শব্দ মিলিত হইয়া একটি বাক্যার্থ হয়। অনেকে মনে করেন যে, 'গৌঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করিলে গকার, ঔকার এবং বিসর্গমাত্রই বোধ হয়। তাঁহারা মনে করেন না যে গকার,

ঔকার ও বিসর্গ ব্যতিরিক্ত ভাগবিহীন, অংশবিহীন, অখণ্ড কোন শব্দ আছে। কিন্তু ক্রমশঃ যদি গকার, ঔকার ও বিসর্গের বোধ হইত, তবে প্রত্যেকটি বর্ণ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায় বলিয়া 'গৌঃ' এই অখণ্ড শব্দের বোধ হইতে পারিত না। যদি যুগপৎ সমস্ত অবয়বের অভিব্যক্তি হইত তবে নদী ও দীন, সর ও রস ইহাদের কোনও পার্থক্য থাকিত না। বস্তুতঃ অভিব্যঞ্জক ধ্বনির পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারেই গকার, ঔকার ও বিসর্গরূপে আমরা শব্দের অংশ কল্পনা করিতে পারি। প্রকৃত-পক্ষে ধ্বনি ও শব্দ এক নহে, ধ্বনির দ্বারা শব্দের অভিব্যঞ্জনা হয় এইমাত্র। প্রথম গকারের অভিব্যক্তি হয়, পরে ঔকারের ও পরে বিসর্গের অভি-ব্যক্তি হয় এবং পর পর অভিব্যক্তির দ্বারা বা ধ্বনির দ্বারা শব্দস্ফোটের অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, তালু ও ওষ্ঠের দ্বারা যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা কর্ণে কেমন করিয়া শব্দের অভিব্যক্তি করিতে পারে? প্রদীপ এবং ঘট একস্থানে থাকে বলিয়াই প্রদীপ ঘটকে প্রকাশ করিতে পারে। ইহার উত্তরে ভর্তৃহরি বলেন যে মূর্ত্ত বস্তুর পক্ষেই একস্থান ও নানাস্থানের প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু অমূর্ত্ত বস্তুর বেলায় সেকথা খাটে না। আপত্তিবাদীরা পুনরায় বলেন যে দীপের হ্রাসবৃদ্ধি বা সংখ্যাভেদে অভিব্যক্ত ঘটের হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি হয় না, কিন্তু শব্দের বেলায় নাদের সংখ্যানুসারে শব্দের সংখ্যা নির্ভর করে অতএব ধ্বনির দ্বারা শব্দ প্রকাশিত হয় না। ইহার উত্তরে ভর্তৃহরি বলেন যে অনেকস্থলে অভিব্যঞ্জকের পার্থক্যানুসারে অভিব্যঙ্গ্যেরও ভেদ দেখা যায়। তৈলে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, কাচে বা জলে তাহা পড়ে না। তালু-ওষ্ঠাদির সংযোগের দ্বারায় যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ধ্বনি বা নাদ বলা যায়। তাহাদের দ্বারা যে অখণ্ড শব্দের অভিব্যক্তি হয় তাহাকেই স্ফোট বলে।